চিন্তাধারা

অধ্যাপক গোলাম আযম

চিন্তাধারা

প্রবন্ধ সংকলন

অধ্যাপক গোলাম আযম

মুহাম্মদ নূরুযযামান সম্পাদিত

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.pathagar.com

প্রকাশক
আবুদল গাফফার
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ২৫১৭৩১

আ ঃ প্র ঃ ২০৮

প্রথম সংস্করণ

রমযান	১৪১৫
ফালগুন	১৪০১
ফেব্রুয়ারী	১৯৯৫

বিনিময় ঃ ৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Chintadhara by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 95.00 Only

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের বক্তব্য

১৯৫৫ সাল থেকে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়ীকীতে অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এর মধ্যে বেশ কয়টি প্রবন্ধ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট প্রবন্ধসমূহকে পুস্তকাকারে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কতক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের সাথে ঐ সব প্রবন্ধ সম্পর্কিত। এ জাতীয় প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়। সংকলনের শুরুতেই ঐ সব প্রবন্ধ পরিবেশন করা হলো।

এরপর অন্যান্য প্রবন্ধ যা বিভিন্ন বিষয়ে রচিত সে সব সংকলিত হয়েছে। কতক প্রবন্ধ এমন আছে যা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আর মুদ্রিত হয়নি।

প্রবন্ধগুলো কোনটা সাধু ভাষায়, আবার কোনটা চলতি ভাষায় লেখা ছিল, সেভাবেই এ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।

আশা করি বিজ্ঞ ও সহৃদয় পাঠকসমাজ ক্ষমাসুন্দর মনোভাব নিয়ে আমাদের মুদ্রণ ত্রুটি মার্জনা করবেন। অক্ষর সজ্জা ও মুদ্রণ প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রকাশক
আবদুল গাফ্‌ফার

www.bjilibrary.com

সংকলন সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

অধ্যাপক গোলাম আযম আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অনন্য ব্যক্তিত্ব। চল্লিশ দশকের সংগ্রামী ছাত্রনেতা এবং কারমাইকেল কলেজের এক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানস গঠনে অর্ধশতাব্দী থেকে নিরলস প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ মানুষকে যে জনপদে জন্মদান করেন সে জনপদের প্রতি তার বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

এ মৌলিক চিন্তাধারাই তাঁকে সত্যের নির্ভীক সেনানীর ন্যায় সামনে চলার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। জীবনের ঝুকি নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি যা বুঝেন, যা বিশ্বাস করেন তাই লিখেন এবং তাই বলেন। কে কি বলল, বা কে কি বলবে তা তার নিকট খুব বেশী গুরুত্বের বিষয় নয় বরং তিনি যে বিষয়ে লিখেন বা কথা বলেন তার যথার্থতার দিকটাই তাঁর নিকট অধিক বিচার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যের আপোসহীন এ সেনানীর লেখনী আমাদের যুব সমাজের মন মানস পরিবর্তন সাধনে তাদের চিন্তার নতুন দিগন্তের উন্মোচন এবং ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করতে সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। চিন্তাধারা'র প্রবন্ধগুলো আমাদের জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য ও সত্তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের যুবসমাজকে খুব সফলভাবে সাহায্য করবে। আমাদের এ আশাবাদ আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে সফল হোক। আমীন।

ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালারের প্রবন্ধগুলো সংকলিত করে বাংলাভাষী পাঠকদের খেদমতে হাজির করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

নূরুযযামান।

www.bjilibrary.com

বিষয়সূচী

১. ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য (দারসে কুরআন) ১

পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক প্রবন্ধ

২. পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস ১১
৩. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৯৬৫ ও জামায়াতের ভূমিকা ১৯
৪. গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট ও আওয়ামী লীগ ৩০
৫. গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট বনাম ৬ দফা ৩৩
৬. সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান করা কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে ? ৪০
৭. আমাদের শক্তির উৎস ৪৯
৮. পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ দুর্গতি ৫৩
৯. মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি ৬৩
১০. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ৭০
১১. সমাজ সংগঠনের হাতিয়ার ৭৪

সাংবাদিক সাক্ষাৎকার ও সম্মেলন

১২. সাংবাদিক সাক্ষাৎকার ১৯৮০ ৭৮
১৩. সাংবাদিক সম্মেলন ১৯৮৮ ৮৫
১৪. সাংবাদিক সাক্ষাৎকার ১৯৯৩ ৯৩

শিক্ষা আন্দোলন

১৫. ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ১০২
১৬. শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা ১১৫

ইসলামী আন্দোলন

১৭. ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি ১৩৩
১৮. বাংলাদেশ ও ইসলামী আন্দোলন ১৪৫
১৯. শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবেন ১৫০
২০. আদর্শ কর্মীর পরিচয় ১৫৫
২১. ইসলামী আন্দোলনে নিষ্ক্রীয় ভূমিকা ১৬০
২২. জন্মভূমিরূপ আল্লাহর মহাদানের শুকরিয়াই হলো দেশপ্রেম ১৬৩

www.bjilibrary.com

২৩. মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব ১৬৭

মুমিনের জীবন ও ইসলাম

২৪. ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ ১৭৭
২৫. মুমিনের উপরে কুরআনের হক ১৮৭
২৬. শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য ১৯৩
২৭. কুরআনের মাস ও আমাদের কর্তব্য ২০৪
২৮. মুমিনের চার রকম মর্যাদা ২০৯
২৯. তিন তাসবীহর হাকীকত ২১৫

ইসলাম ও অর্থনীতি

৩০. ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ২২২
৩১. ইসলাম ও অর্থনীতি ২২৪

মুসলিম ঐক্য

৩২. মুসলিম ঐক্য ২৩০
৩৩. মুসলিম ঐক্য ও তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ২৩৪

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন

৩৪. ছাত্রসমাজ ও ইসলামী আন্দোলন ২৩৮
৩৫. ইসলামী ছাত্রশিবির—কুমিল্লার কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে ২৪৫

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

৩৬. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ২৪৭

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ج غُلِبَتِ الرُّوْمُ لا فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ لا فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ط لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ ط وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ لا بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ لا وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ * يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ * اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ * مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ * اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ط ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ * (سورة الروم - ركوع ١٠)

তরজমা ঃ

রহমান ও রহীম আল্লাহ পাকের নামে।

আলিফ-লাম-মীম। নিকটবর্তী স্থানে রোম (সাম্রাজ্য) পরাজিত হইয়াছে এবং এই পরাজয়ের পর তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যেই (রোম আবার) জয়লাভ করিবে। (পরাজয়ের) পূর্বেও আল্লাহ পাকের হাতেই এখতিয়ার ছিল এবং (জয়ের) পরেও তাহার হাতেই (ক্ষমতা) থাকিবে। (রোম যখন জয় লাভ করিবে) তখন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্য পাইবার ফলে আনন্দিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সাহায্য করেন এবং তিনি মহা শক্তিশালী ও মেহেরবান। ইহা আল্লাহ পাকের ওয়াদা। আল্লাহ

www.bjilibrary.com

কখনও তাঁহার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সে কথা জানে না। তাহারা দুনিয়ার জীবনের জাহেরী অবস্থাই (যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়) শুধু জানে; কিন্তু লোকদের আখেরাত সম্বন্ধে তাহারা (একেবারেই) অমনোযোগী।

তাহারা কি নিজেদের (সৃষ্টির উদ্দেশ্য) সম্পর্কে একটু চিন্তাও করে না। আল্লাহ তায়ালা আসমান, জমীন ও ইহাদের মধ্যে আর যাহা কিছু আছে তাহা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। ইহাদিগকে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বিশ্বাস করে না।

তাহারা কি দুনিয়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় না? তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইত যে তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছে। (পূর্ববর্তী জাতিসমূহ) ইহাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান ছিল। উহারা (পূর্ববর্তী লোকেরা) দুনিয়াকে (বস্তুশক্তি) ব্যবহার করিবার ব্যাপারে এবং (নিজেদেরকে) প্রতিষ্ঠিত করার বেলায় ইহাদের (বর্তমান লোকদের) চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল। (বর্তমানের ন্যায়) পূর্ববর্তীদের নিকটও রসূলগণ স্পষ্ট আয়াতসমূহ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আল্লাহ তাহাদের উপর জুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম (করিবার কারণ সৃষ্টি) করিয়াছিল। অবশেষে যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। কেননা তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল; এমন কি তাহারা (আল্লাহর আয়াতসমূহকে) বিদ্রূপও করিয়াছিল। (সূরায়ে রোম ১ম রুকু)

মক্কী সূরা ঃ

সূরায়ে রোম মক্কী সূরা। মক্কাকে কেন্দ্র করিয়া রসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম ১৩ বৎসর পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তি গঠনের স্তরে যখন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত পথে কঠোর সংগ্রামী জীবন যাপন করিতেছিলেন তখনকার এক বিশেষ সময়ে এই সূরা নাজিল হয়। প্রত্যেক আদর্শবাদী আন্দোলনেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে আদর্শের উপযোগী লোক সমাজ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এই ধরনের এক দল লোক তৈয়ার না করিলে সমাজে নেতৃত্ব লাভ করিয়াও কোন আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। তাই রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিজয় যুগে পদার্পণ করার পূর্বে সংগ্রাম যুগে দীর্ঘ সময় কাজ করেন।

সংগ্রাম যুগের বৈশিষ্ট্য ঃ

সমাজে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নাই সেখানে যখন সে আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ইহাকে পছন্দ করে না। তাহারা যে নীতিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে সে নীতিসমূহ নেতৃবৃন্দের স্বার্থই সংরক্ষণ করে। তাই নতুন আদর্শে সমাজ গঠনের আওয়াজকে সমাজের নেতৃত্ব আপন স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই মনে করে এবং সেই আদর্শের আন্দোলনকারীদিগকে প্রতিষ্ঠিত

www.bjilibrary.com

সমাজের বিরোধী বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ প্রথমে অবশ্য এই আন্দোলনকে গুরুত্বদান করে না; কিন্তু ক্রমে যখন এই আন্দোলন সমাজে দানা বাধিয়া উঠে তখন কায়েমী স্বার্থের অধিকারী নেতৃত্ব শক্তির দাপটে ইহাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার নিপীড়ন ও অত্যাচার চালাইতে থাকে।

শেষ নবীর ইসলামী আন্দোলন যখন এই সংগ্রাম যুগে উৎপীড়িত ও নির্যাতিত অবস্থার সম্মুখীন হয় তখনই এই সূরা অবতীর্ণ হয়। এই সূরায় একদিকে মুসলমানগণকে সাহস ও উৎসাহ দান করা হইয়াছে। আর অন্যদিকে শক্তির দাপটে যাহারা ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার অপচেষ্টায় মাতিয়াছিল তাহাদিগকে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নাজিলের সময় ঃ

এই সূরার প্রথমেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতেই সূরাটি নাজিলের সময় নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়। ৬১৫ সালে রোম পারস্যের নিকট পরাজয় বরণ করে। ঐ সময়ই মুসলমানদের একটি জামায়াত কঠোর নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে হাবশে হিজরত করিতে বাধ্য হয়। ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবী করীম (ছাঃ) সর্বপ্রথম অহী লাভ করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন। সুতরাং ৬১৫ সালে রোম পরাজিত হওয়ার সময়েই এই সূরা নাজিল হয়।

শানে নুজুল ঃ

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ মানবতার নামেই যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু ৬১০ সালে তিনি ইহাকে ধর্মযুদ্ধের রূপ দিয়া বসেন। পারস্য সম্রাট অগ্নিপূজার প্রাধান্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এবং খৃষ্টধর্মের নিপাত করিবার ইচ্ছায় রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। মক্কা ও আরবের মুশরিকগণ স্বাভাবিকভাবে অগ্নিপূজকদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ আল্লাহ, আখেরাত, রসূল ও আল্লাহর কিতাব ইত্যাদিতে বিশ্বাসী বলিয়া মুশরিকগণ আহলে কিতাব ও মুসলমানদেরকে এক মতাবলম্বী মনে করিত। মুসলমানগণও আহলে কিতাবদেরকে মুশরিকদের চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী মনে করিতেন। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন খৃষ্টধর্মী রোম সম্রাটের পক্ষে ছিল।

যখন ক্রমেই রোমের পরাজয় নিশ্চিত হইয়া উঠিল তখন মুশরিকেরা মুসলমানগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম যদি সত্যই হইবে তাহা হইলে ইহাদের আল্লাহ কেন সাহায্য করে না? পারস্যের ও আমাদের ধর্মই সত্য। তাই পারস্য রোমকে যেমন বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়াছে, তেমনি আমরাও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িব। রোমীয় খৃষ্টানরা যেমন দেশ ছাড়িয়া পিছাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে; আমরাও তেমনি মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করিব। কতক মুসলমান তো বিতাড়িত অবস্থায় ইতিমধ্যেই দেশ ছাড়া হইয়াছে, অবশিষ্ট কয়েকজনকেও নির্মূল করা হইবে।

www.bjilibrary.com

এই রূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের নৈতিক বলের উপর প্রচন্ড আঘাত পড়তেছিল এবং রসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত নির্যাতিত অবস্থায় দিন যাপন করিতেছিলেন। অপর দিকে ইসলাম বিরোধীরা পারস্যের বিজয়কে নিজেদের গৌরবের বিষয় এবং রোমের পরাজয়কে মুসলমানদের অপমানের বিষয় বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল।

এই পরিবেশে সূরায়ে রোমের মাধ্যমে আল্লাহ পাক জানাইয়া দিলেন যে, রোমের এই পরাজয়কে চূড়ান্ত বিবেচনা করা সম্পূর্ণ ভুল এবং মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার পরিবর্তন হইবে না বলিয়া মনে করাও একেবারে ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। বাহ্য দৃষ্টিতে অবশ্যই সেই সময়ে রোমের পরাজয় এবং মুসলিমদের দুর্দশা ছিল, কিন্তু দুনিয়ার জীবনে একথাও সত্য যে, আজ যাহা নিশ্চিত মনে হয়, আগামীকাল তাহাই অবাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা দান করার উদ্দেশ্যে জানাইলেন যে তাহাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। শীঘ্রই তাহাদের সুদিন আসিবে।

দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

এই সূরার প্রথম দিকেই এমন দুইটি ঐতিহাসিক বিষয়ে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যাহা পরবর্তীকালে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রোমের পরাজয়ের পর তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে আবার জয়লাভ করা সম্পর্কে প্রথম আয়াতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে যে রোম যখন জয়লাভ করিবে সেই সময়ই মুসলমানদের দুর্দিন দূর হইয়া আনন্দ করিবার সুযোগ আসিবে।

৬১৫ সালে যখন রোমের নিশ্চিত পরাজয় সম্বন্ধে কাহারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তখন মুসলমানদের এমন চরম দুর্দশা ছিল যে সুদূর ভবিষ্যতেও তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় নাই। আরবের সর্বত্র যখন পারস্যের বিজয়গাঁথার চর্চা হইতেছিল তখন রসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর মুখে রোমের বিজয়-বার্তা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণী লইয়া এমন উপহাস করা শুরু হইল যে মুসলমানগণ রীতিমত হাসির খোরাকে পরিণত হইল। রোমের বিজয় দিবসে মুসলমানদেরও খুশির কারণ ঘটিবে বলিয়া আল্লাহর বাণীতে উল্লেখ থাকায় মুশরিকেরা আরও বেশী ঠাট্টা করিতে লাগিল।

মক্কার অন্যতম মুশরিক নেতা উবাই-বিন-খাল্‌ফ হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট উপহাস করিয়া বলেন, "তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক কি এখনও এমন পাগলের পেছনে ঘুরিয়া বেড়াইবে? মুহাম্মদ তো এখন এমন সব অবাস্তব কথা বলিতে শুরু করিয়াছে যাহা শুনিলে দুনিয়ার সকল মানুষই উপহাস করিবে।" একথা বলার পরও যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার কোন উত্তর দিলেন না তখন উবাই বাজী রাখিয়া বলিল "তিন বৎসরের মধ্যে রোমের জয়লাভ সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়

www.bjilibrary.com

তাহা হইলে তোমাকে আমি দশটি উট দান করিব, কিন্তু যদি ইহা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে তুমি আমাকে দশটি উট দিবে।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এই কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক 'বেদ এ সিনীন' বলিয়াছেন। ইহার অর্থ তিন হইতে নয় বৎসর। তুমি ওবাই এর সহিত তিন এর স্থলে নয় বৎসরের কথা দাও এবং দশটি উটের স্থলে একশটি উটের বাজী ধর। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাই করিলেন।

ইতিহাস চিরদিনই এই সাক্ষ্য বহন করিবে যে আল্লাহ পাকের দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হইয়াছে। ৬২৪ সালে রোম চূড়ান্ত বিজয়ের সূচনা করে এবং সেই বৎসরই মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যে বদরের যুদ্ধে আশাতীতভাবে জয় লাভ করে। এইরূপে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীই এক সঙ্গে বাস্তবে পরিণত হইল।

মক্কা বিজয়ের পর মুশরিকদের যখন চূড়ান্ত পরাজয় হয় তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই বিন খাল্‌ফের উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী বাজী রাখা একশত উট আদায় করিয়া রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাজির হইলেন। নবী করীম (সাঃ) খুশী হইয়া বলিলেন "এই উট তুমি নিজের জন্য ব্যবহার করিওনা, আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দাও। কেননা পরবর্তীকালে এইরূপ বাজী রাখাকে অহীর মারফতে হারাম করা হইয়াছে।"

এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা এই কথা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল যে কুরআন পাক আল্লারই বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহারই রসূল। যাহাদের সম্মুখে এই 'অসম্ভব ও অবাস্তব' ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব ও বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল তাহারা কিরূপে ইহার পরও কুরআন ও রসূলের উপর সন্দেহ পোষণ করিত তাহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। ইহাতে মনে হয় যে, যাহারা সত্যের সন্ধানী নয় তাহাদের নিকট কোন স্পষ্ট নিদর্শনই ঈমান দান করিতে পারে না। আর যাহারা আল্লাহ ও রসূলের উপর সত্যিকার ঈমান আনয়ন করেন তাহারা আল্লাহ ও রসূলের কোন বাজীকেই শুধু যুক্তি ও বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির ত্রুটি আছে বলিয়া স্বীকার করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নবী করীম (ছাঃ) পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কে এই সূরাতে যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ভালরূপে বুঝিতে হইলে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে রসূল হিসেবে ঘোষণা করার আট বৎসর পূর্বে (৬০২ খৃষ্টাব্দে) রোমের বাদশাহ মরিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ফোকাস নামক এক ব্যক্তি সম্রাট হইয়াই মরিসের পরিবার পরিজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তদানীন্তন পারস্যসম্রাট খসরু পারভেজ রোমসম্রাট মরিসের সাহায্যেই ক্ষমতাসীন হইয়াছিল বলিয়া

www.bjilibrary.com

খসরু মরিসের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল। এমনকি খসরু পারভেজ মরিসকে ধর্মপিতা মনে করিত। নিজের ধর্ম-পিতার প্রতি ফোকাসের জঘন্য ব্যবহারের প্রতিবাদে নিছক মানবতার নামে পারস্যসম্রাট রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রোমসম্রাট যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করিতে থাকার ফলে রোম-সাম্রাজ্যের আফ্রিকাস্থ শাসনকর্তা এক বিরাট বাহিনীসহ তাহার যোগ্য ছেলে হিরাক্লিয়াসকে যুদ্ধে পাঠায়। হিরাক্লিয়াস রোমের কতক সরকারী লোকের সহায়তায় ৬১০ সালে ক্ষমতা দখল করিবার পর গদীচ্যুত ফোকাসের সহিত তেমনি নৃশংস ব্যবহার করে যেমন ফোকাস তাহার পূর্ববর্তী রোম সম্রাটের সহিত করিয়াছিল। এই বৎসরই প্রথম অহী নাজিল হওয়া শুরু হয় এবং নবুয়তের কথা ঘোষণা করা হয়।

যে মানবতার দোহাই দিয়া খসরু পারভেজ রোমসম্রাট ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ৬১০ সালে ফোকাস তাহার নৃশংসতার পরিণাম ভোগ করার পর এই যুদ্ধ বন্ধ করাই খসরুর উচিত ছিল। কিন্তু খসরুকে তখন জয়ের নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। যে কোন অজুহাতেই সে যুদ্ধ করিতে তখন বদ্ধপরিকর। তাই তখন ধর্মের দোহাই দিয়া হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখিল। খসরু অগ্নিপূজার ধর্মকে খৃষ্টধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং ৬১৪ সালে জেরুজালেম জয় করার পর তাহাকে খোদা হিসেবে স্বীকার করার জন্য হিরাক্লিয়াসের নিকট দাবী জানাইল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক গীবনের মতে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরও ৬/৭ বৎসর পর্যন্ত রোমের এমন দুরবস্থা ছিল যে, রোমের বিজয় তো দূরের কথা, রোমের অস্তিত্ব থাকিবে বলিয়াও কেহ ভাবিতে পারে নাই।

৬২২ সালে নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পারস্য সম্রাটকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করার জন্য কনষ্টান্টিনোপল হইতে পালাইয়া কৃষ্ণসাগরের পথে অগ্রসর হন। ৬২৩ সালে আরমেনিয়া হইতে আক্রমণ শুরু করিয়া রোমসম্রাট পর বৎসরই আজারবাইজানে পৌঁছে এবং অগ্নিপূজক পারস্য সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নিকুন্ড ধ্বংস করে। এখান হইতে রোম সম্রাটের বিজয় শুরু হয়। আল্লাহর এমনই মহিমা যে এই বৎসরই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাকের সাহায্যে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়।

এইরূপে নয় বৎসরের মধ্যেই সূরায়ে রোমে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি একই সঙ্গে পূর্ণ হয়। অতঃপর রোম ও মুসলমানদের বিজয় প্রায় একই গতিতে চলিতে থাকে। ৬২৮ সালে পারস্য সম্রাট বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং এই বৎসরই হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়। এই সন্ধিকে কুরআন মজীদে বিরাট বিজয় বলা হইয়াছে। ৬২৯ সালে রোম সম্রাট তাহাদের ধর্মকেন্দ্র ও রাজধানী ফিলিস্তিনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময়ই নবী করীম (ছাঃ) হিজরতের পর প্রথমবার ওমরা আদায় করার জন্য মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ লাভ করেন। এই বৎসরই খসরু পারভেজের পুত্র পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রোমের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হওয়ায় ২৮ বৎসর ব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং রোমসাম্রাজ্য পূর্বের চেয়েও অধিক শক্তিশালী অবস্থায় বিজয় সমাপ্ত করে।

www.bjilibrary.com

সূরায়ে রোমের শিক্ষা ঃ

সূরায়ে রোমের প্রথম রুকূটি চিরদিনই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও দৃঢ় মনোবল দান করিয়া আসিয়াছে। চরম নির্যাতিত পরিবেশে শেষ নবীর ইসলামী আন্দোলনকে এই সূরার মাধ্যমে হিম্মৎ দান করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক মুমিনগণকে শুধু সাহায্যের আশ্বাসই দান করেন নাই বিজয় দিবেন বলিয়া ওয়াদাও করিয়াছেন। এই রুকুতে বহু মূল্যবান শিক্ষা রহিয়াছে।

প্রথম শিক্ষা ঃ

এই ওয়াদা বিশেষ কোন কালে বা বিশেষ নামের কতক লোকের জন্য নয়। নবী করীম (ছাঃ) ও তাহার সহকর্মীগণ মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিক বিপ্লব আনয়নের জন্য যে মহান আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন যুগে যুগে এই পবিত্র দায়িত্ব লইয়াই নবীগণ দুনিয়ায় আসিয়াছেন। যখনই নবীদের সহিত নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, মৌলিক মানবীয় গুণবিশিষ্ট এক জামায়াত লোক ইসলামী বিপ্লবের জন্য (আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে) একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করিয়া জীবনদান করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন তখনই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা এই সাহায্যের ওয়াদা দ্বারা নবীদের সহকর্মীগণকে সর্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন। আল্লাহর ওয়াদা সর্বকালে ও সর্বদেশে এই জাতীয় আন্দোলনকারী মুখলিছ জামায়াতের জন্যই নির্ধারিত।

দ্বিতীয় শিক্ষা ঃ

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জাতি ও দলের জন্য পার্থিব শক্তির ভিত্তিতে জয় পরাজয় ও উত্থান পতনের যে সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন, ইসলামের বিজয়কে তিনি সে নিয়মের অধীন করেন নাই। ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল , রণকৌশল ইত্যাদির দিক দিয়া ইসলামী আন্দোলনকারীদের সম্বল কম হইলেও ঈমান, চরিত্রবল, আল্লাহর উপর নির্ভরতা ইসলামের জন্য জীবনদানের জযবা ইত্যাদি দ্বারা ভূষিত হওয়ার ফলে আল্লাহ পাক তাহার সাহায্যরূপ মহা অস্ত্রের মাধ্যমে তাহাদিগকে বিজয় দান করে। জয় পরাজয়ের সাধারণ নিয়মে বিচার করিলে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হওয়া উচিত ছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ফলে বদরে মুসলমানদের বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম ভাগে তাহাদের পরাজয় হয়। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে মুসলমানদের সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় বদরে এক-তৃতীয়াংশ এবং হুনাইনের বেলায় তিনগুণ ছিল। কিন্তু হুনাইনের যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানদের একাংশ (বিজয় যুগের কতক নতুন মুসলমান) নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর সামান্য ভরসা করায় প্রথমে তাহাদিগকে পরাজয় দান করেন। আল্লাহ পাক এ কথাটি সূরায়ে তওবার ২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা গেল যে মুসলমানগণ পার্থিব বিচারে দুর্বল হইলেও সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা থাকিলে বিজয়ী হইবে এবং সর্বদিক দিয়া সবল হইলেও আল্লাহর সাহায্য না

www.bjilibrary.com

পাইলে পরাজিত হইবে। যাহারা নিজেদের সমগ্র শক্তি ও ইচ্ছা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তবক্ষেত্রে কুরবান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন একমাত্র তাহাদিগকেই তিনি সাহায্য করেন।

তৃতীয় শিক্ষা ঃ

একজন দুইজন লোকের মধ্যে বা বিচ্ছিন্নভাবে বহু লোকের মধ্যে উপরোক্ত গুণ থাকিলেও আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা সাহায্য পাঠাইবার জন্য একটি শর্ত রাখিয়াছেন। উপরোক্ত গুণসম্পন্ন মানুষের একটি মজবুত জামায়াত যে পর্যন্ত দ্বীনকে কায়েম করার সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা না চালায় সে পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসে না। এই জন্য নবীদের মত সর্বগুণসম্পন্ন মহাপুরুষগণকে আল্লাহর সাহায্যের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। সমাজ হইতে ইসলামী আদর্শের উপযোগী লোকদেরকে তালাশ করিয়া বাহির করা, তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তোলা এবং সমাজের ইসলাম বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রামের মাধ্যমে দুর্বলচেতা লোকদেরকে আন্দোলন হইতে ছাটাই করিয়া আদর্শনিষ্ঠ এক জামায়াত সৃষ্টি না করা পর্যন্ত রসূলগণও আল্লাহর সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া সংগ্রাম যুগে বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষ হইতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর যে কঠোর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিতে থাকে তাহারই মাধ্যমে এমন একটি পর্যায় আসে যখন একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আর কোন উপায়ই তাহাদের থাকে না। এই রূপে যখন বিরোধী শক্তির সহিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের মধ্যে একমাত্র নিষ্ঠাবান লোকদের জামায়াতী ঐক্য সম্পূর্ণ মজবুত হইয়া উঠে তখনই আল্লার সাহায্য পাওয়ার শর্তটি পূর্ণ হয়। একথাই সূরায়ে বাকারার ২১৪ নং আয়াতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ -

(البقرة - ٢١٤)

"তোমরা কি বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়া ধারণা কর? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী (আন্দোলনকারীদের) লোকদের উপর যেসব (বিপদ) আসিয়াছিল তাহার কোন কিছুই এখনও তোমাদের উপর আসে নাই। তাহাদিগকে দুরবস্থা ও বিপদ এমন চরমভাবে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে যে রসূল স্বয়ং এবং তাহার ছাহাবী মুমিনগণ এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন যে আল্লাহর সাহায্য কখন আসিবে? জানিয়া রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই আছে।"

www.bjilibrary.com

চতুর্থ শিক্ষা ঃ

অনৈসলামী শক্তির দাপট পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য এবং বস্তুজগতে তাহাদের প্রাধান্য দেখিয়া নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাহারা শক্তির দাপট দেখাইয়া আদর্শবাদী আন্দোলনকে দমন করিতে চায় বলিয়া ঘাবড়াইবার কোন হেতু নাই। অতীতে ইহাদের চেয়েও অনেক শক্তিশালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা রসূলের আনিত জীবন বিধানকে অস্বীকার ও বিদ্রূপ করার ফলে যেমন ধ্বংস হইয়াছে। বর্তমানে যাহারা সেই পথ অবলম্বন করিবে তাহারাও নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। বিপুল ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

যাহারা আখেরাতে বিশ্বাসী তাহারা কোন অবস্থায়ই শক্তির দাপটকে গ্রাহ্য করিতে পারে না। কেননা তাহারা বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার স্বল্পস্থায়ী জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিলেই পরকালের অনন্ত জীবনের পরম শান্তি লাভ হইবে। তাই পার্থিব কোন ক্ষতি, এমনকি মৃত্যুর হুমকিও তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

আজ যাহারা আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে বিপুল বস্তুশক্তি দেখিয়া ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা কুরআন হাদীসের অধ্যয়ন সত্ত্বেও সূরায়ে রোমের শিক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। ইসলামকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে জান ও মালের কুরবানী দেওয়ার মতো মনোবল যাহাদের সৃষ্টি হয় নাই তাহারা নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকিবার জন্যই বিরুদ্ধ শক্তির প্রাবল্যের অজুহাত পেশ করে। আর যাহারা নিরাশ না হইয়া আল্লাহর ওয়াদা বিশ্বাস করে তাহারা সকল অবস্থায়ই সংগ্রাম করিয়া চলে।

পঞ্চম শিক্ষা ঃ

আল্লাহ-বিরোধী ও অনৈসলামী শক্তিকে আল্লাহ তায়ালা অনর্থক ধ্বংস করেন না। যখন ইসলামী আদর্শ লইয়া একদল লোক আন্দোলন গড়িয়া তোলে তখনই ঐ শক্তির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। এই সংঘর্ষে ক্রমেই ইসলামী শক্তি যদি দানা বাধিয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলে বিরোধী পক্ষ ইহাকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। এই অবস্থায় ইসলাম বিরোধী শক্তি খোদার বিদ্রোহী রূপে প্রমাণিত হয়। ফলে সেই শক্তির ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পড়ে।

যদি ইসলামের বিপ্লবী বাণী লইয়া কোন আন্দোলনই না হয় তাহা হইলে অনৈসলামী শক্তিকে ধ্বংস করারও কোন কারণ ঘটে না। যদি ইব্রাহীম (আঃ) আন্দোলন শুরু না করিতেন তাহা হইলে নমরূদের ধ্বংস হওয়ার কোন কারণই ছিল না। মুসা (আঃ) ফেরাউনের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে ফেরাউনও এইভাবে ধ্বংস হইত না।

সুতরাং সমাজ হইতে ইসলাম বিরোধী সকল শক্তিচক্রকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে ইসলামকে কায়েম করার আন্দোলনই একমাত্র উপায়। ইসলামী জীবন ধারাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুপরিকল্পিত সর্ব প্রকার চেষ্টা সাধনা করার নামই

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলন। এই আন্দোলন ছাড়াই যাহারা অনৈসলামী শক্তির ধ্বংস কামনা করেন তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। ইসলামী আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়াই খোদাহীন শক্তির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ।

শেষ কথা ঃ

সূরায়ে রোমের প্রথম রুকুর তফসীর প্রসঙ্গে আরও অনেক জরুরী বিষয় ও তত্ত্বকথা আলোচনা করা বাকী রহিল। আলোচনা অনেক দীর্ঘ হওয়ার আশংকায়ই সে সব উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে বাধ্য হইলাম।

যাহারা কুরআন মজিদকে মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ পাকের নির্ভুল বাণী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহারা ইসলামী আন্দোলন করিতে গিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াও সূরায়ে রোম এ উল্লেখিত আল্লাহর ওয়াদা ভুলিতে পারিবে না। সূরায়ে রোম কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার মুজাহিদগণকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকিবে। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুসলমানকে সূরায়ে রোম এর শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করার তৌফিক দিন, আমীন।

নোটঃ ১৯৬১ সালে মাওলানা আঃ রহীম ও জনাব নূরুজ্জামানের যৌথ প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনে এ দারসটি মুদ্রিত হয়। উল্লেখ্য যে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান "মসলিজে তামীরে মিল্লাত"-এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করতে থাকে।

[১৯৬১ সালে মজলিসে তামীরে মিল্লাত নামক সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত দারসে কুরআন]

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস

প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক। শাসনতন্ত্র ব্যতীত কোন দেশই সুষ্ঠুরূপে চলিতে এবং উহার দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্রই হয় প্রত্যেক দেশের জনগণের স্বাধীনতার সনদ, তাহাদের মতবাদ ও আদর্শের বাস্তব প্রতীক।

পাকিস্তান পৃথিবীর মানচিত্রে নূতন সৃষ্ট স্বাধীন দেশসমূহের অন্যতম। অতএব উহারও একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। এই জন্যই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরই পাকিস্তানের নিজস্ব আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আন্দোলন জাগিয়া উঠে!

পটভূমি ঃ

এই আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল দেশের সচেতন আদর্শবাদী জন-নেতা ও জনতার পক্ষ হইতে। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশে-যেখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন রহিয়াছে, সেখানে উহার জন্য আন্দোলনের আবশ্যকতা দেখা দিল কেন? বস্তুতঃ ইহা এমন একটি প্রশ্ন , যে সম্পর্কে সকল দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তিরই মনে বিস্ময় জাগে এবং ইহার সঠিক উত্তর প্রদানও একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। তবুও শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস রচনার সময় এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া যাওয়া কিছুতেই চলিতে পারে না!

পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমান একটি অমুসলিম জাতির অধীনতা ও দাসত্বের নাগপাশে বন্দী থাকিয়াও তাহারা এক মুহূর্তের তরেও ভুলিতে পারে নাই যে, তাহারা মুসলমান; গোলামী ও পরাধীনতা নয়—প্রকৃত স্বাধীন পরিবেশে এক আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী খাঁটি মুসলমান হইয়া জীবন যাপন করাই তাহাদের আসল বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য। তাই গোটা মুসলিম জাতি স্বাধীনতার আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে ঝাপাইয়া পড়ে। কিন্তু শুধু বৃটিশের গোলামী হইতে মুক্ত হওয়াই তাহাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না, বরং বৃটিশের দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার মানবীয় দাসত্বের শৃংখল চূর্ণ করিয়া পূর্ণ স্বাধীন হওয়া এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত এক আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গঠন করিয়া তোলাই ছিল উহার মূল লক্ষ্য!

বস্তুতঃ পাকিস্তান দাবীর মূল কথা ইহাই। কিন্তু যাহাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই

www.bjilibrary.com

যাহাদের হস্তে ইহার শাসন কর্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহারা সকলেই শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া পাকিস্তানের মূল লক্ষ্যকেই সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত মূল লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কর্মতৎপরতাই শাসকদের জীবনে প্রকট হইয়া উঠে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই পাকিস্তান হাছিল করা হইয়াছে,তাহারা একথা শুধু ভুলিয়াই বসে নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মহীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাস্তাবায়িত করাই শাসকদের সকল কর্মতৎপরতার লক্ষ্য কেন্দ্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন দেশের জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ইসলামী জনতা ও জননেতাগণ অবস্থার সাংঘাতিক রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং ইসলামী ব্যবস্থাকে জাতীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতিদানের জন্য অনতিবিলম্বে আন্দোলন শুরু করেন।

সূচনা ঃ

পাকিস্তানে ইস্‌লামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৮ সনের ৬ই জানুয়ারী। এই দিন পাকিস্তান জামায়াতে ইস্‌লামীর আমীর মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রেডিও পাকিস্তানের আমন্ত্রণক্রমে "ইসলামের জীবন পদ্ধতি" সম্পর্কে পাঁচটি রেডিও বক্তৃতা দিতে শুরু করেন এবং ৬ই জানুয়ারী হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত (১) ইস্‌লামের নৈতিক আদর্শ, (২) ইসলামের রাজনীতি (৩) ইসলামের সমাজনীতি, (৪) ইসলামের অর্থনীতি এবং (৫) ইসলামের আধ্যাত্মবাদ—এই পাঁচটি বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন।

ঠিক এই সময়ই লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের পক্ষ হইতে "ইসলামী আইন" সম্পর্কে বক্তৃতা দানের জন্য মওলানা মওদূদীকে আহ্বান করা হয়। আইন কলেজের এই বক্তৃতায় মওলানা মওদূদী এক দিকে যেমন আইন ও জীবন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন, অপর দিকে পাকিস্তানে ইসলামী আইনের অপরিহার্যতা এবং উহার বাস্তবায়নের কার্যকরী পন্থাও তিনি বিস্তারিতভাবে পেশ করেন। ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্রের নাম শুনিলেই পাশ্চাত্যপন্থী ধর্মহীন দল নাক সিটকাইয়া যে সব উক্তি করিতে থাকে, মওলানা মওদূদী তাঁহার এই বক্তৃতায় উহার প্রত্যেকটি উক্তির তীব্র ও দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর দেন। ইসলামী আইন বিষয়ক এই বক্তৃতার শেষভাগে তিনি আদর্শ প্রস্তাব পাশ করিয়া খোদার প্রভুত্ব ও মানবীয় প্রতিনিধিত্বের কথা স্বীকার করিতে ও দেশে ইসলামী আইন চালু করার প্রতিশ্রুতি জাতিকে দিবার জন্য গণপরিষদের উপর চাপ দিলেন। অতঃপর পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ইহা সারা পাকিস্তানের একটি গণদাবীর মর্যাদা লাভ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এই দাবী অত্যন্ত জোরালোভাবে মাথা জাগাইতে শুরু করে। প্রতিটি ঘর, মসজিদ, মহল্লা, গ্রাম, শহর ও জনসভার পক্ষ হইতে এই দাবীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সম্মুখে প্রেরিত হইতে শুরু হয়।

www.bjilibrary.com

আদর্শ প্রস্তাব দাবীর প্রতিক্রিয়া ঃ

এই আন্দোলনের ফলে আদর্শ, নীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলাম-দুশমন শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিদাতা মুসলিম লীগ এবং উহার সরকার ও গণপরিষদ পায়ের নীচ হইতে জমিন সরিয়া যাওয়ার ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইল ঃ মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে আদর্শ প্রস্তাব ও ইসলামী জীবন রূপায়ণের যে সর্বাত্মক দাবী সমগ্র দেশব্যাপী উত্থিত হইয়াছে, তাহাকে কোনক্রমেই দমন করা সম্ভব নয়। অথচ তাহা স্বীকার করিয়া লইলে একদিকে ইসলামকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার ঝুঁকি লইতে হয় এবং অপরদিকে মওলানা মওদূদীর ন্যায় একজন 'মওলবী'র নিকট পরাজয় বরণ করিতে হয়। শাসন ক্ষমতা, মন্ত্রীত্বের গদি এবং দেশের সমগ্র ক্ষমতা ও সম্পদ গ্রাসে ইচ্ছুক মুসলিম লীগ এই কাজ কিরূপে করিতে পারে।... অতএব মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীকেই খতম করিয়া দাও, দেখিবে সব আন্দোলন আলোড়নের সমাপ্তি হইয়া যাইবে এবং নিশ্চিন্তে ও মহানন্দে দেশ শাসনের নামে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের স্টীমরোলার চালাইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ বিপদশূন্য হইবে।

এই সময় সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীকে একটি 'রাজনৈতিক দল' বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। অথচ জামায়াতে ইসলামী আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী কোন ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক দল মোটেই নয়। অতঃপর জামায়াতে ইসলামীর ইসলামী জ্ঞানগর্ভপূর্ণ গ্রন্থরাজী ও পত্র-পত্রিকা স্পর্শ করাও সরকারী কর্মচারীদের জন্য 'হারাম' ঘোষণা করা হয়। সরকারী পর্যায়ে ইসলামী ও ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন শিক্ষিত যুবকদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার ব্যাপক চেষ্টা চলে। মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর উপর গোয়েন্দা বিভাগের কঠোর পাহারা মোতায়েন করা হয়, নানা প্রকার মিথ্যা ও অমূলক কথা দ্বারা মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্র সরকারী পর্যায়েই হইতে থাকে।

প্রথম হামলায়ই শাসকদের পরাজয় ঃ

১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পকেটের "সম্পূর্ণ অচল মুদ্রা" সমূহ দেশের সমগ্র ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া লয়। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্রসমূহ জননিরাপত্তা আইনের সাহায্যে বিনা কারণেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের একতরফা প্রবল অভিযান চলে সরকারী উপায় উপাদানের মারফতে! অবশেষে ১৯৪৮ সনের ৪ঠা অক্টোবর মাওলানা মওদূদী, মওলানা আমীন আহ্সান ইছলাহী ও মিয়া তোফাইল মোহাম্মদকে নিরাপত্তা আইন বলে গ্রেফতার করা হয়।

ক্ষমতা মদ-মত্ত লীগ সরকার মনে করিয়াছিল, এই আঘাতে জামায়াতে ইসলামী তথা গোটা ইসলামী আন্দোলন একেবারেই কবরস্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু ফল দাঁড়াইল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আদর্শ প্রস্তাবের দাবী পূর্বাপেক্ষা ৫০ গুণ বেশী তীব্র হইয়া

www.bjilibrary.com

উঠিল। ইসলামী আন্দোলনকে বানচাল করাই যে ছিল এই গ্রেফতারীর মূল উদ্দেশ্য; একথা বিদ্যুৎ গতিতে পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। তাই মওলানা মওদূদীর আরব্ধ আন্দোলনকে ইসলামী জনতা নিজেদের মনের ও প্রাণের আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করিল। এই সর্বাত্মক দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন-আলোড়নে অতিষ্ঠ হইয়া ১৯৪৯ সনের ১২ই মার্চ তদানীন্তন লীগ-প্রধান গণপরিষদ মওলানা মওদূদীর উত্থাপিত চার দফা দাবীর অনুসারেই আদর্শ প্রস্তাব পাশ করে।

আদর্শ প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর স্বভাবতঃই ইসলামী জনতার আশা ছিল, স্বয়ং সরকারই উহার মর্যাদা রক্ষায় তৎপর হইবে এবং ইসলামী আদর্শে দেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করিবে। কিন্তু মুসলিম লীগের ন্যায় একটি পার্টি সম্পর্কে সেরূপ আশা যে নিতান্ত মরীচিকা, তাহা আদর্শ-প্রস্তাবোত্তর সরকারী কর্মতৎপরতার দ্বারাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। মীনা বাজার, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ও ধর্মহীন ভাবধারার ব্যাপক প্রচার এমনভাবে শুরু হয় যে, তাহা দেখিয়া সকলেরই মনে হইয়াছে যে, শাসকগণ দেশে ইসলামের নাম নিশানা পর্যন্ত বজায় রাখিতে প্রস্তুত নহে!

আদর্শ প্রস্তাবের পর উহার সঠিক ভাবধারা অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই উদগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই সময়-১৯৫০ সনের মে মাসে হাইকোর্টের এক রায়ে মওলানা মওদূদীর আটক বে-আইনী প্রমাণিত হয় এবং তিনি তাঁহার সঙ্গীদ্বয়সহ কারাগার হইতে বহির্গত হন।

বিশ্বাসঘাতকতা ঃ

১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মূলনীতি কমিটির একটি শাসনতান্ত্রিক রিপোর্ট জনগণের সম্মুখে পেশ করা হয়। এই রিপোর্ট দর্শনে দেশবাসী স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কেননা এই রিপোর্ট দ্বারা পূর্ব গৃহীত আদর্শ প্রস্তাবের মর্যাদা সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ন করা হইয়াছিল, উহার মারফতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারায় এই মূলনীতির রিপোর্টের প্রতিটি ধারা বিষাক্ত হইয়াছিল। তাই চতুর্দিক হইতে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবল আলোড়ন জাগিয়া উঠে। মওলানা মওদূদী উহার সমালোচনা করিয়া যে বক্তৃতা করেন, পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা এক অবিস্মরণীয় জিনিস! তিনি উহার প্রতিটি ধারার সমালোচনা করিয়া উহাতে ইসলাম ও গণ-অধিকারকে কিভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। গণপরিষদ বাধ্য হইয়া এই মূলনীতি রিপোর্ট বাতিল করে। কিন্তু মুসলিম লীগের ইসলাম– দুশমনী তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, বরং পরাজিত বিড়ালের ন্যায় বলিয়া উঠিলঃ দেশের মৌলবীরাই সকল অনর্থের মূল, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র ঐকমত্যের অস্তিত্ব নাই, অতএব এখানে ইসলামী শাসনতন্ত্র হইতে পারে না- ইত্যাদি, ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

চ্যালেঞ্জের জওয়াব ঃ

কিন্তু অনতিবিলম্বে এই মিথ্যা প্রচারণার মুখেও চুনকালি পড়িল। ১৯৫১ সনের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের রাজধানী করাচী শহরে সারা পাকিস্তানের সকল উল্লেখযোগ্য দল ও মতের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ মিলিত হইয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ২২টি মূলনীতি রচনা করিয়া দেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, প্রকৃতপক্ষে দেশের আলেম সমাজের মধ্যে মূলগত কোন মতবৈষম্যের অবকাশ নাই, মতবিরোধ থাকিলে তাহা একমাত্র দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই বর্তমান। বস্তুতঃ বিগত এক হাজার বৎসরের ইসলামী ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা এক বিস্ময়কর ও অভাবিতপূর্ব ব্যাপার। ইহাতে একদিকে যেমন ধর্মবিরোধী মনোভাবাপন্ন সমাজ বিস্মিত ও হতচকিত হইল অপরদিকে ইসলাম-দুশমন লীগ শাসকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, এবং শাসনতন্ত্র রচনার কথাটিকেই একেবারে ভুলিয়া বসিল।

১৯৫২ সনের মে মাসে মওলানা মওদূদী করাচী শহরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুনরায় শাসনতন্ত্রের প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ৮টি মূলনীতির ভিত্তিতে উক্ত মাসের মধ্যেই শাসনতন্ত্র রচনাকার্য সমাপ্ত করার জন্য গণপরিষদের নিকট দাবী পেশ করেন। এই আটটি দফায় সর্বদলীয় আলেমদের রচিত ২২ দফারই সারাংশ ও একটি ইসলামী শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য মূলনীতিসমূহ শামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সারা পাকিস্তানে এই দাবী অভূতপূর্বরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গোটা জনতার মধ্যে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। দেশের প্রতিটি কোণ হইতে এই আট দফা শাসনতান্ত্রিক দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গণপরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে শুরু করে। ফলে তদানীন্তন গণপরিষদ ইসলামী জনতার সম্মুখে নতিস্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর '৫২ সনের ২২শে ডিসেম্বর গণপরিষদের সম্মুখে যে মূলনীতি রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হয়, তাহাতে ইসলামী জনতার দাবী অন্ততঃ ১৪ আনা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ইসলামের দুশমনদের সুস্পষ্ট পরাজয় সূচিত হইয়াছিল।

মারাত্মক হামলা ঃ

কিন্তু ইসলামী জনতার এই বিজয় ও ইসলাম-দুশমন শাসকদের এই পরাজয় ইসলাম বিরোধী লীগ শাসকদের পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিলঃ ইসলামী শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পথে কোন আইনগত ও নীতিগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কাজেই তাহারা একটি ব্যাপক ও মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিল! তাহারা পাঞ্জাবে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন নামে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সেজন্য সরকারী অর্থ বিনা হিসাবে ব্যয় করা হয়। কতকগুলি দৈনিক সংবাদপত্র ও তথাকথিত কংগ্রেসী মৌলবীদেরও ভাড়া করা হয় এই আন্দোলনকে এক সাংঘাতিক পর্যায়ে পৌঁছাইবার জন্য! ফলে যে মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, তাহা দমন করার জন্য লাহোরে সামরিক শাসন চালু করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সামরিক

www.bjilibrary.com

শাসনের ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ণরূপে থামিয়া যায় এবং সামরিক শাসনের অবসানের সময় নিকটবর্তী হয়। কিন্তু তখনো একটি কাজ অবশিষ্ট ছিল, যাহা অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃস্থানীয় ৫৫ জন কর্মীকে বিনা কারণে গ্রেফতার করে। কেন্দ্রীয় সরকার 'ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্সে'র বলে মাওলানা মওদূদীর কোর্ট মার্শাল করে এবং তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দানের রায় শোনানো হয়।

ইসলাম-দুশমন শাসকগোষ্ঠী মনে করিয়াছিল যে, এই উপায়ে অতি সহজেই মওলানা মওদূদী ও ইসলামী আন্দোলনকে বোধ হয় 'খতম' করা যাইবে। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা নিতান্তই আকাশ-কুসুম প্রমাণিত হইল। মওলানা মওদূদীর এই দণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম জাহান তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাইল। ফলে কর্তৃপক্ষ ৩৬ ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যুদণ্ডকে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করিয়া দিল!

শিখণ্ডি পরিবর্তন ঃ

ঠিক এই সময়ই মিঃ নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে আকস্মিকভাবে পদচ্যুত করিয়া বগুড়ার মিঃ মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী করার মূলে ইসলামী শাসনতন্ত্র বানচাল করা এবং দেশে আমেরিকাতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল। তাই দেখা গেল ঃ মিঃ মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়াই বলিলেনঃ "ইসলামী শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে জানি না এবং পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র নয়—অন্তর্বর্তীকালীন ধর্মহীন শাসনতন্ত্রই প্রবর্তিত হইবে!" মিঃ মোহাম্মদ আলী বোধহয় পাকিস্তানকে আমেরিকা মনে করিয়াই এই সব উক্তি করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু গোটা দেশের ইসলামী জনতার মধ্যে তাহার দায়িত্বজ্ঞান বর্জিত উক্তির তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে শুরু হইল। জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতৃস্থানীয় কর্মী কারারুদ্ধ থাকিলেও যাঁহারা মুক্ত ছিলেন তাঁহারা পূর্ণোদ্যমে ইসলামী জনতার নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। জামায়াতে ইসলামীর সারা পাকিস্তান ভিত্তিক সংঘবদ্ধ ও যুক্তিসংগত আওয়াজে অন্তর্বর্তীকালীন ও ধর্মহীন শাসনতন্ত্রের আওয়াজ মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। ফলে স্বয়ং মোহাম্মদ আলীই নাজিমুদ্দীন কর্তৃক উপস্থাপিত '৫২ সনের মূলনীতি রিপোর্টকেই যাহাতে বহু ইসলামী ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছিল এবং যাহা দ্বারা ইসলামী জনতার বিজয় সূচিত হইয়াছিল-গণপরিষদে আলোচনার্থে পেশ করিলেন। এই আলোচনার ফলে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং ২৫শে ডিসেম্বর এই শাসনতন্ত্র জাতিকে উপহার দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

গণপরিষদ বাতিলের প্রতিক্রিয়া ঃ

কিন্তু ইসলাম দুশমন শাসকদের একটি শেষ মরণ-কামড় এখনো বাকী ছিল। ১৯৫৪ সনের ২৪শে অক্টোবর জাতিকে শাসনতন্ত্র উপহার দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ণ দুই মাস পূর্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনাকারী গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং

www.bjilibrary.com

সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইল। দেশ এই অভাবিতপূর্ব আকস্মিক ঘটনায় এক মহা অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। ইসলাম- দুশমনদের পাগলা চীৎকার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে সমগ্র দেশ জর্জরিত হইয়া উঠিল। ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধী গণশত্রুরা গণপরিষদ বাতিলকারী 'প্রধান শয়তান'-কে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য প্রবল প্রতিযোগিতায় কোমর বাঁধিয়া নামিল। দেশের সব অনৈসলামিক কৃতিত্বের ফুল কুড়াইয়া এই 'কালী মূর্তির' গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। সারাদেশে এক চরম অরাজকতা ও অস্বস্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

জামায়াতে ইসলামীর নূতন তৎপরতা ঃ

গণপরিষদ বাতিলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইল। শেষ পর্যন্ত ফেডারেল কোর্টের রায়ে নূতন গণপরিষদ গঠন করা অপরিহার্য হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নয়- আইনের ত্রুটির জন্য এই সময় মওলানা মওদূদীও মুক্তি পাইলেন, যাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া শেষ করার মতলব ছিল। তিনি মুক্তি পাইয়া জাতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশের জন্য আবার কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া আসিলেন। নূতন গণপরিষদ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হইতে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন নূতনভাবে শুরু করা হইল। বিরাট ইসলামী জনতা আবার ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে তৎপর হইয়া উঠিল। এই সময় জামায়াতে ইসলামী সর্বমুখী আন্দোলন পরিচালিত করে। একদিকে জনগণের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় প্রচারকার্য ব্যাপকভাবে চালানো হয় এবং '৫২ সনের মূলনীতি রিপোর্টের ও '৫৪ সনের গৃহীত ইসলামী ও গণঅধিকার সম্মত ধারাসমূহ মুদ্রিত আকারে জামায়াতের পক্ষ হইতে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। অপর দিকে গণপরিষদের অভ্যন্তরে পরিষদ সদস্যদের মধ্যে এই জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালানো হইল। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হইতে এই কাজের জন্য ৬ জন যোগ্য কর্মী নিয়োগ করা হইল।

এই সময় মওলানা মওদূদী পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্রীয়স্থান পরিভ্রমণ করেন, বিরাট ইসলামী জনতা তাঁহার নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনেই শুধু যোগদান করে নাই, এই কাজের জন্য তাহারা হাজার হাজার টাকাও প্রদান করিয়া এই মহান আন্দোলনকে দুর্জয় ও অপ্রতিরোধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

১৯৫৫ সনের নভেম্বর মাসে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলন করাচী শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় জাহাঙ্গীর পার্কের এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশে মওলানা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা বুঝাইয়া যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলনে উহার মূল্য অত্যধিক। অনতিকালের মধ্যে দেশের জন্য যে শাসনতন্ত্রের খসড়া গণপরিষদে রচিত হইতেছিল, উহার ইসলামী রূপদানের ব্যাপারে এই সম্মেলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য।

১৯৫৬ সনের শুরুতে গণপরিষদের সম্মুখে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হইতে এই খসড়ার উপর বিস্তারিত সংশোধনী পেশ করা

www.bjilibrary.com

হয়। পরে এই সংশোধনী সকল ইসলামী দলের পক্ষ হইতেও সমর্থন লাভ করে এবং সর্ববাদী সম্মত সংশোধনী হিসাবে গণপরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

এই সময় বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সেকিউলারিষ্টদের- হিন্দু ও আওয়ামী লীগারদের- ইসলাম বিরোধী কর্মতৎপরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং ইহাদের প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে সকল ইসলামী ধারার প্রবল বিরোধিতা করিতে শুরু করে। ইহারা শাসনতন্ত্রের ইসলামী রূপ- বিশেষতঃ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত আইন রচনা করা যাইবে না বলিয়া ঘোষণা করা, রাষ্ট্রপ্রধানের মুসলিম হওয়া, দেশের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র রাখা, পূর্ববাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখার এবং পৃথক নির্বাচন বজায় রাখার বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োজিত করে। উপরন্তু তাহারাই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে বলিয়া দাবী করে।

এই সময় ঢাকাতে প্রায় পাঁচশত আলেমদের সমন্বয়ে এক সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা মওদূদীসহ জামায়াতে ইসলামী ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহাতেও সকল ইসলামী দলের প্রকাশিত সংশোধনীকে একবাক্যে সমর্থন করা হয় এবং অনুরূপ সংশোধনী অনুযায়ী পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার দাবী জানানো হয়। এই সম্মেলনে ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবীর অভিযান চালাইবার জন্য মওলানা মওদূদীর ঘোষণার প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর ২৯শে ফেব্রুয়ারী শাসনতান্ত্রিক বিল গণপরিষদে পেশ করা হয় এবং অনতিবিলম্বে তাহা গভর্ণর জেনারেলের মঞ্জুরী লাভ করিয়া ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। যদিও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাতে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল। ইহাতে প্রত্যেক পাঠকই বুঝিতে পারেন যে, এই শাসনতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায় নাই বরং ইহার জন্য অবিশ্রান্ত গণআন্দোলন করিতে হইয়াছে, আন্দোলনকারী জননেতাদের কারাবরণ ও ফাঁসীর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং এজন্য লক্ষ লক্ষ টাকাও ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ইসলামী জনতার দীর্ঘ সাধনালব্ধ ফল। বস্তুতঃ পাকিস্তানের ইসলামী জনতা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার সঠিক আন্দোলনে উহার সকল বিরোধী দল ও মতকে পরাজিত করিয়া বিপুলভাবে জয়যুক্ত হইয়াছে। ইসলামী আদর্শে দেশ ও জীবন-গঠন-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ের এই বিজয় পরবর্তী স্তরেও নিশ্চিত জয়ের সূচনা করিবে এবং সকল সেকিউলার, ইসলাম বিরোধী ও যুক্তনির্বাচন সমর্থকদের পরাজিত করিয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.bjilibrary.com

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৯৬৫ ও জামায়াতের ভূমিকা

[১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী কনভেনশন লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মিস ফাতিমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যথাক্রমে ২৮৬৮৮ ভোট এবং ৪৯৯৩৩ ভোট লাভ করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা পর্যালোচনা করে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার জুন ও জুলাই মাসে ধারাবাহিকভাবে যে প্রবন্ধ লিখেন তা নীচে প্রকাশিত হল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাপ বিরোধী দলীয় রাজনীতির বিকাশের পথে খুব জটিলতা সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গবর্ণর লেঃ জেনালের আযম খান ছিলেন খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও রাজনৈতিক পর্যালোচকগণ সুদৃঢ় অভিমত পোষণ করতেন যে সম্মিলিত বিরোধী দল আযম খানকে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী মনোনীত করে আইয়ুব খানকে পরাজিত করবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ন্যাপ সম্মেলনের শুরুতে বিরোধী দলকে দ্বিধাবিভক্ত করার লক্ষ্যে ফাতিমা জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করে এবং আযম খানের নাম যাতে কেহ প্রস্তাব না করতে পারে তার জন্য শর্ত আরোপ করে যে, সামরিক শাসনের সাথে কোন সময় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করা যাবে না। এ প্রস্তাব ছিল গণতন্ত্রের পিঠে ছুরিকাঘাত। ন্যাপ এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করতে চেয়েছিল। এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ভন্ডুল করা, দুই-তার বদনাম জামায়াতের কাধে আরোপ করে জনগণের কাছে হেয় করা। জামায়াত বিচক্ষণতার সাথে ন্যাপের রাজনীতির মুখোশ জনগণের কাছে উন্মোচিত করে। উল্লেখ্য যে, ন্যাপ তাদের প্রস্তাব করা প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে কোন কাজই করেনি। সম্পাদক]

বিগত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা, সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান ও প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মহিলা প্রার্থীকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে বিভিন্ন প্রকার অপ-প্রচার চলে আসছে। কোন সমস্যার সব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাঁরা সমাধানের পথ তালাশ করতে সক্ষম নন তাঁরা সমস্যা বৃদ্ধিই করতে পারেন, সমাধান পেশ করার তৌফিক তাদের হয় না। প্রধানতঃ এ ধরনের লোকেরাই উক্ত অপ-প্রচারের জন্য দায়ী।

তাদেরকে বুঝাবার সাধ্য আমাদের আছে কিনা জানি না। তা'ছাড়া যারা বর্তমান সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট হওয়ার দরুন জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী সিদ্ধান্ত সমূহকে

www.bjilibrary.com

'ইসলাম বিরোধী' বলে ফতোয়া দিয়ে বেড়িয়েছেন তাঁরা নিমক-হালালীরই পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাঁদের যুক্তি সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত অপ-প্রচার ও ফতোয়া দ্বারা একশ্রেণীর ইসলাম-ভক্ত লোককেও বিভ্রান্ত হতে দেখা গিয়েছে। অনেকের মনেই নানা প্রকার প্রশ্নও জেগেছে। এমনকি ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু লোকের মনেও খটকা লেগেছে। উপরোক্ত অপ-প্রচার ছাড়াও ইসলাম- দরদী কতক লোক আন্তরিকতার সাথেই জামায়াতের নির্বাচনী ভূমিকাকে পছন্দ করতে পারেননি। তাই জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা থেকে সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন পর্যন্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা এবং জামায়াতের কার্যাবলীকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি এ আলোচনা দ্বারা সব মহলের মনের খটকাই দূর হবে।

নেতৃবৃন্দের বন্দীদশার পটভূমি ঃ

১৯৬২ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে জাতীয় পরিষদে আইন পাশ হওয়ার সংগে সংগেই জামায়াতে ইসলামী পুনর্বহাল হয়। সামরিক শাসনামলের প্রায় ৫ বছর পর একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই একদিনের মধ্যে তার সংগঠনকে সামরিক শাসন পূর্ব অবস্থায় পুনর্বহাল করতে সক্ষম হয়। জামায়াতের এ সাংগঠনিক শৃংখলা সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর দেড় বছরে জামায়াতের কার্যকলাপ থেকে সরকার এ ধারণায় পৌঁছেন যে, নির্বাচনের পূর্বে জামায়াতকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে অপসারণ করা সরকারী দলের জন্য অপরিহার্য। এ বিশেষ প্রয়োজনেই ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় জামায়াতের মজলিসে শূরার ৪৮ জন সদস্য, জামায়াতের আমির ও সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তানের অতিরিক্ত ১০ জন (যাঁরা কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য নন) নেতৃস্থানীয় জামায়াত কর্মীকে তথাকথিত নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়।

জামায়াতের প্রতি এত সরকারী অনুগ্রহের কারণগুলো না জানলে জামায়াতের পরবর্তী কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হবে না বলে নিম্নে সে সব কারণ উল্লেখ করা গেল ঃ

(১) জামায়াতের সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও সামরিক শাসনকালে জামায়াতের কর্মীরা ইসলামভক্ত লোকদের সহযোগিতায় পারিবারিক আইনকে ইসলাম বিরোধী বলে বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এতে সরকারের ধারণা হয়েছে যে, মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী ময়দানে থাকলে ইসলামকে আধুনিককরণ অসম্ভব হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে সরকারী ব্যাখ্যা জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) আইন পরিষদে বা বাইরে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে কোন রকম লোভ বা ভয় দেখিয়ে নীতিচ্যুত করা যায় না। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের লোক অল্প

www.bjilibrary.com

হলেও মারাত্মক। বিশেষ করে যে দেশে স্বার্থের লোভ দেখিয়ে আলেম ও পীর পর্যন্ত কেনা যায় এবং ভয় দেখালে বুজর্গ জাতীয় লোকও হক কথা বলা বন্ধ করে দিতে রাজী হয় সে দেশে এ ধরনের কোন জামায়াতকে কেমন করে বরদাশত করা যায়?

(৩) গত ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সরকারী পর্যায়ে জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। কর্তৃপক্ষ উপযোগী স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিলেন না। সম্মেলনে লাউড-স্পীকার ব্যবহারে বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করায় অর্ডিনান্স বলে লাউড-স্পীকার নিষিদ্ধ করেন। দূর দূরাঞ্চল থেকে সম্মেলনে আগত ডেলিগেটদের রিজার্ভ করা রেল ও বাসের রিজার্ভ-অর্ডার শেষ মুহূর্তে বাতিল করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারী শান্তি রক্ষকদের সহায়তায় গুন্ডাদলের সশস্ত্র আক্রমণের ব্যবস্থা করে সম্মেলনে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয় এবং অধিবেশন চলাকালে জামায়াত কর্মী আল্লাহ বখসকে গুলী করে শহীদ করা হয়। এতসব ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল্লাহর মেহেরবানীতে তিন দিনব্যাপী উক্ত সম্মেলন বিনা মাইকেই শৃংখলার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে প্রতিপক্ষ অনুভব করতে পারলো যে, এরূপ সুসংহত ও সু-শৃংখল জামায়াতকে আইনের অপব্যবহার ব্যতীত ময়দান থেকে অপসারণ করা সম্ভব হবে না

(৪) এ সম্মেলনের পর পরই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা দেশব্যাপী দু'দফা দাবীর পক্ষে দস্তখত অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দুটো দাবী হলো বয়স্কদের ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহকে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করার দাবী। এ দাবী দুটোর পক্ষে সমগ্র পাকিস্তানের ৯ লাখ নাগরিকের দস্তখত সম্বলিত কাগজপত্র জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশন চলাকালে (১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে) ঢাকাস্থ আল-হেলাল হোটেলে পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। জাতীয় পরিষদের উক্ত অধিবেশনেই মৌলিক অধিকার আইন গৃহীত হয় এবং এ দ্বারা শাসনতন্ত্রের প্রথম সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য পরিষদের প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যা জামায়াত সদস্যগণ ব্যতীত পূরণ হয়না বলে জামায়াত সদস্যগণ সরকারকে উক্ত আইনে কতক ইসলামী ধারার সংযোজনে বাধ্য করতে সক্ষম হওয়ায় জামায়াতের উপর সরকারের বিদ্বেষ চরমে পৌঁছে।

এ মৌলিক অধিকার বিলে প্রেসিডেন্টের দস্তখত হয়ে গেলে জামায়াত আদালতের আশ্রয় সহজে নিতে পারবে আশংকা করে প্রেসিডেন্ট সাহেব দীর্ঘদিন দস্তখত দান স্থগিত রেখে প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের মাধ্যমে জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করার ৪ দিন পর ১৯৬৫ সালের ১০ই জানুয়ারীতে উক্ত বিলে স্বাক্ষর করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিরোধ কল্পে ১৯০৮ সালে ইংরেজ যে আইন রচনা করেছিল সরকার ঐ আইনের আশ্রয় নিয়েই জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক

www.bjilibrary.com

দল সম্পর্কে বর্তমান সরকারের রচিত আইনে জামায়াতকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিলনা বলেই ঐ বস্তাপঁচা আইনের অন্যায় আশ্রয় নেয়া হয়।

(৫) যে আইনের দ্বারা জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় সে আইনে জামায়াত নেতাদেরকে সংগে সংগে গ্রেফতার করার বিধান ছিল না। কিন্তু নেতৃবৃন্দ জেলের বাইরে থাকলে জামায়াতকে বেআইনী করার মহান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার আশংকায় নির্বাচনের সময় তাদেরকে জেলে রাখা প্রয়োজনীয় বলে নিরাপত্তা আইনের আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

রাজনৈতিক মহলে এর প্রতিক্রিয়া ঃ

জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় চরম আইনানুগ প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারের এহেন ব্যবহার দেখে দেশের সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নির্বাচনের পূর্বে অন্যান্য দলের সাথেও অনুরূপ ব্যবহারের আশংকা দেখা দেয়। জামায়াত হাই কোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক মহল বিশেষ মনোযোগের সাথে সে মামলার গতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে যারা জেলের বাইরে ছিলেন তারাও ইসলাম ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েন। তাই তারা অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দীন মরহুম অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ ব্যাপারে সাড়া দেন। তিনি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন যে ইসলাম ও গণতন্ত্র বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে সবার একজোট হওয়া ব্যতীত একনায়কত্বের হাত থেকে জাতির মুক্তি অসম্ভব।

জামায়াতের দৃষ্টিভংগী ঃ

জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী ঘোষিত থাকায় এবং মজলিশে শূরার সদস্যগণ জেলে আটক থাকায় স্বাভাবিক নিয়মে,এ বিষয়ে জামায়াতের মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের মধ্যে যারা জেলের বাইরে ছিলেন তাদের কয়েকজন নিজেদের দায়িত্বেই জামায়াতের পক্ষ থেকে নিম্ন কারণে সর্বদলীয় ঐক্যজোট স্থাপনের কাজে অগ্রসর হনঃ

১। বর্তমান সরকার পারিবারিক আইন জারী করে এবং সংশোধনের সুযোগ পেয়েও অনৈসলামী আইনকে জিদের বশবর্তী হয়ে বহাল রেখে নিজেদেরকে ইসলাম বিরোধী বলে প্রমাণিত করেছেন এবং কুরআন বিকৃতকারীর পরিচয় প্রদান করেছেন।

২। অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার পথে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

এ দুটো কাজই কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের সুস্পষ্ট দুশমনী। 'তাহরীফ ফীদ্দীন' (দ্বীনকে বিকৃত করা) এবং এনছেদাদ আন ছাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি) করে এ সরকার আনুগত্যের অধিকার হারিয়েছেন। এমতাবস্থায় এ ধরনের সরকারকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য।

www.bjilibrary.com

৩। সামরিক শাসনের পূর্বে যে সব দল দেশ শাসন করেছিল তারাও ইসলামের যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিল সত্য; কিন্তু তাদের আমলে এ পারিবারিক আইনটি জারী করা সম্ভব হয়নি। তখনও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার মোটামুটি বহাল ছিল বলে সরকার ইসলাম বিরোধী পারিবারিক আইনটিকে জারী করতে সাহস পাননি।

পূর্ববর্তী সরকারসমূহও দেশবাসীকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাবার কাজ করেছেন, ইসলামী আন্দোলনের পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছেন, ইসলামী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছেন এবং আন্দোলনের পুরোধাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু কোন সরকারই পাকিস্তানে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকে বে-আইনী ঘোষণা করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারেনি। তখন ইসলামী আন্দোলনকারীদের সাথে ইসলাম বিরোধীদের সংগ্রাম গণতান্ত্রিক ময়দানেই হচ্ছিল। তাই ইসলামের জন্য কাজ করা বর্তমানের তুলনায় অনেক সহজ ছিল।

৪। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কায়েম হয়েছিল এবং ইসলামের নামেই পাকিস্তান আন্দোলন পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে এত সহজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাই জনগণের ভোটাধিকার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক নীতি বহাল থাকলে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী পথে এদেশকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই একশ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্যপন্থী এদেশে গণতান্ত্রিক পন্থাকে খতম করার চেষ্টা করে এসেছে। তাদের ধারণা, এদেশকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে গণতান্ত্রিক পথে তা সম্ভব হবে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধ করতে হলে গণতন্ত্র বহাল রাখা চলবে না।

ঠিক এ কারণেই এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ কথা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামকে এ দেশে জয়যুক্ত করতে হলে গণতন্ত্র অপরিহার্য। ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জনগণের সমর্থন আদায় করায় এ দেশে ইসলাম কায়েম করতে জনগণের সমর্থনই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায়। জনগণের হাতে ভোটাধিকার থাকলে এ দেশের রাজনীতিতে ইসলাম এক কার্যকরী শক্তিশালী আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই যারা পাকিস্তানে ইসলামকে কায়েম করতে আগ্রহশীল তারা ইসলামের জন্যই গণতন্ত্রকে বহাল করা অত্যাবশ্যক মনে করেন।

৫। জামায়াতে ইসলামী বহাল থাকলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরাট দায়িত্ব একার পক্ষে পালন করা সম্ভব হতো না। খাজা নাজিমুদ্দীন ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর ন্যায় ইসলামপন্থীদের সহযোগিতায় সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণতন্ত্রকে বহাল করার সংগ্রাম তখন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত একনায়কত্ব থেকে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় যে বাকী নেই তা সবার নিকটই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

উপরোক্ত পাঁচটি যুক্তির ভিত্তিতেই জামায়াতের কয়েকজন দায়িত্ব- বোধসম্পন্ন লোক পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেন এবং ইসলামের খাতিরেই সম্মিলিত গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

www.bjilibrary.com

৯-দফার ভিত্তিতে
সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন ঃ

জামায়াতের নেতৃবৃন্দের জেলে থাকা অবস্থায়ই একনায়কত্বের অবসান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঐক্যজোটই সম্মিলিত বিরোধী দল' বা 'কপ' নামে খ্যাত হয়। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে যুক্ত ইশতেহার ও ৯ দফা কর্মসূচী রচিত হয় তাতে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর দান করেন এবং বে-আইনী ঘোষিত জামায়াতে ইসলামীর কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও নিজেদের দায়িত্বে এতে দস্তখত করেন।

পত্রিকা মারফতে জামায়াত নেতৃবৃন্দ জেলেই এসব রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন এবং পত্রিকায় প্রকাশিত ৯ দফা কর্মসূচীতে ইসলাম বিরোধী বা জামায়াতের নীতিবিগর্হিত কোন কথা না থাকায় তারা এ ঐক্যজোটকে পছন্দই করলেন। বিশেষ করে ৮ম দফায় 'শাসতন্ত্রে সংযোজিত ইসলামী বিধানাবলীর বাস্তবায়ন ও একটি সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশ্যে পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সটির সংশোধন সম্পর্কে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ একমত হয়ে দস্তখত দেয়ায় জামায়াত নেতৃবৃন্দ এ ঐক্যজোটকে অন্তরের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু তখনো জামায়াত বেআইনী থাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামী সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করারই সুযোগ পায়নি।

প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী মনোনয়ন ঃ

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় সম্মিলিত বিরোধী দল গঠিত হবার সময়ই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে করাচীতে পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং তখনই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করা হবে। এ নির্বাচন প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রিক বলে এ পদের মনোনয়ন ব্যতীত নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করাই সম্ভব ছিল না। তাই সর্বদলীয় জুলাই সম্মেলনেই মনোনয়ন পর্ব সমাধা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর মোকদ্দমার শুনানী তখনো সুপ্রিম কোর্টে চলছিলো বলে নেতৃবৃন্দ আশা করছিলেন যে, মাস দেড়েকের মধ্যেই কোর্টের রায় হয়ে যাবে। সে আশায়ই সেপ্টেম্বরে করাচীতে অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

সুপ্রীম কোর্টের মামলার শুনানী আগষ্টেই শেষ হওয়া সত্ত্বেও রায় স্থগিত থাকায় ১৭ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত করাচী সম্মেলনের সময়ও জামায়াত বহাল হতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানে মওলানা মওদূদীসহ ৪৪ জন নেতা তখন পর্যন্ত জেলেই আবদ্ধ রয়েছেন। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার ৫০ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২ জন ও পশ্চিম পাকিস্তানের ২ জন সদস্য তখন করাচীতে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের গুরুত্ব অনুভব করে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাবেক জামায়াতে ইসলামীর আরও কতক দায়িত্বশীল ব্যক্তি করাচীতে পৌঁছেন।

www.bjilibrary.com

প্রার্থী মনোনয়ন সমস্যা ঃ

সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে সব দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকী আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য একজন প্রার্থী মনোনীত করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। জামায়াতের পক্ষ থেকে যারা সে সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা বৈঠকী আলোচনা মারফতে যখন বুঝতে পারলেন যে, মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করার পক্ষেই সব দলের নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করছেন তখন তারা স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিলেন যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মনোনয়নকে জামায়াত কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় মনোনয়ন ব্যাপারে দুটো সমস্যা দেখা দিলো ঃ

(১) জামায়াত শরীয়তের আপত্তি থাকায় মহিলা প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারে না-কিন্তু আর ৪টি দলই এ বিষয়ে একমত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহতারিমা ছাড়া আর কোন প্রার্থীই একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণমনে উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারবে না।

(২) আর যে দু'একজন প্রার্থীর নাম জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে নির্বাচনে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব নয় জেনেও জামায়াত শরীয়তের খাতিরেই মুহতারিমাকে সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু বাকী ৪টি দলের নেতৃবৃন্দ এ সব প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য মোটেই রাজী হতে পারছিলেন না।

ওদিকে মনোনয়ন দান বিলম্বিত করাও সম্ভব ছিল না। ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবার কথা। সরকারী দল বহু পূর্বেই তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে তাদের নির্বাচনী আন্দোলনে অগ্রসর হবারও উপায় ছিলনা

জামায়াত-প্রতিনিধিদের সমস্যা ঃ

জামায়াতের পক্ষ থেকে যাঁরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মনোনয়ন সমস্যা নিয়ে সাবেক জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের যারা করাচীতে পৌছতে পেরেছিলেন তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাদের নিকট সমস্যাটি নিম্নরূপ পরিগ্রহ করে ঃ

একনায়কত্বকে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যেই প্রার্থী মনোনীত হওয়া উচিত। দেশে গণজাগরণ সৃষ্টি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বলিষ্ঠ জন সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য এমন যোগ্য প্রার্থী মনোনীত করা উচিত যার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। ক্ষমতাসীন একনায়কের বিরুদ্ধে এরূপ প্রার্থী ব্যতীত নির্বাচনে জনগণের উৎসাহ সৃষ্টি হওয়াই অসম্ভব।

এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহকে মনোনীত করাই যে উচিত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু শরীয়তকে উপেক্ষা করাও জামায়াতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ পরিস্থিতিতে জামায়াত প্রতিনিধিগণের সামনে দুটো বিরাট প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ

www.bjilibrary.com

(১) গণতান্ত্রিক পরিবেশ ব্যতীত ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতিও সম্ভব নয় বলে যদি ইসলামের খাতিরেই মহিলা প্রার্থীকে সমর্থন করা হয় তাহলে জামায়াতে ইসলামী বহাল হবার পর জামায়াত এ মত সমর্থন করবে কিনা? এখন যদি জামায়াতের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হয়, আর পরে জামায়াত যদি আনুষ্ঠানিকভাবে এ মত সমর্থন না করে তাহলে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা জামায়াতের জন্য কিছুতেই বাঞ্ছিত হতে পারে না।

(২) আর যদি জামায়াতের পক্ষ থেকে মোহতারিমার মনোনয়ন অস্বীকার করা হয় তাহলে জামায়াতকে সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে বের হয়ে আসতে হয় এবং এর যে মারাত্মক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তাতে একনায়কত্বই লাভবান হবে। এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলে জামায়াত বহাল হয়ে তার মোকাবিলা কিভাবে করবে এবং এ মুহূর্তে সম্মিলিত জোট থেকে বের হওয়াটাই বা জামায়াত সমর্থন করবে কিনা?

এ দুটো প্রশ্নের সম্মখীন হবার ফলে জামায়াত প্রতিনিধিগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে, এ অবস্থায় মুহতারিমার মনোনয়নকে সমর্থন দান করা যেমন অসম্ভব, তেমনি এ মনোনয়নের প্রতিবাদে ঐক্যজোট ভেংগে দেয়াও অনুচিত।

তাই জামায়াত বহাল হওয়া ও জামায়াত নেতৃবৃন্দের কারামুক্ত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয় বলেই বিবেচিত হলো। অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দও জামায়াত প্রতিনিধিদের এ যুক্তি মেনে নিলেন এবং প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য জামায়াতকে সময় দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করলেন।

জামায়াতের সিদ্ধান্ত ঃ

১৯৬৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই জামায়াত বহাল হয় এবং লাহোরে ২ রা অক্টোবরে এক পরামর্শ সম্মেলন আহূত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে ৪৪ জন নেতা তখনও বন্দী। উক্ত পরামর্শ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ঃ

১) জামায়াত বে-আইনী ঘোষিত থাকা অবস্থায় যারা জামায়াতের পক্ষ থেকে সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান করেছেন তারা জামায়াতের আদর্শ ও নীতির বিপরীত কোন কাজ করেননি বলে এবং যে ৯ দফার ভিত্তিতে ৫টি দল সম্মিলিত হয়েছে তাতে আপত্তিকর কিছু না থাকায় জামায়াতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবেই এতে যোগদান করলো।

২) ৪টি দল প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যে মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করেছে সে সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখা গেলো যে, প্রেসিডেন্ট পদের সরকারী প্রার্থী ও বিরোধী দলের মহিলা প্রার্থীর মধ্যে ইসলাম ও গণতন্ত্রের দিক দিয়ে বিরোধী দলের প্রার্থীকে সমর্থণ করাই সমীচীন। শরীয়তে মহিলা প্রার্থীকে সমর্থন করা নিশ্চই আপত্তিকর কিন্তু জনাব মুহাম্মদ আইয়ুব খানকে সমর্থন করা শরীয়তেই অধিকতর আপত্তিকর। তাই মুহতারিমার মনোনয়নের প্রতি জামায়াত সমর্থন জ্ঞাপন করছে!

www.bjilibrary.com

জামায়াত এ কথা ঘোষণা করছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মহিলাকে মনোনয়ন দান জায়েয নয়। একমাত্র বর্তমান পরিস্থিতিতে শরীয়তেরই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মুহতারিমার মনোনয়ন সমর্থন করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

জামায়াতের বাহিরের
হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের রায় ঃ

জামায়াত এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হকপন্থী ওলামাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। বিশেষ করে পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মওলানা মুহাম্মদ শফী (যাকে সব মহলের আলেমগণই মানেন) সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনিও বর্তমান পরিস্থিতিতে মোহতারিমাকে সমর্থন করা শরীয়ত বিরোধী নয় বলে মত প্রকাশ করলেন।

পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যেই যখন দেখা গেল যে, একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী আলেম পীর শরীয়তের দোহাই দিয়ে মুহতারিমার বিরোধিতা করে সরকারী প্রার্থীর সমর্থন করছেন তখন হকপন্থী আলেমগণ ঢাকায় এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহতারিমাকে সমর্থন করাই কর্তব্য বলে ফতোয়া দেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ

(১) মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী। (২) মওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী। (৩) মওলানা আতাহার আলী। (৪) মওলানা তাজুল ইসলাম (৫) শর্ষিনার মেঝো পীর মওলানা শাহ মুহাম্মদ ছিদ্দীক। ওলামায়ে কেরামের মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ যিনি দীর্ঘ ৬ বছরের শাসনামলে ঃ

(১) আল্লাহর শাশ্বত চিরন্তন দ্বীনকে আধুনিকী করণের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

(২) মুসলিম পারিবারিক আইনের নামে স্ব-রচিত আইন দ্বারা আল্লাহ ও রসূলের পবিত্র শরীয়তকে বিকৃত করেছেন এবং ইদ্দত, তালাক, বিবাহ ও ফারায়েজের ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করেছেন।

(৩) পাকিস্তানকে ইসলামী গণতান্ত্রিক পথ থেকে সরিয়ে একনায়কত্বের পথে নিয়ে চলেছেন,

(৪) জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছেন। এবং

(৫) গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত ইসলামী ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে বাতিল করেছেন, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতাসীন রাখার চেষ্টা করা ঈমানের পরিপন্থী বরং এরূপ ব্যক্তিকে অপসারণের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি দেশে নেই যাকে কেন্দ্র করে বিপুলসংখ্যক জনতা একত্রিত হতে পারে এবং বর্তমান স্বৈরতন্ত্রী জালেম শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা হতে পারে, এর পরিবর্তে কোন তৃতীয় প্রার্থীকে সমর্থন করা নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

এ ব্যাপারে জামায়াতের ভূমিকা ঃ

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ

(১) মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে জামায়াত মোটেই অংশগ্রহণ করেনি। সম্মিলিত বিরোধী দলের বাকী ৪টি দলই এ মনোনয়ন দান করেছে।

(২) সরকারী দলের প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নাম পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল।

(৩) দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতের পক্ষে কোন তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না বলে উপরোক্ত দু'জন প্রার্থীর মধ্যে যিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে কম মন্দ তাকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৪) ইসলাম এমন আদর্শ নয় যা কোন সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম হয়ে মানুষকে অচলাবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য করে। যদি কোন বিষয়ে সম্ভাব্য সকল পথই না-জায়েয বলে দেখা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হলো অপেক্ষাকৃত কম মন্দ পথটিকে বেছে নেয়া। প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থীদের একজনকে সমর্থন করতে গিয়ে জামায়াত শরীয়তের এ নির্দেশই পালন করেছে।

(৫) এ ব্যাপারে জামায়াত নিরপেক্ষ থাকলে এর কারণও প্রকাশ করতে হতো যে, শরীয়ত মোতাবেক মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা না-জায়েয। এমতাবস্থায় এমন এক প্রার্থীর সহায়তা করা হয়ে যেতো যাকে অপসারণের চেষ্টা করা ফরজ। তাই বৃহত্তর ইসলামী কর্তব্য পালনের প্রয়োজনেই মুহতারিমাকে সমর্থন করা অপরিহার্য ছিল।

এ বিষয়ে একশ্রেণীর আলেম ও পীরের ভূমিকা ঃ

(১) ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা স্বাভাবিক অবস্থায়ও শরীয়তসম্মত বলে রায় দিয়াছেন তাঁদের সাথে আমরা কখনই একমত নই। তাদের যুক্তিসমূহ একেবারেই দুর্বল। আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, নারী ও পুরুষের সমবেত কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর নেতৃত্ব জায়েয নয়। ইসলামে পর্দার বিধান নারীর নেতৃত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

(২) ওলামা ও পীর সাহেবদের মধ্যে যারা বর্তমান পরিস্থিতিতেও মুহতারিমাকে সমর্থন করা না-জায়েয বলে এক তরফা ফতোয়া দিয়াছেন তাদের মধ্যে কতক ইচ্ছাকৃতভাবে অপর প্রার্থীকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই তা করেছেন। তারা বিবেকের বিরুদ্ধে নিমক-হালালীর দায়িত্ব পালন করেছেন দেখে আমরা বিস্মিত হইনি।

আর তাদের মধ্যে যারা বিনা স্বার্থেই এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন তাদের নিয়ত খারাপ না থাকলেও তাদের দ্বারা এমন এক প্রার্থীকে সাহায্য করা হয়ে গেলো যাকে অপসারণ করার চেষ্টা করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য ছিলো।

(৩) আলেমদের মধ্যে যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাকে সমর্থন করা আপত্তিজনক বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু অপর প্রার্থীর বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি, তাদের ফতোয়ার

www.bjilibrary.com

কোন মূল্য নেই। ক্ষমতাসীনদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে যাদের ফতোয়া দেবার হিম্মত নেই, এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য করার অধিকার স্বীকার করা যায় না। এ ধরনের দুর্বল লোকদের দ্বীনের দরদে কেউ আকৃষ্ট হতে পারে না।

(৪) যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে দু'জনকেই সমর্থন করা চলে না বলে রায় দিয়েছেন তাদের ফতোয়াও মূল্যহীন। তারা মুসলিম জাতিকে পথপ্রদর্শন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তারা শূন্যলোকে অবাস্তব ইলম চর্চার বিলাসিতায় মশগুল। জনগণের বাস্তব সমস্যায় পথ-নির্দেশ করার দায়িত্ববোধই তাদের নেই। তারা ইলমের বোঝা বহন করে মাত্র। সে ইলমকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যোগ্যতাই তারা রাখেন না। তাদের কাজে মানুষের মনে এ ধারণাই সৃষ্টি হবে যে, শরীয়ত মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম। এ ধারণার পরিণামে মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করা হবে যে, ইসলাম কি অন্যান্য ধর্মের ন্যায় শুধু ব্যক্তিগত জীবনে পালনীয়? রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে কি ইসলামকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়?

যাদের ফতোয়া দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে এরূপ চিন্তা করতে মানুষ বাধ্য হয় তারা আর যাই হোক ইসলামের খাদেম নন।

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট
ও
আওয়ামী লীগ

[জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে ১৯৬৬ সনের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে ভিন্ন রাজনৈতিক প্রবাহ সৃষ্টির সূচনা করার কারণে আইয়ুব খানকে তখন নির্বাচন প্রদানে বাধ্য করা সম্ভব হয়নি। এ পরিস্থিতি পূর্বাপর পর্যালোচনা করে অধ্যাপক গোলাম আযম যে নিবন্ধ লিখেন তা ১৯৬৬ সনের ২০শে মার্চ সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ছয় দফা প্রসঙ্গে বলেনঃ তিনি যদি ৬-দফাকেই জাতির মুক্তিসনদ মনে করে থাকেন তাহলে এরূপ মনে করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ... জনগণের ভোটাধিকার আদায় করার পর জাতির নিকট এসব দফা পেশ করার সময় আসবে]

বর্তমানে গণতন্ত্র পুনর্বহাল করাই হলো সমগ্র পাকিস্তানের সর্বপ্রধান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে দেশের সব গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন, এ কথা জামায়াতে ইসলমী পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছে। তাই জামায়াত ন্যাপের ন্যায় ইসলাম বিরোধী এবং আওয়ামী লীগের ন্যায় ধর্ম-নিরপেক্ষ বা ইসলামবর্জিত দলের সাথেও মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে।

বিগত নির্বাচনের পর ন্যাপ দল সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকটা সরকার সমর্থকে পরিণত হলো। আর গত ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত লাহোর জাতীয় সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতাদের নাটকীয় আচরণের পর দেশে আর মাত্র সাড়ে তিনটি দল বর্তমানে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে সামিল রয়েছে। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এ সাড়ে তিনটি দল লাহোর জাতীয় সম্মেলনের কর্মসূচী মোতাবেক একটি হাই কমান্ড স্থাপন করেছে এবং গণতন্ত্র বহাল করার জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছে।

বর্তমান ডিকটেটরী শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারসহ যাবতীয় গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল তখনি পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ ঐক্যজোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়ে এমন

www.bjilibrary.com

সংকটপূর্ণ সময়ে আওয়ামী লীগ ৬-দফা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে বিরোধী দলগুলোর সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে বসলো। ৬-দফার এমন সব প্রস্তাব রয়েছে যা ন্যাপ ব্যতীত কোন দলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়। (অবশ্য ন্যাপ-এর সমর্থন জানায়নি সম্ভবতঃ অন্য কারণে) এমনকি পশ্চিম পাক আওয়ামী লীগ পর্যন্ত তা সমর্থন করতে পারেনি। এমন বিরোধমূলক বিষয় নিয়ে এ সময় এক বিচ্ছিন্ন আন্দোলন করে তারা গণতন্ত্রের কোন খেদমত করেনি বরং ডিকটেটরী শাসনকে আরও মজবুত হবার সুযোগ দান করলেন।

তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে যে প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয় তার ফলে ডিক্টেটরী সিংহাসন টলে উঠেছিলো। আঞ্চলিকতা রোগে আক্রান্ত কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতা ব্যতীত দেশের সকল রাজনৈতিক নেতাই তীব্রভাবে অনুভব করলেন যে, গণতন্ত্র বহাল না হলে তাসখন্দের ন্যায় কূটনৈতিক পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি আরও ঘটবে। তাই একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যেই চারটি বিরোধী দলের উদ্যোগে লাহোর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত নির্বাচনের সময় দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন যেরূপ জোরদার হয়েছিলো, তাসখন্দ চুক্তির পর তেমনি জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবার এটাই ছিলো মহাসুযোগ। সামরিক শাসনের পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য এত বড় সুযোগ কখনো আসেনি। পূর্ব-পাকিস্তানের একটি নেতৃত্বাভিলাসী দলের অদূরদর্শিতার ফলে সে মহাসুযোগ থেকে জাতি বঞ্চিতই রইল।

লাহোর জাতীয় সম্মেলন দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার যে পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তাতে বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলো। বিরোধীদল সমূহের এ ঐক্য সরকারের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো। সরকারের কোন ষড়যন্ত্রই এ ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাতে পারতো না। জাতীয় সম্মেলনকে বানচাল করার সমস্ত সরকারী ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্য যখন নিশ্চিত হয়ে উঠলো তখন নাটকীয়ভাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাঁর দলের অনুমোদন ব্যতীত ৬ দফা পত্রিকায় প্রকাশ করে বসলেন।

এর ফলে ডিক্টেটরী শাসনের যতটা উপকার হলো জাতীয় সম্মেলনের ততটাই ক্ষতি হলো। তখন সরকার এমন একটা 'ইস্যু' তালাশ করছিলেন যার মাধ্যমে দেশের মনোযোগ তাসখন্দ চুক্তি থেকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। শেখ সাহেবের ৬-দফা সরকারকে এ বিষয়ে আশাতীত সাহায্য করলো। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লাহোরের পত্রিকাসমূহে জাতীয় সম্মেলনের প্রথম দিনের কোন বক্তৃতাই প্রকাশিত হতে দেয়া হলো না। সরকার বিশেষ হুকুম দ্বারা তা বন্ধ করে দেন। কিন্তু সে দিনেই বিশেষভাবে সরকারী পত্রিকাসমূহ বড় বড় শিরোনামের ৬-দফা প্রকাশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বিরোধী দলে চরম ভাংগন ধরেছে। ৬-দফার মধ্যে দেশের সংহতির পক্ষে এমন সব মারাত্মক প্রস্তাব রয়েছে যে, এর এত ব্যাপক প্রচারের ফলে সর্বত্রই তাসখন্দ চুক্তির বদলে ৬-দফার আলোচনা রাজনৈতিক মহলকে চঞ্চল করে তুললো।

www.bjilibrary.com

অপরিণামদর্শী সরকারের এ উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় আপাতত বড় কর্তারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। যেহেতু ৬-দফা বিরোধী দলের ঐক্যে ভাংগন ধরাতে সাহায্য করেছে সেহেতু সরকার জোরে সোরে এর প্রচারে সাহায্য করলেন। কিছুদিন পর ৬-দফাওয়ালাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালাতে বাধ্য হতে হবে কিনা সে কথাও সরকার চিন্তা করলেন না।

লাহোর জাতীয় সম্মেলনের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক ২০শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় তাতে যোগদানের জন্যে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং পশ্চিম পাক আওয়ামী লীগ নেতা মালিক গোলাম জিলানী ও খাওয়াজা মুহাম্মদ রফীক পূর্ব পাকিস্তানে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সরকার এ খবরে শংকিত হলেন। তারা যদি পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ দলকে আবার গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে শামিল করতে সক্ষম হন এবং ৬-দফা দাবী মুলতবী রাখার জন্যে রাজী করাতে পারেন তাহলে সরকার আবার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখীন হবেন। তাই সরকার ঐ তিনজন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করেন।

অতঃপর পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল ৬-দফাকে দলীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করার পর সরকার যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে, আওয়ামী লীগের পক্ষে আর গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই তখনই ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ দলীয় কর্মসূচী হিসাবে ৬-দফা নিয়ে যখন প্রদেশময় আন্দোলন চালাতে থাকে তখন প্রদেশের অন্যান্য বিরোধী দলের পক্ষেও চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। কাউন্সিল লীগ ৭ দফা দাবী প্রকাশ করলেন এবং ৬ দফার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করলেন।

নেযামে ইসলামও জনসভা করে ৬-দফার অযৌক্তিকতা প্রকাশ করতে থাকেন। জামায়াতে ইসলামী নেতিবাচকভাবে যেমন ৬-দফাকে অগ্রাহ্য করেন, ইতিবাচকভাবে তেমনি একটি কর্মসূচী পেশ করেন। 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি কোন পথে?' শীর্ষক এক পুস্তিকা মারফতে উক্ত কর্মসূচী প্রচার করা হয়।

এভাবে আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবী বিরোধী দলগুলোকে দলীয় কর্মসূচী পেশ করতে এবং ৬-দফার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশে বাধ্য করে। সম্মিলিত বিরোধী দল যে ৯-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো তাতে সকল দলেরই সম্মতি ছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হলে সর্বসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করাই একমাত্র পথ। কিন্তু কোন দল যদি পৃথকভাবে দলীয় কর্মসূচী পেশ করে তাহলে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

এ বিভেদ সৃষ্টি করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ আরও সংকীর্ণ করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে বর্তমানে যে বিভেদ দেখা দিয়েছে তাতে ডিক্টেটরী শাসনেরই সবচেয়ে বেশী উপকার হয়েছে। এর জন্য শতকরা একশ ভাগ পূর্ব পাক আওয়ামী লীগই দায়ী।

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট বনাম ৬ দফা

[১৯৬৬ সালের মে মাসে সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় তাঁর নীচের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। গণতন্ত্র কায়েম না করে এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের সাথে বিন্দুমাত্র পরামর্শ না করে ৬দফা পেশ করার কারণে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা অধ্যাপক গোলাম আযম তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।]

সামরিক শাসনের পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের প্রয়োজনে জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দলের ঐক্যের উপর সব সময়ই অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। এ উদ্দেশ্যেই জামায়াত সম্মিলিত বিরোদী দলে যোগদান করেছিলো।

এ বিষয়ে আমরা সব সময়ই সচেতন ছিলাম যে,সমাজতন্ত্র-পন্থী ন্যাপ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শের মিল হওয়া কোন দিনই সম্ভব নয়। তবুও গণতন্ত্র পুনর্বহালের সংগ্রামে তাদের সাথে মিলে আমরা কাজ করা জরুরী মনে করছি।

এমনকি 'ন্যাপ' যখন গণতান্ত্রিক শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের ডিক্টেটরী শাসন অবসানের আন্দোলন ত্যাগ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খতম করার দোহাই দিয়ে ডিক্টেটরকে সমর্থন করতে লাগলো তখনও জামায়াতে ইসলামী অবশিষ্ট বিরোধী দলগুলোর সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করার জন্যে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত ঃ

লাহোর জাতীয় সম্মেলনের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগও গোটা দেশের গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। যে সময়ে ৪টি বিরোধী দলের এক জোট হয়ে গণতন্ত্র পুনর্বহালের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সব চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিলো তখনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এ ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত হানলেন।

এ সময়ে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে গণতন্ত্রকামী এক দলের বিরুদ্ধে অপর দলের সামান্য শক্তিও ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ হঠাৎ অসময়ে ৬-দফা দাবী পেশ করে আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য করেছে।

জনগণের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পর বিভিন্ন বিরোধী দল নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে জনগণের ময়দানে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেও দেশের বৃহত্তর কোন ক্ষতির আশংকা ছিল

www.bjilibrary.com

না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিচ্ছিন্নতা যে ডিক্টেটরী শাসনকে আরও মজবুত করছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তাসখন্দের প্রতিক্রিয়া ঃ

তাসখন্দ ঘোষণার পর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক চেতনাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করলেন যে, গণতন্ত্র কায়েম না থাকায়ই পাকিস্তানের এরূপ অপমানকর কূটনৈতিক পরাজয় হলো। গণতন্ত্র বহাল থাকলো রাষ্ট্রপ্রধান কিছুতেই জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের মর্যাদা বিরোধী এ ধরনের চুক্তিতে দস্তখত করতে সাহস করতেন না। বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের উপর কোন নির্দেশ (Mandet) প্রদানের ক্ষমতা যেমন কারো নেই, তেমনি কোন বিষয় তিনি কারো নিকট কৈফিয়ৎ দিতেও বাধ্য নন। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান যদি কূটনৈতিক দিক দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করার এ নিরংকুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে দেশকে আরও অমর্যাদাকর ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে যে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিলো তার ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যে বর্তমানে সেখানে ময়দান যতটা প্রস্তুত হয়েছে ইতিপূর্বে কোন সময়ই এতটা হয়নি। গত ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন একথার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এন,ডি,এফ ও আওয়ামী লীগ ঃ

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী পূর্ব পাকিস্তানের কতক রাজনৈতিক নেতা, গোটা দেশে গণতন্ত্র বহাল করার এ মহা সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম যে, এবার গণ আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠবে এবং ডিক্টেটরী শাসনের অবসান ঘটবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সম্মিলিত সংগ্রাম হলে তা অবশ্যই হতো।

এন.ডি,এফ কোন সংগঠিত রাজনৈতিক দল না হলেও এর সভাপতি জাতীয় পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা হওয়ায় এবং কয়েকজন প্রাক্তন উজীরে আলা ও উজীর এ সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় প্রদেশের রাজনীতিতে তাদের একটা স্থান আছে। তাই তাসখন্দ ঘোষণার মতো একটা অপমানকর চুক্তির সমর্থন করে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চেতনার সুনাম ক্ষুণ্ন করেছেন। তবু তাঁদের এ দুর্বোধ্য নীতি গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে এতটা মারাত্মক হতোনা। পশ্চিম পাকিস্তানে এন.ডি.এফ এর কোন গন্ধও নেই, তবে তাদের মতামত গোটা দেশের রাজনীতিতে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না।

কিন্তু আওয়ামী লীগ একটি নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও তাসখন্দের ব্যাপারে এর পূর্ব পাকিস্তান শাখা কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বে সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। লাহোর সম্মেলনে পূর্ব-পাক শাখার নেতৃবৃন্দ যে

www.bjilibrary.com

নাটকীয় ভূমিকা অভিনয় করেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানের সুনাম অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়। যারা কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্যে ভারতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে রাজী নন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিকে পূর্ব পাকিস্তানের কোন সমস্যা বলে মনে করতে প্রস্তুত নন, একমাত্র তারাই তাসখন্দ চুক্তি সমর্থন করতে পারেন। এদিক দিয়ে এন.ডি.এফ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ তাসখন্দ চুক্তির প্রকাশ্য সমর্থন না করলেও তাদের নীরব ভূমিকা সমর্থনেরই নামান্তর।

লাহোর সম্মেলন ও ৬-দফা ঃ

লাহোর জাতীয় সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানী দলগুলোর প্রতিনিধিদের যোগদান সম্পর্কে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ঢাকায় আসার পর পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগের দশজন নেতার সম্মেলনে যোগদান করার কথা পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ সভাপতি পর্যন্ত লাহোর সম্মেলনের পূর্বে ৬-দফা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি।

লাহোর সম্মেলনে তাসখন্দ চুক্তির যে তীব্র ও কঠোর সমালোচনা হয় তা পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ নেতাদের পছন্দ হবার কথা নয়। গত সেপ্টেম্বর যুদ্ধে যে একমাত্র ইসলামী প্রেরণাই জাতিকে রক্ষা করেছে সে কথা সম্মেলনের প্রতেকটি বক্তা এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতারাও যেভাবে স্বীকার করেছেন তাতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিশ্বাসে আঘাত লাগাও বিচিত্র নয়। উপরোক্ত কারণেই হোক বা অন্য কোন প্রয়োজনেই হোক পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ৬-দফা পেশ করার মাধ্যমে লাহোর সম্মেলন থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতা এ ৬-দফা প্রস্তাব সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে পেশ করাও অযৌক্তিক বিবেচনা করেছেন।

৬-দফা ও সরকারী নীতি ঃ

লাহোর জাতীয় সম্মেলনে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে ফাটল ধরাবার সমস্ত সরকারী অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সরকারী পত্রিকাসমূহ ৬-দফারই আশ্রয় গ্রহণ করে। সরকারী নির্দেশে জাতীয় সম্মেলনের পয়লা দিনের বক্তৃতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। অথচ সেদিনই সরকারী পত্রিকাসমূহে বড় বড় শিরোনামে ৬-দফা ও সম্মেলনের মতবিরোধের খবর ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্মেলনের পর পূর্ব পাকিস্তানে যখন আওয়ামী লীগ নেতারা ৬-দফা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করেছেন তখনও সরকারী পত্রিকাসমূহ-ই এর প্রচার বেশী করে করেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগের ৩ জন নেতাকে পূর্ব পাকিস্তানে আসার প্রাক্কালে গ্রেফতার করা হয়। যাতে তাঁরা পূর্ব পাক শাখার নেতাদেরকে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে সামিল করার চেষ্টারই সুযোগ না পান। নইলে এ সময়ে তাদেরকে গ্রেফতার করার আর কোন যুক্তিসংগত কারণই নেই।

জাতীয় পরিষদে গত অধিবেশনের সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৬-দফার বিরুদ্ধে পয়লা কথা বলার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর, মওলানা মওদূদী ও চৌধুরী মুহম্মদ

www.bjilibrary.com

আলীর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ চালালেও ৬-দফার বিরুদ্ধে টু শব্দ পর্যন্ত করেননি। এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী দলসমূহের ঐক্য বিনষ্ট করার ব্যাপারে ৬-দফার খেদমত অসীম এবং এ দ্বারা ডিক্টেটরী শাসক গোষ্ঠীই অধিক উপকৃত হয়েছেন। তারপর যখন সরকার নিশ্চিন্ত হলেন যে, আওয়ামী লীগের আর ঐক্য শিবিরে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই তখন ৬-দফার বিরুদ্ধে স্বভাবজাত ভাষায় গালি-গালাজ শুরু করলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ৬-দফার বিশ্লেষণ করে যুক্তিসহ এর ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে জাতিকে সাবধান করার কোন চেষ্টাই সরকার করেননি।

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের দুটো দাবী সর্ববাদী সম্মত ঃ

১। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন (Full Provincial autonomy)

২। উভয় প্রদেশের সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ (Removal of disparity)

এ দুটো দাবীর অর্থ ঃ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের ফলে বহু বিষয়েই উভয়ের মধ্যে এতো পার্থক্য রয়েছে যে এদেশের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে এককেন্দ্রিক সরকার কিছুতেই উপযোগী নয়।

একমাত্র ফেডারেল পদ্ধতিই এদেশের উপযোগী। অবশ্য পাকিস্তান ফেডারেশন হিসাবেই জন্মলাভ করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রকৃত ফেডারেল ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। পাকিস্তানকে সত্যিকারের ফেডারেশনে পরিণত করতে হলে ঃ

(ক) পাকিস্তানের উভয় প্রদেশকে নিয়ে একটি মজবুত রাষ্ট্র গড়ার জন্য যে কয়টি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্পণ করা অপরিহার্য তা ছাড়া বাকী সব কয়টি বিষয়কেই প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারভুক্ত করতে হবে। উভয় সরকারের মধ্যে বিষয় বন্টনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন বা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যাতে একে-অপরের বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে শাসনতন্ত্রে এর সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

(গ) কোন সরকার অপর সরকারের উপর হস্তক্ষেপ করলো কিনা তা তদারক করা ও সে বিষয় চূড়ান্ত রায় দেবার জন্য শাসনতন্ত্রে দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে ক্ষমতা দিতে হবে এবং উক্ত আদালতকে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকরূপে স্বীকার করতে হবে।

উপরোক্ত তিনটি নীতির ভিত্তিতে ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে।

বলা বাহুল্য বর্তমান শাসনতন্ত্রকে উপরোক্ত নীতিমালার দৃষ্টিতে নামে মাত্র ফেডারেল ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রাদেশিক গভর্নর প্রেসিডেন্টেরই নিযুক্ত ও একমাত্র তারই নিকট জওয়াবদিহি করতে বাধ্য বলে এ শাসনতন্ত্র বাস্তব ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারই কায়েম করেছে।

www.bjilibrary.com

পূর্ব ও পশ্চিমে বৈষম্য ঃ

পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন লোক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমান উন্নত করার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ ইনসাফের দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশী বলে এখানকার উন্নতি পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও বেশী হওয়া উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় চাকুরী, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামরিক ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে বে-ইনসাফী ও অবিচার করা হয়েছে সে কথা আর অস্বীকার করার ক্ষমতা কাহারো নেই।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তার জন্য কতক ঐতিহাসিক কারণও দায়ী। এমন কতক বাস্তব প্রতিবন্ধকতাও ছিলো যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তান বেশী উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু ঐসব কারণ ছাড়াও প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার দরুনই পূর্ব পাকিস্তান অনেক দিক দিয়েই বঞ্চিত হয়েছে।

এ বঞ্চনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ও পশ্চিম পাক প্রাদেশিক সরকার মোটেই দায়ী নয়। এর জন্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। এ বৈষম্য সৃষ্টির ব্যাপারে সামরিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেছেন তাদের সবাই কমবেশী দায়ী। জামায়াতে ইসলামী আজ পর্যন্ত সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। তাই জামায়াতে ইসলামীই একমাত্র দল যে এ অবিচার করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও দায়ী নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের উজীর সভা ও আইন পরিষদে যারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের অযোগ্যতাই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। যদি পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিগণ ঈমানদার, যোগ্য, নিঃস্বার্থ ও বলিষ্ঠ হতেন তাহলে এ বৈষম্য এতটা প্রকট হতো না।

এর প্রতিকার ঃ

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যে স্বাভাবিক পার্থক্য ছিলো তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার দরুন আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে যে বিষয়ে অবিচার হয়েছে তা দূর করা রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য অপরিহার্য। এখন থেকে যদি সর্বদিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে এমনভাবে বেশী পরিমাণ সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে অন্ততঃ দশ বছরের মধ্যে পূর্বকৃত অবিচারের প্রতিকার হয় তাহলে এ বৈষম্য দূর হওয়া সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম সময়ে এ বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয় বলে সব দলই স্বীকার করতে বাধ্য। তাই সম্মিলিত বিরোধী দলের ৯ দফার মধ্যেও দশ বছরই উল্লেখ করা হয়েছিল।

দাবী দুটো আদায়ের বাস্তব পন্থা ঃ

এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও উভয় প্রদেশের বৈষম্য দূরীকরণ এ দুটোই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানতম ন্যায্য দাবী এবং সব

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক দলই এ দুটো দাবী আদায়ের জন্য নিজ নিজ পন্থায় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ব্যতীত আর সব দলই প্রথমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। এরপর উক্ত দুটো দাবী আদায়ের পথ সহজ হবে বলেই ঐ সব দলের অভিমত। কারণ বর্তমান জরুরী অবস্থা বহাল থাকায় মৌলিক নাগরিক অধিকারটুকু পর্যন্ত আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয়। জনগণেরই প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার তো বহু দূরেরই কথা তদুপরি ডিক্টেটরী শাসন বর্তমান সামরিক শাসনামল থেকেও অধিক মজবুত হয়ে আছে। এমতাবস্থায় কোন এক দলের পক্ষেই বর্তমান একনায়কত্বকে উৎখাত করা সম্ভব নয়।

আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া গণ সমর্থন লাভ করে তারা গণতন্ত্র কায়েম করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এদ্দিনে হয়তো তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে তাদের হিসাব ভুল হয়েছে। তাদের ৬-দফা দলীয় কর্মসূচী দেশে একনায়কত্বকে আরও মজবুত হবার সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রথমদিকে সরকার ৬-দফার বিরোধিতা না করায় এবং সরকার সমর্থক পত্রিকায় ৬-দফার বিদ্বাট প্রচারের সুযোগ দেয়ায় তারা মনে করেছিলেন যে, সরকার বোধ হয় ৬-দফার বিরোধিতা করতে সাহসই পাচ্ছেন না। কিন্তু সরকার নিজ স্বার্থেই তখন এ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। ৬-দফার মাধ্যমে সম্মিলিত বিরোধী দলে ভাংগন সৃষ্টির এবং তাসখন্দ ঘোষণা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ৬-দফার দিকে ফিরিয়ে নেবার সুযোগ পাওয়ায় সরকার প্রথমদিকে ৬-দফার বিরোধিতা না করাই সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। সরকারের সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর তাদের স্বভাবসুলভ পদ্ধতিতেই আওয়ামী লীগের উপর দমন নীতির প্রয়োগ শুরু হলো।

৬-দফার জনপ্রিয়তা?

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী আদায়ের ব্যাপারে ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে যারা মনে করেন, তারা একটু যাচাই করলেই বুঝতে পারবেন যে এ জনপ্রিয়তা ঐ দুটো দাবীর পক্ষে মাত্র। ৬-দফার শিক্ষিত সমর্থকদেরও অনেকেই দফাগুলো জানেন না। তারা মনে করেছেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও বে-ইনসাফী দূরীকরণই এ দফাগুলোর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের জন্য ৬-দফা কতটুকু উপযোগী তা সুস্থভাবে বিবেচনার পরিবেশই তখন ছিলোনা। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় রোজই ৬-দফাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী বলে জোর প্রচার করা হয়েছে। তাই ৬-দফার জনপ্রিয়তা পরোক্ষ। বিশেষ করে নিম্ন কারণ সমূহই ৬-দফাকে সমর্থনের পরিবেশ সৃষ্টি করছে ঃ

(১) ৬-দফা প্রচারিত হবার পর থেকে ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত সরকার পক্ষ এর বিরুদ্ধে কিছুই না বলায় অনেকেই মনে করলেন যে, এ দাবী এতো মজবুত যে সরকার চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে।

www.bjilibrary.com

(২) ৫ সপ্তাহ পর যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যুক্তির বদলে শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিলেন, তখন অনেকের মনে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, প্রেসিডেন্ট সাহেব যখন ৬-দফার উপর এতো ক্ষেপেছেন তখন এটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিশ্চয়ই মুক্তি সনদ হবে।

(৩) ভুট্টো সাহেব বার বার চ্যালেঞ্জ দিয়ে যখন পালাচ্ছেন তখন ৬-দফা নিশ্চয়ই অপরাজেয় যুক্তির পরিচায়ক।

এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ৭ই জুন ঢাকায় যে হরতাল হয়ে গেলো এর প্রধান কৃতিত্ব গভর্ণর সাহেবের প্রাপ্য—আওয়ামী লীগের নয়। আওয়ামী লীগ গোটা প্রদেশেই হরতাল আহ্বান করেছিলো। কিন্তু ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা (খালিশপুর শিল্প এলাকা ব্যতীত) ছাড়া আর কোথাও হরতাল হয়নি। জোর করে হরতাল বন্ধ করাতে গিয়ে সরকার ঢাকায় হরতাল করালেন।

৬-দফা ও অন্যান্য দল ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের উপরোক্ত দুটো ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ যে ৬-দফা দাবী পেশ করেছে তা অন্যান্য কোন দলই সমর্থন করেনি। আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট ত্যাগ করে দলীয় কর্মসূচী পেশ করায় অন্যান্য দলও পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দু'টো আদায়ের জন্য নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচী পেশ করতে বাধ্য হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি কোন পথে?' নামক এক কর্মসূচী পেশ করছে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭-দফা কর্মসূচী ঘোষণ করেছে। এন. ডি. এফ. - ও নিজস্ব প্রোগ্রাম (পত্রিকা মারফত) প্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে ন্যাপও ১৩-দফা দিয়েছে।

এ থেকে একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রদেশের ন্যায্য দাবী দুটো আওয়ামী লীগের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নয়। দেশের সব দলই এ দুটো দাবী জানাচ্ছে। শুধু দাবী আদায়ের বাস্তব কর্মসূচী নিয়েই এ সব দলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

বর্তমান কর্তব্য ঃ

আমরা পূর্ব থেকেই বলে এসেছি যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত এ দাবী আদায়ের অন্য কোন-কার্যকরী পথই নেই। আওয়ামী লীগ যদি আবার ঐক্যজোটে ফিরে আসে তাহলে সকল বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে ঐ দুটো দাবী আদায়ের জন্য কোন সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। যদ্দিন এ পন্থা অবলম্বন করা না হবে তদ্দিন এ দাবী আদায়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। বিরোধী দলসমূহ দলীয় কর্মসূচী নিয়ে যতই পৃথক পৃথক আন্দোলন করবে ততই ডিক্টেটরী ব্যবস্থা মজবুত হবার সুযোগ লাভ করবে।

www.bjilibrary.com

সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান করা কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে?

[প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জামায়াতের ভূমিকা সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তার নিম্নরূপ জবাব ১৯৬৫ সনের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

প্রশ্ন ঃ সম্মিলিত বিরোধী দলে ধর্মনিরপেক্ষ দল, এমনকি স্পষ্ট ইসলাম বিরোধী দল পর্যন্ত শামিল থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে এতে যোগদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হয়েছে কিনা?

উত্তর ঃ সম্মিলিত বিরোধী দলে যেসব পার্টি শামিল হয়েছিল তাদের কোনটি সম্পর্কেই জামায়াতে ইসলামী অজ্ঞাত ছিল না। কোন্ দলের ইসলাম সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব তা ভালভাবে জেনেই জামায়াত এতে যোগদান করেছে।

পয়লাই বিবেচনা করা দরকার যে, জামায়াত কী উদ্দেশ্যে সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান করেছিল। জামায়াত নিজস্ব সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে কোন নতুন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়নি। অথবা জামায়াত এমন কোন কাজের উদ্দেশ্যে কারো সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়নি যে কাজ ইসলামের দিক দিয়ে আপত্তিকর।

যে ৫টি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান করেছিল তারা সর্বসম্মতিক্রমে ৯ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

এখন দেখা দরকার যে, উক্ত ৯ দফার মধ্যে কোন দফা কোন দিক দিয়ে ইসলাম বিরোধী বলে মনে হয় কিনা। আমাদের বিবেচনায় কোন দফাই ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। যে কাজ আপত্তিকর নয় তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আপত্তি হওয়ার কি যুক্তি আছে?

তাহলে প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসা হলো যে, ইসলাম বিরোধী লোকের সাথে মিলে ভাল কাজ করাও শরীয়ত মোতাবেক জায়েয কিনা? শরীয়তের বিচারে পয়লা বিবেচ্য হলো যে, করণীয় কাজটি আপত্তিকর কিনা। যদি আপত্তিকর হয় তা'হলে ইসলামপন্থী লোকের সাথে মিলেও তা করা জায়েয নয়। আর কাজটি যদি আপত্তিকর না হয় তাহলে প্রয়োজন হলে অমুসলিমদের সাথে মিলেও তা করা যেতে পারে।

বিগত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বের দুটো প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে জামায়াত ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য মনে করেছে।

www.bjilibrary.com

এ ঐক্যের গুরুত্ব অনুভব করেই ধর্ম-নিরপেক্ষ দলও নয় দফার অন্তর্ভুক্ত অষ্টম দফাটিকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছিল। অষ্টম দফাতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পারিবারিক আইনকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সংশোধন করার ওয়াদা ছিল। সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত একমাত্র ইসলাম বিরোধী দলটির নেতৃবৃন্দ আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যের প্রয়োজনেই অষ্টম দফাটিকে মেনে নিতে বাধ্য হন। নয় দফায় সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের দস্তখত হয়ে যাবার পরও ইসলাম বিরোধী দলটি অষ্টম দফাটিকে অপসারিত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রধানতঃ জামায়াতে ইসলামীর কারণেই সে দফাটিকে অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। আদর্শের দিক দিয়ে এটা কি কম সাফল্যের বিষয়? পাকিস্তানে স্পষ্ট ইসলাম বিরোধী দলকেও যে ইসলামকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় এ কথা প্রমাণ করতে পারাটা কি ইসলামী আদর্শের জন্য কোন মূল্যই রাখে না?

কিন্তু এ ইসলামী দফাটি ছাড়াও দেশে শুধু ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এরূপ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়নের প্রধান উৎসশক্তিই হলো-- মুসলিম জনসাধারণ, যাদেরকে ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক বানানো হয়েছিল। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনেরই অংশ বরং প্রাথমিক পদক্ষেপ। এজন্যই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

জামায়াতে ইসলামী বিগত নির্বাচনে অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা করতে গিয়ে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা সত্ত্বেও গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মসলিসে শূরার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনেই জামায়াত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে সহযোগিতা করবে।

নিজ আদর্শের বৃহত্তর স্বার্থে আদর্শহীন বা আদর্শ বিরোধী শক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করা যদি শরীয়তে আপত্তিকর হতো তাহলে নবী করীম (সঃ) মদীনার হেফাজতের জন্য মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ইয়াহুদ, খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফের দলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতেন না। মক্কার কোরায়েশদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপুল শক্তির হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করার প্রয়োজনে তিনি এমন সব লোকের সহযোগিতা গ্রহণ করেন যারা ইসলামের দুশমন হলেও কোরায়েশদের তুলনায় কম বিপজ্জনক ছিল। বৃহত্তর বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট বিপদকে বরণ করা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার অতি স্বাভাবিক নীতি। আল্লাহর নবী সে নীতির আশ্রয়ই গ্রহণ করেছিলেন।

জামায়াতে ইসলামী একনায়কত্বকে যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামের জন্য বৃহত্তর বিপদ বলে সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করে। বিশেষ করে পাকিস্তানের বর্তমান একনায়কত্ব সামরিক শক্তির অধিকারী বলে ইসলামের জন্য সর্বপেক্ষা বেশী মারাত্মক। তাই এই বৃহত্তর বিপদ থেকে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জামায়াত এমন সব লোকের সাথে মিলে কাজ করা

www.bjilibrary.com

অপরিহার্য বিবেচনা করেছে যাদের সাথে জনগণের ময়দানে পূর্বেও জামায়াত সংগ্রাম করেছে এবং ভবিষ্যতেও সংগ্রাম করবে। জনগণের ময়দানে সংগ্রাম করা আদর্শবাদী আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। কিন্তু একনায়কত্ব এবং সামরিক একনায়কত্ব সে তুলনায় নিঃসন্দেহে বৃহত্তর বিপদ।

আশা করি অতঃপর জামায়াতের সম্মিলিত দলে যোগদানকে শরীয়তের দিক দিয়ে আপত্তিকর বলে কারো মনে সন্দেহ জাগবে না।

একক কার্যসূচী নিয়ে আন্দোলন চালালে কি ক্ষতি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ

সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান না করে আদর্শবাদী দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামী এককভাবে নিজস্ব কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি মোতাবেক আন্দোলন চালিয়ে গেলে কি ক্ষতি ছিলো?

উত্তর ঃ বিগত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সম্মিলিত বিরোধী দলের সাথে মিলিত না হয়ে এককভাবে আর সবই করতে পারতো, কিন্তু নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। মূল প্রবন্ধে পূর্বেও বলা হয়েছে যে, জামায়াত নিরপেক্ষ থাকলে বা প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করালে পরোক্ষভাবে একনায়কত্বকেই সাহায্য করা হতো এবং প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী শিবিরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হতো।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে তাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষে গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তা করাই স্বাভাবিক ছিল। ১৯৪৮ সালে জামায়াত 'আদর্শ প্রস্তাব' গ্রহণের আন্দোলন শুরু করে এবং আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসাবে মওলানা মওদূদী ও মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদকে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হয়। উক্ত আদর্শ প্রস্তাবে একথা স্বীকৃত হয় যে, পাকিস্তানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং এখানকার শাসন ক্ষমতা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দেশের জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের যে কয়েকটি ধারা বর্তমান শাসনতন্ত্রে সংযোজিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত ছিল তার সব কয়টিই এমন কি আদর্শ প্রস্তাবের মতো মৌলিক সিদ্ধান্তটি পর্যন্ত একমাত্র দেশের ইসলামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দেশের কোটি কোটি মুসলিম জনতাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে যে বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদ সমূহের নির্বাচন, মৌলিক মানবাধিকার সমূহের আদালতের এখতিয়ারভুক্তি, শাসন বিভাগের উপর আইন পরিষদের প্রাধান্য এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের এ চারিটি স্তম্ভ কায়েম হলে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সহজ পরিবেশ সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

হবে। জনগণের হাতে ক্ষমতা না থাকায় গত আট বছরে ইসলাম বিরোধী পরিবেশ যেরূপ দ্রুত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, গণতন্ত্র কায়েম থাকলে যে এতটা কিছুতেই সম্ভব হতো না তা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

তাই জামায়াতে ইসলামী আদর্শবাদী দল হিসাবে এককভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াকে কিছুতেই যুক্তিপূর্ণ বিবেচনা করতে পারেনি। উপরোক্ত গণতান্ত্রিক বিধিসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জামায়াত অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা করাকে অপরিহার্য মনে করেছে।

দেশে একনায়কত্ব কায়েম হওয়ার পূর্বে জামায়াত এরূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন বোধ করেনি। তখন জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকায় ইসলাম ও গণতন্ত্র বিরোধীদের সাথে সাথে জামায়াত স্বাভাবিক গতিতেই এককভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে একনায়কত্ব কায়েম থাকায় জামায়াতের একক প্রচেষ্টায় জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যারা সংগ্রামের ময়দানে কাজ করছেন তাদের এ কথা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু যারা আন্দোলনের উত্তপ্ত কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সংগ্রামক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন তাদেরকে এ কথা বুঝানো অত্যন্ত মুশকিল।

সমাজ সংস্কারের জটিল কর্মক্ষেত্রে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তারা জানেন যে, আদর্শবাদী আন্দোলন শূন্যে বা জনহীন মরুভূমিতে চালিয়ে যাওয়া যায় না। যে সমাজে এ আন্দোলন পরিচালনা করা হয় সে সমাজের অবস্থা, পরিবেশ, বিরুদ্ধ শক্তির ধরন ইত্যাদির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অত্যন্ত হেকমত ও বিচক্ষণতার সাথে এক এক কদম বাড়াতে হয়।

জামায়াত যদি বিগত নির্বাচনে অন্যান্য দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকে এককভাবে কাজ করে যেতো তা হলে কী ক্ষতি হতো তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। কয়েকটি বড় বড় ক্ষতির কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

(১) একনায়কত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের হারানো অধিকারসমূহ ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল জামায়াত তা থেকে পৃথক থাকলে গোটা জাতির নিকট একথাই প্রমাণিত হতো যে,জামায়াতে ইসলামী জাতির জীবন মরণ প্রশ্নেও কোন সহানুভূতি রাখে না। নিরপেক্ষ থাকলে দেশের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোকদের নিকট জামায়াত তাবলীগি জামায়াত জাতীয় নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হতো। অথবা এন, ডি, এফ নেতাদের মতো পৃথক থেকেও সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থীকে সমর্থন করতে হতো। আর জামায়াত যদি নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করাতো তাহলে দেশে এবং বিদেশে হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়াও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অপরাধে জনগণের নিকট হেয় ও ঘৃণ্য বিবেচিত হতে হতো।

www.bjilibrary.com

(২) সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান না করলে বিগত নির্বাচনে জামায়াতের নিরপেক্ষ থাকা ছাড়া আর কোন পথ থাকতো না। নিরপেক্ষ থাকলে জামায়াতকে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য (এম. ই. সি) নির্বাচনেও চুপ করে তামাশা দেখতে হতো। এতে সর্বত্র জামায়াতকে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে হতো যা জামায়াতের ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হতো;জামায়াতের নিষ্ঠাবান কর্মীদল এ অবস্থায় চরম নৈরাশ্য বোধ করতো। দেশের ইসলাম ভক্ত লোকের মনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার যে আশা জামায়াত এতদিন সৃষ্টি করেছিলো তা এ নিরপেক্ষতায় এক নিমিষেই নির্বাপিত হয়ে যেতো। অন্য কথায়, জামায়াত নিজের দীর্ঘ সাধনায় রচিত ময়দান একটি মাত্র ভুলের আঘাতে ধ্বংস করে বসতো। এ ভুল করলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জামায়াতের পক্ষে রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়তো।

(৩) পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে জনসাধারণ যে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো, এ পরাজয়ের জন্য জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী হতে হতো। পাকিস্তানের উভয় অংশে জামায়াতে ইসলামীই সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত দল হিসাবে পরিচিত। আর মাওলানা মওদূদীই বর্তমানে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও জননায়ক। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর যে প্রভাব রয়েছে, তা দেশ বিদেশে স্বীকৃত। জামায়াতকে বাজে অজুহাতে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং এর ৬০ জন নেতাকে বিনা বিচারে আটক করে এ সত্যকেই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এ পরাজয়ের জন্য দেশে ও বিদেশে সবাই জামায়াতকেই প্রধানতঃ দায়ী করতো।

(৪) নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকলে জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় একটি আদর্শবাদী বিপ্লবী দল সম্পর্কে এ ধারণাই হতো যে, জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করার ফলে জামায়াতের কর্মীরা ভয় পেয়ে গেছে এবং মসলিসে শূরার সদস্যদেরকে জেলে আটক করার পর জামায়াতের বাকী লোকদের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার কোন লোকই নেই। কারণ সম্মিলিত বিরোধী দল যখন গঠিত হয় তখন জামায়াত ছিল না এবং নেতারাও সব জেলে ছিলেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট পদে মুহতারিমার মনোনয়নের সময়ও ঐ অবস্থায়ই বিরাজ করছিলো। সুপ্রীম কোর্টে মামলা জিতবার পর পর এবং হেবিয়াস কার্পাসের ফলে কারামুক্তি লাভ করেও যদি জামায়াত নিরপেক্ষ থাকার ফয়সালাই করতো তাহলে জামায়াতের পক্ষে আত্মহত্যারই শামিল হতো। সকলেই মনে করতো যে, জামায়াতের বিপ্লব ঠান্ডা হয়ে গেছে।

(৫) জামায়াত যেসব গণতান্ত্রিক মূলনীতিকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা করেছিল সে সব মূলনীতি সরাসরি ইসলামী আদর্শের অঙ্গ। বিশেষ করে মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইসলামী শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। জামায়াত এসব ইসলামী নীতিকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় অন্যান্য

www.bjilibrary.com

দলের সহযোগিতা গ্রহণ করায় অন্যায় হয়েছে মনে করার কারণ কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াত এককভাবে এসব ইসলামী ও গণতান্ত্রিক নীতিকে কায়েম করার ব্যাপারে কি দেশে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতো যতটা সমবেত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে?

সুতরাং জামায়াত যদি সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান করে উপরোক্ত নীতিসমূহকে কায়েম করার চেষ্টা না করতো তাহলে তা জামায়াতের পক্ষে আদর্শহীনতারই কাজ হতো। সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা জামায়াত আদর্শনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছে।

এ সম্পর্কে যাদের মনের খটকা এত কথার পরও দূর হতে চাচ্ছে না এবং যারা জামায়াতের প্রতি দরদের কারণেই অন্যান্য দল থেকে পৃথক থাকা দরকার ছিলো বলে মনে করছে তাদেরকে একটা কথা চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মজলিসে শূরার বা কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির (মজলিসে আমেলা) কোন সদস্যই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। এটা কি করে সম্ভব যে, জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় একটি খাঁটি ইসলামী জামায়াতের মজলিসে শূরার নির্বাচিত ৫০ জন সদস্য এবং জামায়াতের আমির ও কাইয়েম সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদান সম্পর্কে একমত হয়ে এত বড় একটা ভুল করলেন?

যদি কেউ মনে করেন যে, ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ যারা আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং জেল-ফাঁসিরও পরওয়া করছেন না, তারা-আদর্শের উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে এতটা উদাসীন বা নির্বোধ যে এমন চরম ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও তাদের কেউ এর ভ্রান্তি ধরতেই সক্ষম নন, তাহলে এ বিষয়ে আমার বলার কিছুই নেই। দুনিয়ার এমন নজির আমার জানা নেই যে, কোন একটি আদর্শবাদী দল নিজের আদর্শের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালেও কোন মতভেদের সম্মুখীন হয়নি।

একথা কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে, যারা জীবন বিপন্ন করে একটি আদর্শকে কায়েম করার চেষ্টা করেছেন, যাদের অতীত কার্যকলাপ এবং কর্মনীতি ও কার্যপদ্ধতি নিষ্ঠাবান আদর্শবাদীর পরিচয় বহন করে এবং যাদের পরিচালনায় এতো বড় একটা বিপ্লবী আন্দোলন চলছে তারা বিগত নির্বাচনে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেনি এবং তাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল হয়েছে তাও বুঝতে পারছে না! তাহলে কি যারা দূর থেকে মন্তব্য করেছেন তারাই ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থকে বেশী ভালভাবে বুঝতে সক্ষম?

ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের সাথে এক জোট হওয়ায়
জামায়াতে ইসলামীর কি কোন ক্ষতি হয়নি?

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ নেতৃত্বলোভী ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের সাথে এক জোট হওয়ায় দ্বীনি জামায়াত হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর কি কোন ক্ষতি হয়নি? এর ফলে কি জামায়াত অন্যান্য দলের সমপর্যায়ের বলে গণ্য হয়নি?

www.bjilibrary.com

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামী একটি দ্বীনি জামায়াত হিসাবেই পরিচিত এবং এ বৈশিষ্ট্য নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। রাজনীতি দ্বীনের একটি বিরাট দিক বলেই জামায়াত রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণ করে। আর বর্তমানে ধর্ম বলতে যা বুঝায় ইসলাম সে অর্থে ধর্ম নয়। ইসলামকে আল্লাহর পাক 'দ্বীন' আখ্যা দিয়েছেন। দ্বীনের অর্থ হলো আনুগত্য বা আনুগত্যের বিধান। আল্লাহর ও রসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে রচিত জীবন বিধানের নামই ইসলাম।

জামায়াতে ইসলামী নিঃসন্দেহে একটি দ্বীনি জামায়াত। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সবদিকই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে জামায়াত দ্বীন ইসলামকে সামগ্রিকভাবে কায়েম করার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক কাজকে অপরিহার্য মনে করে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূলই জামায়াতের নিকট নিখুঁত আদর্শ-কোরআনের ভাষায় 'উস্‌ওয়ায়ে হাসানা'। তাই জামায়াত এমন ধর্মীয় জামায়াত নয় যে, রাজনীতির ক্ষেত্রকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আর জামায়াত এমন রাজনৈতিক দলও নয় যে, ধর্মকে বাদ দিয়েই রাজনীতি করবে। জামায়াত ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত করতে চায়। তাই এটা ইসলামী বা দ্বীনি জামায়াত।

জামায়াতে ইসলামীকে একটি দ্বীনি জামায়াত মনে করা হয় বলেই উপরোক্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সম্মিলিত বিরোধী দলে জামায়াতের যোগদান করার গুরুত্ব ও যোগদান না করার ক্ষতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের জওয়াব ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। বর্তমান প্রশ্নটি অন্যরূপ। সম্মিলিত বিরোধী দলের মধ্যে নেতৃত্ব লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদ আছেন-এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের সাথে একজোট হয়ে কাজ করায় দ্বীনি জামায়াত হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর নিশ্চয় কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষতি শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতি নয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে জামায়াতের কিছু ক্ষতি হয়েছে এবং জামায়াত ময়দানে কাজ করতে থাকলে সে ক্ষতি শীগগীরই পূরণ হবে। কারণ উক্ত ক্ষতি সাময়িক।

১। প্রথমতঃ এ দেশে দ্বীনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত এমন কতক লোক রয়েছে যাঁরা পার্থিব স্বার্থের জন্যে ইসলাম বিরোধী শাসকদের সাথেও সহযোগিতা করে থাকেন। এরা শাসকদের প্রতি নিমকহালালী করার জন্যই জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন। গত নির্বাচনে জামায়াতের বিরুদ্ধে এরা অপপ্রচার করায় জনসাধারণের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

২। দ্বিতীয়তঃ কতক ইসলাম ভক্ত লোক ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করার ফলে আন্দোলনের প্রয়োজন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে অক্ষম। তাঁরা নিজস্ব খেয়াল মোতাবেক মনে করেন যে, জামায়াতের পক্ষে ইসলাম বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সাথে কোন অবস্থায়ই একজোট হয়ে কাজ করা উচিত হয়নি। তাঁদের এ ধারণা দূর করার জন্য পূর্ববর্তী এক প্রশ্নের জওয়াবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩। তৃতীয়তঃ যারা ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকদের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ তারা জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় একটি আদর্শবাদী দলকে ঐ ধরনের স্বার্থ বাদীদের সাথে মিলিত হওয়া কিছুতেই পছন্দ করেন না।

৪। চতুর্থতঃ সরকার সমর্থক কতক লোক জামায়াতের বিরুদ্ধে কোন দোষ তালাশ করে পায়না বলে এটাকেই একমাত্র মূলধন হিসাবে ব্যবহার করছে যে, জামায়াতে ইসলামী যদি দ্বীনি জামায়াতই হতো তাহলে বেদ্বীন লোকদের সাথে মিলে কেন নির্বাচনে লড়তে আসে।

উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার অগভীর ধরনের, ফলে জামায়াত সম্পর্কে কিছু কু-ধারণা কতক লোকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীনি জামায়াত হিসাবে এটুকু ক্ষতিই গত নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগদানের পরিণামে দেখা দিয়েছে। পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে এ ক্ষতিটুকু একেবারেই সাময়িক। জামায়াতের কর্মীরা ময়দানে কাজ করতে থাকলে এর প্রভাব তেমনিভাবে দূর হয়ে যাবে যেমন সূর্যের তেজ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কুয়াশা বিলীন হয়ে যায়।

স্বয়ং রসূলের আন্দোলনের বিরুদ্ধেও কত অপপ্রচার বা ভুল ধারণা সমাজে ছড়িয়েছে! তাই লোকমুখে বিরূপ সমালোচনা শুনেই অস্থির হওয়া উচিত নয়। দেখতে হবে যে, সত্যিই জামায়াত কোন না-জায়েয কাজ করেছে কিনা। যদি না করে থাকে তাহলে কিছু লোকের মনে বিরূপ ধারণার কারণে চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই।

জামায়াত তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করালো না কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ

'জামায়াত' তার আন্দোলনের তথা ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতা নেই, বলে দাবী করে এবং একমাত্র খোদার সন্তুষ্টির জন্যেই এই আন্দোলন চলছে বলে দাবী করে। গত নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীকে (আইয়ুব খান) ভোট দেওয়া না জায়েয ছিল, এবং মহিল প্রার্থীকে সমর্থন করাও ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল নয়—তখন জামায়াতের সামনে আরও ২টি পথ ছিল, একটি নীরবতা অবলম্বন, অন্যটি ছিল নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করানো। কিন্তু নীরবতায় আইয়ুব খানকে সমর্থনের শামিল হয়ে যায়, এই অবস্থায় একমাত্র পথ নিজস্ব প্রার্থীর কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জামায়াতের এমন কোন শক্তি ছিল না যার জন্য নিজস্ব প্রার্থীকে পাশ করানো যায়। কিন্তু জামায়াতের উদ্দেশ্যত শুধু সাফল্য নয়—। হক পন্থীয় আন্দোলন করতে গিয়ে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে তথা লক্ষ্যে না পৌছার দরুন ব্যর্থ হলেও তা তো ব্যর্থতা নয়। সুতরাং আমার মতে নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আদর্শের উপর মজবুত থাকা একান্ত অপরিহার্য ছিল, অবশ্য এতে জামায়াতের প্রার্থী পরাজিত ও আইয়ুব খাঁ জয়ী হতেন, কিন্তু আমাদের আদর্শের প্রতি দৃঢ়তার দরুন, জামায়াত বর্তমানের ন্যায় দুর্বল না হয়ে আরও মজবুত হতো। এজন্যে জামায়াত 'আদর্শচ্যুত' হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। কারণ তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করালে এমন কোন অবস্থা হতো না যার জন্য জামায়াতের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযোগের জওয়াব কি?

www.bjilibrary.com

উত্তর ঃ

এ প্রশ্নের মূল বক্তব্যের জওয়াব প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নে যেটুকু অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে তার জওয়াব দিচ্ছি।

প্রশ্নকর্তা নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নীরবতা অবলম্বন করলে একনায়কত্বকে সমর্থনের শামিল হয়ে যায়। তাই তার মতে জামায়াতের নিকট একমাত্র পথ ছিল নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করানো কিন্তু তিনি কি চিন্তা করেছেন যে, এর ফল কী হতো? যে যুক্তিতে নীরবতা অবলম্বন করা অনুচিত ছিল, সে যুক্তিতেই নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করানোও অন্যায় হতো। বরং নিজস্ব প্রার্থী দ্বারা গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিভক্ত করার ফলে একনায়কত্বকে অধিকতর মজবুত হবার সুযোগ দেয়া হতো।

অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে কোন বিবেচনা না করে সর্ব অবস্থায় একই কর্মসূচীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার নাম আদর্শবাদ নয়। যারা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন তারা পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বিবেচনা করেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাদের উপর সে গুরুদায়িত্ব অর্পিত নয় তাদের পক্ষে আদর্শের দাবী ও পরিস্থিতির জটিলতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত কঠিন।

প্রশ্নকর্তা একথা ঠিকই বলেছন যে, শুধু সাফল্যই জামায়াতের উদ্দেশ্য নয়। হক পন্থায় কাজ করে ব্যর্থ হলেও তা সাফল্য। কিন্তু বিগত নির্বাচনে জামায়াতের কার্যাবলীকে হক পন্থার বিপরীত মনে করার কী যুক্তি রয়েছে? এ প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তাতে আশা করি জামায়াতের কোনো সিদ্ধান্তকেই ভুল বা অনুচিত বলে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না।

প্রশ্নকর্তা মনে করেন যে, জামায়াত তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করালে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মজবুত থাকতো এবং বর্তমানে জামায়াত দুর্বল হয়ে আছে। তিনি কী হিসাবে জামায়াতকে দুর্বল মনে করছেন তা বুঝতে পারলাম না। গত নির্বাচনে পরাজয় বরণ করার পর অবশ্য কিছুসংখ্যক কর্মীর মনে নৈরাশ্য এসেছিল। বর্তমানে তা-ও অনেকটা দূর হয়ে গেছে। যাদের মনে এরূপ নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে তারা নিজ দুর্বলতাকে গোটা জামায়াতের উপরই আরোপ করতে পারেন। কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার যে, তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়ে পরাজিত হলে জামায়াত যখন সরকারী ও বিরোধী সকল মহলের বিরাগভাজন হতো তখন তারা জামায়াতকে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল মনে করতেন।

www.bjilibrary.com

আমাদের শক্তির উৎস

প্রচণ্ড ঝড় তুফানের সময় দেখা যায় যে চরম ধর্মবিরোধী লোকও অস্থির হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। এক ঈদের ছুটিতে লঞ্চে যাচ্ছিলাম। প্রবল ভীড়ের চাপে বসবারও উপায় ছিলো না। অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী। অন্যান্য শ্রেণীর অনেক শিক্ষিত লোকও ছিলেন। বেশভূষায় যথাসাধ্য পারিপাট্যের কার্পণ্য কারোরই ছিলো না। দু-একজন ছাড়া কেউই নামাযের কোনো ধার ধারেন বলে মনে হলোনা। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক নেতা, অফিস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সবাই আলোচনায় এতো মশগুল যে, দু'একজন যারা নামায আদায় করছে তাদের খাতিরেও একটু আস্তে কথা বলার প্রয়োজনও কেউ বোধ করলোনা, অথচ সবাই মুসলমান।

হঠাৎ কাল বৈশাখীর ঝড় লঞ্চকে যখন ঘেরাও করে ফেললো তখন দেখা গেলো লঞ্চের সবাই আল্লাহর অলী। আল্লাহর প্রেমে সবাই পাগল এবং সবাই এক ধ্যান এক প্রাণ হয়ে তাঁর জিকরে মশগুল।

ঝড় থেমে যাবার পর মাগরিবের নামাযের সময় হলো। এবার নামাযীর সংখ্যা কিছু বাড়লো কিন্তু বাকী সব খোদাপ্রেমিকরাই তখন ঝড়-তুফান সম্পর্কে হরেক রকমের কাহিনীর আলোচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ পূর্বেই যে ত্রাণকর্তাকে করুণভাবে ডাকা হলো, বিপদমুক্ত হবার সাথে সাথেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম হুকুমকে অবহেলা করতে একটু দ্বিধা করলো না।

মানব চরিত্রের এ দুর্বলতার কথা মানুষের মহান স্রষ্টা কতো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেনঃ 'তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও জলে সফর করান। নৌকায় আরোহণ করে স্নিগ্ধ বাতাসে উৎফুল্ল অবস্থায় ভেসে চলাকালে হঠাৎ যখন প্রবল বাতাস বইতে থাকে এবং চারদিক থেকে ঢেউ এসে আঘাত করার ফলে তারা বুঝতে পারে যে, এখন সব দিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছে, তখন তারা আল্লাহর অনুগত ও একাগ্রচিত্ত হয়ে এই বলে দোয়া করতে থাকে 'হে আল্লাহ, যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও তাহলে আমরা তোমার কথা মতো চলে কৃতজ্ঞ জীবন-যাপন করবো।' কিন্তু আমি যখন তাদেরকে মুক্তি দিই তখন তারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে বেড়ায়।

'হে মানুষ, তোমাদের এ বিদ্রোহ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। দুনিয়ার সামান্য কিছুদিনের জীবনের পর তোমাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে এবং তোমরা যা কিছু করছ তখন আমি তা প্রকাশ করব।' (সূরায়ে ইউনুসঃ ২২ ও ২৩ আয়াত)

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বর্ণনা করে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় তোমরা স্বাভাবিকভাবেই যার আশ্রয় কামনা কর, বিপদমুক্ত

www.bjilibrary.com

অবস্থায়ও তাঁর শরণাপন্ন হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। মানুষ যে তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত সামান্য প্রয়োজনটুকুও পূরণ করতে পারে না। সে অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যই তিনি মাঝে মাঝে বিপদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষ এমনই নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞ যে, বিপদমুক্ত হলে আর আশ্রয়দাতা প্রভুর কথা তার খেয়াল থাকে না। একথাটিকেই আল্লাহ তাআলা সূরায়ে ইউনুসেরই ১২ নং আয়াতে এভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

'যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শায়িত, বসা বা দণ্ডায়মান অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু যখনই আমি তার বিদপ দূর করে দিই তখন সে এমনভাবে চলে যেন কোনো সময় সে বিপদেও পড়েনি, আর আমাকে ডাকেওনি।'

মানুষের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত উৎস যে আল্লাহ তাআলা একথা বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ বাধ্য হয়েই স্বীকার করে। ঠিক এমনি ধরনের আর একটি মহাসত্য হলো এই যে, দুনিয়ায় মুসলিম জাতি যখনই বিপদগ্রস্ত হয় তখনই সে ইসলামের আশ্রয় তালাশ করতে বাধ্য হয়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির আন্দোলনই হোক, আর অন্য কোনো জাতি দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই হোক-মুসলিম জাতির প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করতে হলে, নির্জীব মুসলমানদের অবচেতন ভাব দূরীভূত করতে হলে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে জানমাল কোরবান করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে, দুশমন শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য মুসলিম জাতির রক্তে উত্তাপ সৃষ্টি করতে হলে এবং যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে ইস্পাত কঠিন দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন করে তুলবার জন্য চিরদিনই তিনটি উৎস শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

১। আল্লাহর অনুগ্রহ,

২। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বীরত্ব গাথা, নবী করীম সাহাবায়ে কেরাম ও জাতীয় বীরদের প্রেরণাদায়ক ঘটনাবলী এবং তাদের ত্যাগের মহিমাময় উদাহরণ।

৩। মুসলিম জীবনে জিহাদের গুরুত্ব –

সাম্প্রতিক ভারতীয় বর্বর হামলার ফলে উদ্ভূত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে উপরোক্ত কথার ঐতিহাসিক সত্যতা আবার নতুন করে প্রমাণিত হলো। ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা জাতির নিকট প্রকাশ করার মুহূর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গোটা জাতির মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য কালেমা তাইয়েবারই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনই প্রথম সরকারীভাবে তাঁর মুখে কালেমা তাইয়েবা উচ্চারিত হয়। তিনি মুসলিম জাতির গৌরবময় ইতিহাসের দিকেও ইংগিত করে বলেছিলেন যে, হিন্দুস্থান জানে না যে, কোন জাতিকে সে খোঁচা দিয়েছে।

অতঃপর শুরু হলো এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম জাতিকে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যঃ

www.bjilibrary.com

১। ইসলামকে মেরামত করে আধুনিক যুগের উপযোগী করার গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করতে কাউকে দেখা গেলো না।

২। এ যুগে ধর্ম ও রাজনীতি যে প্রগতির পরিপন্থী সে মহান শিক্ষায় জাতিকে অনুপ্রাণিত করার আগ্রহও কারো মধ্যে পাওয়া গেল না।

৩। আন্তর্জাতিক নৃত্য, লাস্যময়ী চিত্রতারকাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, বিচিত্রানুষ্ঠান, নগ্ন চলচ্চিত্র এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিভিন্ন প্রগতিশীল সংস্কৃতির দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করার আহবানও কেউ জানালো না। জাতির এত বড় সঙ্কটের সময়ও সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত আর্ট কাউন্সিল জাতীয় সংস্কৃতির মুখোজ্জ্বলকারী প্রতিষ্ঠান-বুলবুল একাডেমী এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোনো সংস্কৃতির কর্মতৎপরতাই জাতির কোনো কাজে আসলো না।

৪। টেডীবাদী যুবদের স্টাইল, যুবতী কিশোরীদের সাজ-সজ্জাও এ সময়ে জাতির প্রাণে কোনো প্রকার উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো না।

৫। যে রেডিও পাকিস্তান রবীন্দ্র সংগীত জাতীয় রক্তশীতলকারী মূর্ছনা ও পুরুষদের মধ্যে মেয়েলীপনা সৃষ্টিকারী সংস্কৃতির দ্বারা জাতির যুব সমাজকে সংগৃহীত-পাগল নপুংসকে পরিণত করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো, সে রেডিওর রক্তেও জেহাদের বীর রস সঞ্চারিত করার প্রয়োজন হলো।

৬। সাহিত্য ক্ষেত্রে যারা ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার 'অনুপ্রবেশ' বরদাশত করতে রাজী ছিল না এবং ইসলামী মনোভাবকে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে গালি না দিলে যাদের প্রগতিপনার বিকাশ লাভ ঘটাতো না তাদের অনেককেই এবারকার জাতীয় দুর্দিনে অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হলো।

৭। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদগণ এ সময়ে জাতির কোনো প্রয়োজনেই লাগলেন না। 'অসাম্প্রদায়িক' রাজনীতির মহান আদর্শ নিয়ে তারা জাতির এতবড় সঙ্কট সময়েও কোনো খেদমত করতে পারলেন না। জেহাদের ডাক ও শহীদের লোহু তাদের পরিভাষায় সাম্প্রদায়িক উগ্রতার বাহক বলে এ সময় তারা জাতির খেদমত করারও সুযোগ পেলেন না।

জাতি বর্তমান মহা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তঝঝঝঝীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়েই প্রকৃত উৎসশক্তির সন্ধানে নিয়োজিত হলো। অতি স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। জাতি করুনাময় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলো তাঁরই নাম নিয়ে প্রাণে শক্তির সঞ্চার করলো। মুসলিম জাতির গত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ঘেটে কবি, সাহিত্যিক ও বক্তাগণ রেডিও মারফতে এমন সব বীরত্বগাথা পেশ করতে লাগলেন, যা গোটা জাতির শিরায় বীর রসের বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করলো।

রেডিও পাকিস্তানের ষ্টুডিওতে এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টি হলো। ইসলামী প্রেরণা ও জেহাদী জোশ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা, আবৃত্তি, সাহিত্যচর্চা, কওমী সংগীত ও অন্যান্য

www.bjilibrary.com

অনুষ্ঠান শহরে-বন্দরে, পল্লীতে-পল্লীতে, ঘরে-ঘরে বৃদ্ধের রক্তের বীরত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলে যে সাহিত্য এদ্দিন অপাংক্তেয় ছিলো, 'অনল প্রবাহ' অনুষ্ঠানে তাই প্রধান সম্বলে পরিণত হলো। ছিঁচ কাঁদুনে গানের প্যানপেনানী বন্ধ হয়ে 'দিকে দিকে পুনঃজ্বলিয়া উঠেছে দ্বীন ইসলামী লাল মশালের' উদ্দীপনাময়ী সংগীত ও বীর মুজাহিদী জিন্দাবাদের পৌরুষব্যঞ্জক কোরাস এবং এ জাতীয় অগণিত কওমী গান 'লারে লাপ্পায়' অভ্যস্ত যুবকদেরকে পর্যন্ত মেয়েলীপনা ত্যাগ করে জাতীয় গৌরবের জন্য জীবন দানে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে তারাও দলে দলে রিক্রুটিং কেন্দ্রে গিয়ে সৈনিক জীবনের জন্য নিজেদেরকে সমর্পণ করে দিয়েছে। আমাদের বীর সেনাদলও রেডিওর মারফতেই জেহাদী মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে আল্লাহর রাহে জীবন বিসর্জন দিয়ে সত্যিকার জীবন লাভের উদ্দেশ্যে দুর্লভ শাহাদাতের মর্যাদার জন্য অধীর হয়ে লড়বার হিম্মৎ পেলেন।

ভারতীয় হামলার এ সঙ্কটকালে এ কথা আজ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলিম জাতির সত্যিকার অস্ত্রাগার হলো দ্বীন ইসলাম, আল্লাহ হলেন এ জাতির শক্তির উৎস, কুরআন হলো জাতির দেহে রক্ত সঞ্চালনে একমাত্র হাতিয়ার, আর রসূল, সাহাবাগণ এবং অতীত মুজাহিদগণ হলেন বীরত্বের আদর্শ।

আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ হলো, সঙ্কট এবারকার মতো কেটে গেলো, বিপদের অন্ধকার এখনকার মতো দূরীভূত হলো। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, আবার হয়ত শীগগীরই মুসলিম জাতির আসল উৎসশক্তিকে ভুলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অবাঞ্ছিত সংস্কৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিপদকালে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল তাঁকে ভুলে গিয়ে যেনো আমরা দুর্বলতার পরিচয় না দিই, এদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। বিপদের মাঝেও এ জাতি জীবনের যে সন্ধান পেয়েছিলো সে মহাসম্পদ যেনো আমরা হাতছাড়া না করি। আমরা কোনো সময় যেনো এ কথা না ভুলি যে, আল্লাহ রসূল, ইসলাম ও কুরআনই মুসলিম জাতীয় শক্তির একমাত্র উৎস। এ জাতিকে সর্বদিক দিয়ে গড়ে তুলতে হলে ঐ উৎসকেই প্রকৃত সম্বল বলে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের পার্থিব উন্নতিও যে এরই উপর নির্ভরশীল একথা যারা এখনো উপলব্ধি করতে পারেননি তাদেরকে অত্যন্ত ধীরভাবে বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারী মহলের দায়িত্বই সর্বাধিক। কিন্তু যারা আল্লাহর দুনিয়ায় নবীর আদর্শ ও কুরআনী জীবন বিধানকে বাস্তবায়িত দেখতে চান তাদেরকে অতঃপর জাতির সর্বমহলে প্রকৃত জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ব্যাপকভাবে কর্মতৎপর হতে হবে।

[১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত এবং ২৬ শে সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক জাহানে নও এ প্রকাশিত।]

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ দুর্গতি

[সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার ১৯৫৭ সনের ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংখ্যায় মুদ্রিত নীচের এ নিবন্ধে একটি আদর্শবাদী দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্গতি কি কারণে সৃষ্টি হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিবন্ধে উল্লেখিত আদর্শগত কারণ দূর না করার জন্যই পরবর্তীতে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বপ্নের দেশ পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে গেল।]

প্রথম কথা ঃ

প্রত্যেক জাতিই উন্নতি ও প্রগতি কামনা করে এবং এই উদ্দেশ্যেই মানুষ জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্ত্বা লইয়া দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়। পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইবার অদম্য প্রেরণা লইয়া মানুষ এই জন্যই সংগ্রাম করে। অন্য জাতির অধীন থাকা অবস্থায় কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই জাতীয় উন্নতির প্রথম পদক্ষেপই হইতেছে জাতীয় স্বাধীনতা (National Indepen- dence.) বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ।

আযাদী হাসিল করিবার পর জাতিকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রথমতঃ একটি শাসনতন্ত্র অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা শুধু একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারই নয়- ইহা ব্যতীত কোন জাতীয় গঠনমূলক কাজই শুরু করা যায় না। এখানে শাসনতন্ত্র অর্থ জাতীয় আদর্শ। কোন ভিত্তির উপর জাতীয় সৌধ স্থাপিত হইবে, সেই সৌধের আকার, প্রকার ও গঠন কিরূপ হইবে, কোন্ চরম উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য এই জাতীয় প্রাসাদ তৈরী হইবে ইত্যাদি নির্ধারণ না করিয়া কাজই আরম্ভ করা যায় না। এই সকল বিষয় নির্ধারণ করিবার কঠিন দায়িত্ব পালন করাকেই আধুনিক পরিভাষায় 'শাসনতন্ত্র প্রণয়ন' বলা হয়।

ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার ও অবিচার, সত্য ও মিথ্যা, সভ্যতা ও বর্বরতা, সচ্চরিত্রতা ও দুশ্চরিত্রতা ইত্যাদির ধারণা সকলের এক রকম নয়। উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজ জীবনের কাঠামো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উক্ত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া মানব- সভ্যতা চিরদিনই এক ধারায় চলে না। এই বিভিন্ন ধারণা ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের দরুনই মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন অনেক কিছুই বাছিয়া গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়, তেমনি জাতীয় জীবনেও বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতরাং জাতীয় জীবনের সর্বদিক ও বিভাগে কোন্ পথ ও মত অনুসরণ করিয়া চলিলে উন্নত ও সভ্য হওয়া যাইবে, তাহা প্রত্যেক জাতিকেই সর্বপ্রথম নির্ধারিত করিতে হয়। জাতির শাসনতন্ত্র ঐ নির্ধারিত পথ। এই পথ ধরিয়াই দেশের দুরবস্থা দূর করিয়া সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতি গড়িয়া তুলিতে হয়।

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ঃ

আযাদী লাভের পর জাতি হিসাবে পাকিস্তানের জীবনাদর্শ কি হইবে তাহা লইয়া ঝগড়ার সৃষ্টি হওয়াই আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এত বিলম্ব হইল। বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র আমরা লাভ করিয়াছি তাহা দীর্ঘ নয় বৎসরের কঠোর সাধনার ফল। কিন্তু এই শাসনতন্ত্র কি জাতীয় আদর্শ হিসাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়াছে? যাঁহাদের হাতে ইহা রচনা করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তাঁহাদের অধিকাংশের বিশ্বাস ও মতের বিরোধী অনেক মৌলিক ধারাও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কারণ এই দেশের মুসলিম জনসাধারণ ঐ আদর্শে বিশ্বাসী, ইহার জন্যই এই দেশের সৃষ্টি হইয়াছে এবং আযাদীর সংগ্রামে এই আদর্শের শ্লোগানই মুসলমানগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র রচিয়তাগণের সকলে এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন না বলিয়া ইহাতে উক্ত আদর্শের বিপরীত অনেক ত্রুটিই রহিয়াছে। শাসনতন্ত্রের নীতি-নির্ধারক ধারাসমূহে (Directive Principles of State Policy) ইসলামকেই রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য যে পন্থা নির্ধারিত হইয়াছে তাহা ইচ্ছা করিয়াই দুর্বল (ineffective) করিবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। আর বর্তমানে এমন এক শক্তির হাতে এই রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবায়িত করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে, যাহারা শাসনতন্ত্রের নামে শপথ গ্রহণ করিলেও প্রকাশ্য-ভাবেই ঐ আদর্শের নিষ্ঠাবান দুশমন।

এই অবস্থায় পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে রচিত হইয়াছে মনে করা প্রকৃতপক্ষে বেকুফের বেহেস্তে বাস করারই নামান্তর। শাসনতন্ত্রের অর্থ যদি জাতীয় আদর্শই হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার কঠিন কর্তব্য এখনও অসমাপ্তই রহিয়াছে। পাকিস্তানের মুসলিম জনতার স্বীকৃতি সত্ত্বেও ইসলাম পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে এখনও লাভ করে নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, দেশের যে চিন্তাশীল শক্তি জাতিকে পরিচালনা করিতে সক্ষম, তাহার এক বিরাট অংশ ইসলামকে জাতীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে না। যদি তাহারা এই আদর্শকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের বর্তমান ত্রুটিসমূহ কোন ক্ষতিই করিতে পারে না।

কোন আদর্শ তখনি জাতীয় আদর্শ বা শাসনতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করিতে পারে, যখন দেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সমভাবে উহাকে গ্রহণ করে। জাতির পরিচালক জাতীয় সরকারই হইয়া থাকে। দেশের সাধারণ জনতা ও সরকার পরিচালনার যোগ্য শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যদি বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী হন, তাহা হইলে জাতির পক্ষে কোন পূর্ণ শাসনতন্ত্র লাভ করা অসম্ভব। এই অবস্থায় জনগণ যাহা দাবী করিবে, সরকার তাহা দিতে রাজি হইবে না; আর সরকার যাহা করিতে চাহিবে, জনগণ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে। জনসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতা ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি করিতে পারে না। এই সহযোগিতা একমাত্র উভয়ের আদর্শিক ঐক্যের মাধ্যমেই গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ ও সরকারের মধ্যে এখনও আদর্শিক ঐক্য সৃষ্টি হয় নাই।

www.bjilibrary.com

আভ্যন্তরীণ দুর্গতি ঃ

যে দেশের গন্তব্যস্থলই চূড়ান্তরূপে নির্ধারিত হয় নাই, সে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কোনক্রমেই সুস্থ হইতে পারে না। শাসনন্ত্রে যাহাকে জাতীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকে সরকারই যদি অস্বীকার করে তাহা হইলে দেশের দুর্গতি দূর হওয়ার কোন উপায়ই নাই। শাসনতন্ত্রের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে দেশের সরকার উহার জাতীয় আদর্শের বিরোধী হয়, সেই দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কেননা শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যই নাগরিক অধিকারের ভিত্তি। যে শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করে না, তাহাকে কোন রাষ্ট্রেই নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হয় না। রাষ্ট্রের অধীনস্থ সকল নাগরিককে শাসনতন্ত্রের অনুগত করিয়া রাখাই জাতীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই অবস্থায় শাসক শক্তিই যদি শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে এমন দেশের দুর্গতির কোন সীমাই থাকে না। রাষ্ট্রের রক্ষক যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহী হয়, সেখানে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিলীন না হওয়াই আশ্চর্য।

শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতেই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো, শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারিত হয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও বৈদেশিক মর্যাদা স্থাপিত হয়। যদি এই ভিত্তিমূলই না থাকে, তাহা হইলে জাতির ভিতরে ও বাহিরে বিপর্যয় অনিবার্য। বরং শাসনতন্ত্র কার্যকরী না হওয়াই জাতির পক্ষে চরম দুর্গতি।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুরবস্থার মূলই এই আদর্শহীনতা। বর্তমানে পাকিস্তান এই চরম দুর্দিনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ইহার দুর্গতি স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, এখানে শুধু আভ্যন্তরীণ দুরবস্থারই আলোচনা করা হইবে।

দুর্গতির ধরন ঃ

আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রথম দিক হইল অচলাবস্থা। দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে জাতীয় আদর্শ শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা সরকার বাস্তবায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে না বলিয়াই জাতি হিসাবে পাকিস্তান এক স্থানে দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে, ইহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সরকারী দল যে আদর্শে বিশ্বাস করে তাহা জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া পূর্ণভাবে তাহাও কার্যকরী করিতে পারিতেছে না। পাকিস্তানের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলসমূহ পরস্পর বিরোধী আদর্শে বিশ্বাস করে বলিয়া ক্ষমতার লড়াই করিয়াই তাহাদের সময় অতিবাহিত হয়। পাকিস্তানের গাড়ীর টিকেটে (শাসনতন্ত্রে) গন্তব্যস্থল লিখিত থাকিলেও ড্রাইভারগণ সেই দিকে যাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। গাড়ীকে কোন্ দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, সেই বিষয়ে ড্রাইভারদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব চলিতেছে। অপর দিকে গাড়ীর যাত্রীরা টিকিট খরিদ করিয়া গাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, অগ্রগতির জন্য তাহারা উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

www.bjilibrary.com

বস্তুতঃ মানব সমাজে কোন সময়ই স্থিতি নাই-গতিই ইহার ধর্ম। তাই জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা না করিলে স্বাভাবিকভাবে জাতি পিছাইয়া পড়িতে বাধ্য। শরীর সুস্থ রাখিবার চেষ্টা না করিলে মানবদেহ কোন এক বিশেষ অবস্থায় স্থির হইয়া দাঁড়ায় না, বরং অসুস্থ হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। মানব সমাজের এবং মানুষের সহিত সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তুর অবস্থাই এইরূপ। পাকিস্তানের সমস্যা দিন দিনই জটিল হইতেছে এবং নুতন নুতন সমস্যা মানুষকে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন করিয়া ছাড়িয়াছে। দেশের পুরাতন রোগসমূহ কঠিন আকারে ধারণ করায় এবং আরো অনেক নুতন রোগের সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ নিরাশ হইয়া বলিতে শুরু করিয়াছে- "ইংরেজ আমলই এর চেয়ে ভাল ছিল।" জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে ইহার চেয়ে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ আর কি হইতে পারে!

দুর্গতির প্রথম পর্যায় ঃ

পাকিস্তান যে আদর্শের নামে কায়েম করা হইয়াছিল তাহারই প্রাথমিক জোশে আজাদীর প্রথম পর্যায়ে জাতির ভিতর যেটুকু দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ ও চারিত্রিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহাকে ঐ আদর্শের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিলে আজ পাকিস্তানের চেহারাই ভিন্নরূপ হইত। আদর্শবাদী নেতৃত্বের অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই দুর্নীতি, ঘুষ, চোরা কারবারী, চোরা চালানী, মোনাফাখোরী, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, উলঙ্গতা, অশ্লীল ছায়াচিত্র, যৌন আবেদনপূর্ণ তথাকথিত সংস্কৃতি ইত্যাদি সমাজ বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দেশে চালু হইতে লাগিল। বর্তমানে এই সকল জাতি-ধ্বংসকারী কাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে। পাকিস্তান হাসিল হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত এত দ্রুতবেগে এই দুর্গতির দিকে জাতিকে ধাবিত করা হইতেছে যে, প্রতি বৎসর দেশের দুরবস্থা দ্বিগুণ হইয়া দেখা দিতেছে। সরকারী প্রচেষ্টায় এই সকল কাজ হইতে থাকিলে অবনতি রোধ করিবার আর কি উপায় থাকে! সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যেরূপ ব্যাপক ঘুষের প্রচলন আছে, তাহা কাহারো অজানা নাই। সমাজের যাবতীয় দুর্নীতি- চোরা বাজার, চোরাচালান, তথাকথিত সংস্কৃতি, অশ্লীল নৃত্যগীত, উলংগতা ইত্যাদি সমাজবিরোধী ও চরম অনৈসলামিক কার্যকলাপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং বর্তমানে সরকারী শক্তির প্রকাশ্য সমর্থনে এই সকল অপকর্ম চলিতেছে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

যে দুর্নীতির বীজ আযাদীর পূর্ব পর্যন্ত সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা পাকিস্তানের প্রথম পর্যায়ে জাগ্রত জাতীয়তাবোধের দরুন অংকুরিত হইতে পারে নাই, তাহাই এই দেশের গদীভিত্তিক রাজনীতির বদৌলতেই ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই গদীভিত্তিক আদর্শহীন রাজনীতিই আমাদের দুর্গতিকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

www.bjilibrary.com

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশের সমস্যাবলীর সমাধান দ্বারা জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে একটি সুস্পষ্ট মতবাদ বা আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পাকিস্তান ইসলামী মতাদর্শের নামে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ক্ষমতাসীন দলের শক্তিশালী পরিচালকবৃন্দ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাকিস্তানের সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা না করিয়া ইংরেজের প্রবর্তিত নীতিকেই পূর্ণতা দান করিতে লাগিল। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চীন-রাশিয়ার মতবাদ একশ্রেণীর লোকের মন আকৃষ্ট করিল। এইভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে দেশে দুইটি মতবাদে বিশ্বাসী দুইটি শক্তি দানা বাঁধিয়া উঠিল।

কিন্তু পাকিস্তানের প্রকাশ্যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের নামে আন্দোলন চালাইবার অসুবিধা থাকার দরুন এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা দেশের সমস্যার সমাধানের চেয়ে নিজেদের হীন স্বার্থকে জীবনের বৃহত্তর কাম্য হিসাবে গ্রহণ করায় যখনি কোন দল "জাতীয় খেদমত" করিবার নাম লইয়া ময়দানে নাজিল হইয়াছে, তখনই তাহার মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার লোক একত্রিত হইয়া তাহাকে একটি চিড়িয়াখানায় পরিণত করিয়াছে। এই ধরনের দলসমূহ দেশের সমস্যার প্রকৃত রূপ, উহার মূল কারণ ও প্রতিকারের জন্য চিন্তা করিবার তকলিফ স্বীকার না করিয়া সমস্যাসমূহের নামে সস্তা শ্লোগানের জোরেই আগাইয়া যাইতে লাগিল। বিপরীত মতাদর্শের লোকের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল ক্ষমতায় যখনি অধিষ্ঠিত হইল, তখনই তাহারা পরস্পর ঝগড়া করিয়া শক্তির অপচয় করিতে বাধ্য হইল; আর নির্ভেজাল স্বার্থবাদীরা "নিজেদের খেদমত" করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

এই ধরনের স্বার্থপর নেতৃত্বের পরিণাম স্বরূপ দেশের দুর্দশা স্বাভাবিক-ভাবেই বাড়িতে থাকে। ইহারা বিরোধী দলে যখন থাকে, তখন যে সকল কার্যকলাপকে সর্বশক্তি দ্বারা রুখিবার 'ওয়াজ' করিয়া বেড়ায়, ক্ষমতা লাভ করিবার পর সেই সব অপকর্মকেই অধিকতর যোগ্যতা ও দায়িত্বানুভূতির সহিত পূর্ণতা দান করিবার চেষ্টা করে।

তৃতীয় দিকঃ চরম দুর্দশা ঃ

আমাদের দুর্গতি প্রথম ও দ্বিতীয় দিকের পরিণামেই আজ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ হিসাবে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সকল বস্তু অপরিহার্য, তাহা দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রায় অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অথচ শাসনতন্ত্রে সরকারকে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।

ত্রিশ টাকা মণ চাউল খরিদ করিবার ক্ষমতা জনগণের নাই বলিয়া যে দল ভুখা মিছিল সংগঠিত করিয়া এবং আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার নেতৃত্ব দান করিয়া মন্ত্রিত্বের গদীতে সমাসীন হইল, সেই দলই বর্তমানে চাউলের দুর্মূল্য সত্ত্বেও 'দেশে অভাব নাই' বলিয়া প্রচার করিতেছে। এক সময়ে তাহাদের সমর্থক পত্রিকাসমূহে রোজই বহু লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করিত। কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা লাভ করিবার সঙ্গে

www.bjilibrary.com

জনসাধারণ খাইতে না পাইলেও মরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিয়া বসিল। চাউলের মণ ৭০।৮০ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের পত্রিকায় অনাহারে মৃত্যুর কোন খবর পাওয়া গেল না।

১৯৫৭-৫৮ সালের যে বাজেট পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের 'মহান খেদমতে'র উদ্দেশ্যে অর্থসচিব মনোরঞ্জন ধর দেশের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা দেশবাসীর কতটুকু 'মনোরঞ্জন' করিতে পারিবে, তাহা ট্যাক্সের বহর দেখিয়াই অনুমান করা যায়। কৃষককে জমিদারের কবল হইতে মুক্ত করিয়া জমিদারদের চেয়েও বিশ গুণ বেশী খাজনা চাপাইয়া দিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদর্হ হইয়াছেন বর্তমান সরকার।

এই সকল দুর্দশার ভুক্তভোগী কম বেশী সকলেই। অবশ্য ক্ষমতাসীন দলের রুই-কাতলা হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুটি পর্যন্ত সকলেরই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহাতেও দেশবাসীর আশ্বস্ত হইবার কথা। এইভাবে এক দল এক দল করিয়া যদি কিছুটা উন্নত হওয়া যায়, তাহা হইলেও অন্ততঃ কিছু লোকের গতি নিশ্চয়ই হইবে।

কিন্তু জাতি এইভাবে ক্রমেই যে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইতেছে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমাদের এই বিভিন্নমুখী দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের জন্য তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

দুর্গতির কারণ ঃ

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিবার ঝামেলা পোহাইতে যাহারা অনিচ্ছুক এবং দেশের সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া দল গঠন দ্বারা সস্তায় গদী হাসিল করিবার প্রতি যাহাদের ঈমান জন্মিয়াছে, তাহাদের মতে সকল দুঃখ-দুর্দশার একমাত্র কারণ অপর কোন দলকে গদীতে বসানো আর ইহার প্রতিকার স্বরূপ নিজ দলের ক্ষমতা লাভের কথাই তাহারা প্রচার করিয়া বেড়ায়। আবার তাহারা ক্ষমতাসীন হইলে যেহেতু দুর্গতির কারণ দূর হইয়া যায়, সেহেতু গদী পাওয়ার পরই সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইতে থাকে।

যাহারা সমাজ সম্বন্ধে কিছুটা চিন্তা করেন এবং জাতির জন্য দরদও রাখেন, কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই, তাহাদের মতে জনগণের দুর্দশার মূলে রহিয়াছে অশিক্ষা অর্থনীতিক অব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, দেশাত্মবোধের অভাব, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি। কিন্তু যে কোন অনুন্নত দেশেই এই সকল সমস্যা রহিয়াছে। আযাদী লাভের পর এই সব সমস্যা ক্রমে দূরীভূত হইতে পারিত, যদি বলিষ্ঠ কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হওয়া যাইত। এই সকল সমস্যা দূর করিবার দায়িত্ব যাহাদের হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল এবং বর্তমানে যাহাদের হাতে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মৌলিক ত্রুটি রহিয়াছে। শিক্ষার অভাব জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ- সরকার পরিচালকরা তো অশিক্ষিত নয়! কাজেই প্রকৃত কারণ এইসব নয়—যে কারণে এই সব দোষ দূর হয় না তাহাই প্রকৃত কারণ।

www.bjilibrary.com

প্রকৃত কারণ ঃ

আমাদের জাতীয় ব্যাধির যে সকল উপসর্গ চরিত্রহীনতা, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, অশিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, দেশাত্ববোধের অভাব ইত্যাদির রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোকেই প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু আসলে সমাজের ব্যাধিসমূহ দূর করিবার জন্য যে তিনটি বিষয় অপরিহার্য, তাহাদের অভাবই দুর্গতির প্রকৃত কারণ। রক্ত দূষিত থাকিলে অসংখ্য রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। হাতুড়ে ডাক্তার বাহিরেই ঔষধ লাগায়, রোগের প্রকৃত কারণ তালাশ করে না। রক্ত পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা না করিলে রোগ আরও জটিল হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজব্যাধি সম্পর্কেও এই কথা সমান প্রযোজ্য। আমাদের বিভিন্ন রাজনীতিক দলসমূহ হাতুড়ে ডাক্তারদের মতই দেশের সমস্যাবলীকেই প্রকৃত রোগ বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যাসমূহ প্রকৃত রোগের উপসর্গ মাত্র। প্রকৃত রোগ মোট তিনটি ঃ

প্রথম কারণ ঃ

আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রথম ও প্রধান অন্তরায় চিন্তা অধীনতা। যে জাতির চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার অভাব রহিয়াছে, সেই জাতির পক্ষে উন্নতি লাভ করা দূরের কথা, জাতীয় স্বাধীন সত্তা বজায় রাখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। চিন্তার রাজ্যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ ব্যতীত কোন জাতিই প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করিতে পারে না। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আমাদের সমাজে নগণ্য বলিলেও চলে। তদুপরি ঐ সব শিক্ষিত লোকের অধিকাংশ আত্মকেন্দ্রিক- সমাজ ও জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তাহারা ভোগের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহেন না। অবশ্য কিছুসংখ্যক লোক রহিয়াছেন, যাহারা চিন্তাশক্তির প্রয়োগও করেন। কিন্তু সেখানে চিন্তার সচ্ছলতার অভাব রহিয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশ চর্বিত চর্বনেই অভ্যস্ত। অন্য জাতির চিন্তা ও গবেষণার ভালমন্দ বিচার করিবার জন্য তাঁহারা চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করেন না। যে কোন একটি মতাদর্শকেই হয় অন্ধভাবে অনুসরণ করেন, অথবা অন্ধভাবে বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয় যে, এই ধরনের চিন্তাশীল লোকেরাই সাধারণতঃ সক্রিয় রাজনীতি করিয়া বেড়ান। বিশ্বের বিভিন্ন মতবাদকে তুলনামূলকভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া একদল দেশকে চীন-রাশিয়ার আদর্শেই গড়িতে চান, একদল ইংল্যান্ড-অ্যমেরিকার সমাজ ব্যবস্থাকেই এই দেশে কায়েম করিতে আগ্রহশীল,আর একদল ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও চীনের অর্থ ব্যবস্থার আমদানী করিবার অবাস্তব ও অযৌক্তিক পরিকল্পনা লইয়া চলিতেছে। কোন দল ইসলামকে অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, কোন দল চীনের অর্থ-ব্যবস্থার ইসলামী সংস্করণ লইয়াই গবেষণায় ব্যস্ত।

অবশ্য কিছুসংখ্যক লোক সরকারী অফিসে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত রহিয়াছেন। তাঁহাদের বেশির ভাগই আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক- আরাম কেদারা ছাড়িয়া, সুখের চাকুরী ও বিলাসী জীবনের শান্তি ত্যাগ করিয়া তাহারা উত্তপ্ত

www.bjilibrary.com

কর্মক্ষেত্রে সাধারণের সমতলে নামিয়া আসেন না। চিন্তাকেও তাঁহারা বিলাসিতার উপকরণ হিসাবেই ব্যবহার করেন। কাজেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, কমিউনিজম এবং ইসলামকে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে তুলনামূলক গবেষণা করিয়া কোন একটিকে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিবার মত সুস্থ মগজের অভাবই আমাদের দেশের দুর্গতির প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় কারণ ঃ

এই দেশে তিনটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের আন্দোলন থাকা সত্ত্বেও কেহ আদর্শের ভিত্তিতে দল গঠন করে না। ইসলামের নাম কয়েকটি দলই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রায়ই ইসলামী চরিত্রের ভিত্তিতে সংগঠন হয়না। "ইসলামী দল" হওয়া সত্ত্বেও সেই সব দলে বিচিত্র চরিত্রের লোক জমায়েত হইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, ইসলাম সমর্থক লোক সেই দলে থাকিলেও ইসলাম বিরোধী লোকেরাই উহার নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পায়। ইহার একমাত্র কারণই হইল সাংগঠনিক দুর্বলতা ও চরিত্রভিত্তিক সংগঠনের অভাব। এই ধরনের দল ক্ষমতা লাভ করিলেও দেশের সমস্যার ইসলামী সমাধান দিতে পারেনা। যে নেতৃবৃন্দের চরিত্রেই ইসলাম কায়েম হয় না, তাহাদের দ্বারা সমাজে ইসলাম কায়েম হওয়া অস্বাভাবিক।

ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য যে সব আদর্শে বিশ্বাসী লোক রহিয়াছেন তাঁহারা পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবার পর প্রকাশ্যভাবে নিজেদের আদর্শের দিকে আহ্বান জানাইতে পারিতেছে না। ইসলামী আদর্শকে ত্যাগ করার নসিহতও প্রকাশ্যে করা সম্ভবপর হইতেছে না। ইহার ফলে তাহাদের পক্ষেও আদর্শভিত্তিক সংগঠন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে যে কোন দল গঠন করা হয়, সেখানেই বিপরীত আদর্শের লোক একত্র হয় এবং এই ধরনের সংগঠন দ্বারা আদর্শও প্রতিষ্ঠা হয় না, সমস্যারও সমাধান হয় না।

তৃতীয় কারণ ঃ

চিন্তার স্বাধীনতা ও আদর্শভিত্তিক সংগঠনের অভাবের দরুন দেশে যে সকল রাজনৈতিক সংস্থার সৃষ্টি হয়, তাহারা স্বাভাবিকভাবেই গদিভিত্তিক আন্দোলনই শুধু চালাইয়া যায়। কোন বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে সরকারী ক্ষমতার সাহায্যে সমাজ গঠন করিবার সংকল্প যাদের থাকে, তাহারা ক্ষমতা পাইবার পূর্ব হইতেই সমাজ সেবার মাধ্যমে কর্মীদের ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করে। তাহারা আদর্শের ভিত্তিতে লোক সংগ্রহ করে এবং আদর্শ অনুযায়ী সমাজ সেবায় ব্রতী হয়। যেটুকু শক্তিই তাহাদের থাকে সেটুকু পরিমাণেই সেবা করিয়া যায়। এইরূপে যাহারা কর্মী সৃষ্টি করে, ক্ষমতা লাভ করিলে তাহারা সেবা দ্বারা সমগ্র জাতিকেই উন্নত করিয়া তোলে। কিন্তু যদি একই আদর্শের লোক দ্বারা দল তৈরি না হয়, তাহা হইলে দল হিসাবে সমাজ সেবা যেমন সম্ভবপর নয়, ক্ষমতালাভ করিবার পর সরকার হিসাবেও জাতির সেবা করা অবাস্তব হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের দুরবস্থাই ইহার প্রমাণ।

www.bjilibrary.com

দুর্গতির প্রতিকার ঃ

রোগ- নির্ণয় করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। রোগের কারণ বুঝিতে পারিলে সহজেই ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে রোগ ধরাই চিকিৎসার মূল। উপরে আমাদের দুর্দশার যে সকল কারণের আলোচনা করা হইল, তাহা দূর করিতে পারিলেই দেশের উন্নতির কাজ শুরু হইবে।

কোন দেশকে একদিনে গড়িয়া তোলা যায় না। কোন বড় সমস্যার দুই-চারি বৎসরে সমাধান করা যায় না। যাহারা "সাত দিনে ডাল ভাত" দিবার মিথ্যা ওয়াদা করিয়া ভোট হাসিল করে, ২১ দফার সস্তা শ্লোগান দিয়া পরে তাহা অসম্ভব ও অবাস্তব বলিয়া নিজেরাই বুঝিতে পারে, তাহাদের কথা বাদ দিলে প্রত্যেক সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন লোকই এই কথা স্বীকার করিবেন যে, একটি জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে কঠোর সাধনা, দীর্ঘ সংগ্রাম, গভীর দরদ ও কঠিন আত্মত্যাগের পয়োজন হয়।

প্রতিকারের প্রথম কাজ ঃ

দুর্গতির প্রধান কারণ যে চিন্তার পরাধীনতা, তাহার প্রতিষেধক হিসাবে চিন্তার বিশুদ্ধতার কাজই প্রতিকারের কঠিন কর্তব্যের প্রথম পদক্ষেপ। যাহারা সমাজের খেদমত করিতে আগ্রহ রাখেন, তাহাদের উচিত–প্রথম মন-মগজকে পরিষ্কার করা। হুজুগে মাতিয়া কোন একদিকে ধাবিত হইলে জাতির অমঙ্গল আরও ত্বরান্বিত হইবে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিবার যে মহাসুযোগ রহিয়াছে, তাহাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইয়া দুনিয়ার মতাদর্শসমূহকে তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া যে কোন একটি আদর্শকে পাকিস্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়া লওয়াই প্রধান কাজ।

আদর্শ বাছাই করিবার ব্যাপারে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এই দেশ ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই দেশের শতকরা ৮৫ জন নাগরিক মুসলমান, মুসলমানরা প্রকৃত মুসলমান হিসাবেই বাঁচিতে ও মরিতে চায়, এবং এই দেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইসলামের সহিত তুলনা না করিয়া কোন আদর্শের বিচার করা মারাত্মক অন্যায় হইবে।

দ্বিতীয় কাজ ঃ

আদর্শের বাছাই হইয়া গেলে অর্থাৎ যে আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুস্পষ্ট ধারণা হয় তাহারই ভিত্তিতে সংগঠন করিয়া আদর্শবাদী দল গঠন করাই জাতির মুক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ। যাহারা যে আদর্শকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহাদের মনুষ্যত্ববোধ এতটা থাকা প্রয়োজন যে, যাহাকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে তাহাকে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিবে। বর্ণচোরা মনোভাব লইয়া যে দল বা ব্যক্তি কাজ করিবে তাহা দ্বারা দেশেরও যেমন কোন উপকার হইবে না, তাহারা নিজেরাও মোনাফেক হিসাবে একদিন জাতির নিকট ধরা পড়িয়া যাইবে।

www.bjilibrary.com

তাই যাহারা যে আদর্শে বিশ্বাস করিবেন সেই আদর্শ প্রথমে নিজেদের চরিত্রে রূপায়িত ও কায়েম করুন। এইরূপ চরিত্রবান লোকদের সমন্বয়ের দল গঠন করিলেই তাহা দ্বারা জাতির সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর।

তৃতীয় ও চতুর্থ কাজ ঃ

এইরূপ আদর্শবান কর্মীর সমন্বয়ে যে দল গঠন করা হইবে, সেই দলকে আপন ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজের সর্বদিকে সেবা করিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্রাকার গর্ভণমেন্টের মত জনগণের সহযোগিতা লইয়া জাতির জীবনের সর্বত্র যে অসংখ্য রোগ দেখা দিয়াছে, তাহার চিকিৎসার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই ভাবেই অদূর ভবিষ্যতের সরকার পরিচালক ও জাতীয় উন্নতির ধারক ও বাহকদের বাস্তব শিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর হইবে।

চিন্তার বিশুদ্ধতা, আদর্শভিত্তিক সংগঠন ও সমাজ সংস্কার বা সমাজ সেবার মাধ্যমে যেমন নুতন নেতৃত্ব, নুতন কর্মীদল ও নুতন গণমন সৃষ্টি করা হইবে, তেমনি যেটুকু শক্তি লাভ হইবে, তাহাকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। প্রতি নির্বাচনেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঐ শক্তি অনুযায়ী আইন সভায় ক্ষমতা লাভ করিয়া গভর্ণমেন্টকে সংশোধন করিতে পূর্ণ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এইরূপে ক্রমে এই আদর্শবাদী দল রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করিয়া জাতিকে বিশ্বে স্থায়ী আসন দান করিতে পারিবে। ইহার পর এই আদর্শকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় এই দেশে কায়েম করিয়া এমন আদর্শ সমাজ স্থাপন করা যাইবে যাহা বিশ্বের মানব সমাজকে সহজেই আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইবে।

জামায়াতে ইসলামী ইসলামকে বাছাই করিয়া লইবার পর এই পদ্ধতিতেই কাজ করিয়া চলিয়াছে। যাহারা আদর্শ বাছাই করেন নাই, তাহাদেরও এই বিজ্ঞানসম্মত পথেই আগ্রসর হওয়া উচিত। আমাদের দুর্দশার প্রতিকারের ইহাই একমাত্র পথ।

www.bjilibrary.com

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি

[১৯৬৯ সনের জুলাই মাসে অধ্যাপক হেলাল উদ্দিনের সম্পাদনায় এটা প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সনের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
-সম্পাদক

মুসলমানের পরিচয় ঃ

এ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য যে মহান স্রষ্টা প্রত্যেক সৃষ্টির উপযোগী বিধানের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন-যাপনের জন্যও নিয়ম-নীতি দিয়েছেন। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধি-বিধানের নামই 'ইসলাম' এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি অবলম্বনকারীকেই মুসলিম বলে। 'মুসলিম' শব্দটি আরবী। ফারসী ভাষায় এর নাম হলো 'মুসলমান'। মুসলমান ঐ ব্যক্তির নাম যে সচেতনভাবে আল্লাহপাককে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনিব হিসাবে এবং রসূলকে (সঃ) আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছে ।

কাফের যেমন উপরোক্ত মতাদর্শ ও জীবন-পদ্ধতি গ্রহণ করলে মুসলমান হয়, কোন মুসলমানও তেমনি এ নীতি ত্যাগ করলে কাফেরে পরিণত হয়। কাফেরের সন্তান ইসলাম গ্রহণ করলে যদি মুসলমান হয়, তাহলে মুসলমানের বংশধর হয়ে ইসলামী আদর্শ পরিত্যাগ করলে কাফেরে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং মুসলমানিত্ব গ্রহণ বা বর্জনযোগ্য একটা গুণ। কলেজের প্রিন্সিপালের ছেলে বলেই যেমন অশিক্ষিত হয়েও গদিনশীন প্রিন্সিপাল হওয়ার দাবী অগ্রাহ্য, তেমনি ইসলামের নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও মুসলমান পিতা-মাতার সন্তানের গদিনশীন মুসলমান দাবী করাও অযৌক্তিক।

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি ঃ

ইসলামী জীবন-বিধান জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। যারা এ বিধানকে গ্রহণ করে তাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, জ্ঞান ও কর্ম এবং জীবন-যাপনের নিয়ম-নীতি এক বিশেষ ধরনের ছাঁচে গড়ে উঠে। আর যারা ইসলামকে গ্রহণ করে না বা ইসলামী জ্ঞান ও জীবন-বিধানকে পালন করতে রাজী নয় তাদের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠাই স্বাভাবিক। এক কথায় মুসলমান ও অমুসলমানের জীবনধারা এক রকমের হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃভাষা আরবী ছিল। কিন্তু যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনলোনা, তারা একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও রসূল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে রইলো। আর যারা ইসলামী আদর্শকে গ্রহণ করলো, তারা তাদেরই বংশ ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হলো। একই এলাকায়, একই ভাষাভাষী, এমনকি একই গোত্রের লোকদের মধ্যে আদর্শ, নীতি ও জীবন বিধানের পার্থক্যের দরুন আরব মুসলমান ও

www.bjilibrary.com

আরব অমুসলমান পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হলো। আবার অন্য ভাষার লোকও ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আরব-মুসলমানদের সাথে মিলে এক জাতি হয়ে গেলো। সুতরাং, মুসলমানদের জাতীয়তার ভিত্তি একমাত্র ইসলাম। ভাষা, বংশ, বর্ণ, দেশ ইত্যাদি মুসলমানদের জাতীয়তার ভিত্তি নয়। মুসলমানদের জাতীয়তা আদর্শ-ভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক নয়।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮) তারিখে রংপুরের এক ছাত্র প্রতিষ্ঠান তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করেছে যে, "প্রয়োজন হলে আমরা মুসলমানিত্ব পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু বাংগালিত্ব পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।" কথাটা সত্য, কিন্তু এ কথার উদ্দেশ্যটা সত্য নয়। মুসলমানিত্ব এমন একটা নীতি যা গ্রহণও করা যায়, ত্যাগও করা যায়। জাতীয়তাও গ্রহণ বা পরিত্যাগ করারই বিষয়। কিন্তু আমরা জন্মগতভাবে বাংলাভাষী। তাই এটা ত্যাগ করার বিষয়ই নয়। আমরা ইচ্ছা করে বাংলাভাষী পিতামাতার সন্তান হইনি। তাই এটা করাও সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত এলাকাটিতে সমুদ্র পথে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে আরব মুসলমানগণ ইসলামের বাণী নিয়ে প্রবেশ করে। এ দেশবাসী সবাই হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল। নবাগত ইসলাম প্রচারকদের সুন্দর জীবন-যাপন পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে এ দেশের অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য এলাকার মুসলিম শাসকগণ লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাদেশেও মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে।

বাংলাদেশে শত শত বছর থেকে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানেরা বাস করে আসছে। জনসাধারণের বাংলাভাষাকে মুসলিম শাসকগণই উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। একই বাংলাভাষী মুসলমান ও হিন্দু দু'টো জাতি এত দীর্ঘকাল একসাথে বাস করা সত্ত্বেও উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মুসলমানদের মধ্যে যারা ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে গড়ে উঠেনি, তারা প্রতিবেশী হিন্দুদের কোন কোন রীতি ও প্রথা গ্রহণ করেছে। কিন্তু হিন্দুদের সাথে মুসলমানরা কোনদিনই এক জাতিতে পরিণত হয়নি। এমনকি মুসলমান ও হিন্দুদের ভাষার মধ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান দেখা গেছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলিম ও বাংগালী হিন্দুদের রীতি-নীতি, চাল-চলন, এবং বিধি-বিধানে ব্যবধান চলে এসেছে।

বাংগালী মুসলমানরা যে বাংগালী হিন্দুদের সাথে একজাতিতে পরিণত হয়নি এ কথা ঐতিহাসিক মহাসত্য। একমাত্র ভাষার মিল ছাড়া আর কোন দিক দিয়েই তাদের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য ছিলোনা। এমনকি একই বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানী বাংলায় বেশ পার্থক্য ছিল। পল্লী অঞ্চলে এখনও এ পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষায় কথা বলেও বাংগালী মুসলমানরা পৃথক জাতিই রয়ে গেল।

ইংরেজ আমল ঃ

ইংরেজ শাসকদের হাতে মুসলমানদের পরাজয়ের পর এ দেশে তাদের শাসনকে মজবুত করার জন্য ইংরেজরা বর্ণ হিন্দুদের যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলো। এরই প্রতিদানে

www.bjilibrary.com

ইংরেজ শাসকরা হিন্দুদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। এ দেশেরই ইংরেজ কর্মচারী উইলিয়াম হান্টার তার "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্" পুস্তকে একথা স্বীকার করেছেন যে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের ইংরেজ শাসনেই মুসলমানরা এক অশিক্ষিত, দরিদ্র ও নিষ্পেষিত জাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি এ কথা প্রকাশ করেননি যে, এ সময়ের মধ্যে হিন্দুরা সর্বদিক দিয়েই প্রাধান্য লাভ করে। মুসলমান কৃষকদের উপর হিন্দু জমিদারদেরকে মধ্য-স্বত্বভোগী হিসাবে চরম শোষণের সুযোগ ইংরেজরাই দিয়েছিলো। ইংরেজ সরকারের চাকুরীতে হিন্দুরাই বিশ্বস্ত হিসাবে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও হিন্দুদেরই একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়। এরই ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হয়, ঋণের জালে মুসলমানদের ভিটে-মাটিও তাদের দখলে চলে যায়।

ওদিকে মুসলমানদের স্বাধীন জাতীয়তাবোধ ইংরেজ-শাসনকে মেনে নিতে পারেনি বলে চরম সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত প্রধানতঃ মুসলমানরাই ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার বিপ্লবী সংগ্রাম চালাতে থাকে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও সাইয়েদ ইসমাইল শহীদের বিপ্লবী আন্দোলনে বাংগালী মুসলমানরা যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করে তা ইতিহাসের উজ্জ্বল ঘটনা।

পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংগালী মুসলমান ঃ

ইংরেজ শাসনামলে বাংগালী মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা চরমভাবে নিষ্পেষিত হওয়ার ফলেই আজাদী আন্দোলনেও তারা হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলো না। দ্বি-জাতিত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠলো, তখন বাংগালী মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী সমর্থন দান করলো। পাকিস্তান দাবীর ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশে বাংগালী মুসলমানরাই ঐতিহাসিক ও অতুলনীয় বিজয় লাভ করে।

বাংগালী মুসলমানরা যদি হিন্দুদের সাথে মিলে এক জাতি হতে রাজী হতো, তাহলে পাকিস্তানের পক্ষে এত বড় বিজয় কিছুতেই সম্ভব হতো না। বাংগালী মুসলমানরা ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদের সঙ্গে এক জাতিত্ববোধ করেছিলো বলেই পাকিস্তান আন্দোলন সফল হয়েছে।

মুসলমানরা যদি 'বাংগালী জাতিতে' বিশ্বাস করতো তাহলে বাংগালী সুভাষ বোস, শামা প্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ বিধান রায়, প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ বাংগালী জাতীয়তার ধারকগণকে অবশ্যই নেতা মেনে নিতে রাজী হতো। কিন্তু বাংলা ভাষী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা কোনদিনই বাংগালী জাতিত্বে বিশ্বাস করেনি। তাই অবাংগালী কায়েদে আযমকে তারা অকুণ্ঠভাবে নেতা মেনে নিয়েছিলো। বাংগালী মুসলমানের আজীবন সেবক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হকের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বও কায়েদে আযমের নেতৃত্ব থেকে বাংগালী মুসলমানদেরকে বিচ্যুত করতে পারেননি। শেরে বাংলা কায়েদে আযমের নেতৃত্ব ত্যাগ করলেও বাংগালী মুসলমানরা শেরে বাংলাকে অনুসরণ করেন নি।

www.bjilibrary.com

ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দু জাতি যখন সর্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করেছিলো তখন বাংগালী হিন্দুদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। সে সময় হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্য প্রতিভাবানদের এক বাহিনী হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে 'বাংগালী' নামে চালু করেন। মুসলমানগণ তখন সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থাকায় তাদের অগ্রগতি একচেটিয়াভাবে এবং অপ্রতিহত গতিতে বাড়তে থাকে।

আধুনিক কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের হাতেই সমৃদ্ধি লাভ করে। ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুদের চিন্তাধারা রুচিজ্ঞান এমনকি তাদের ধর্মীয় উপমা, কিংবদন্তী, পরিভাষা ইত্যাদি 'বাংগালী'র রূপ লাভ করে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ সর্বক্ষেত্রেই বাংগালীর নামে নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে চালু করেছেন। হিন্দু সভ্যতার নামে এসব চালু হলে মুসলমানদের পক্ষে এ থেকে প্রভাবান্বিত হবার সম্ভাবনা এতটা ছিলো না।

স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু- সভ্যতার বিকাশের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে যে 'শ্রীপদ্ম' ছিলো এতেও তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

আধুনিক শিক্ষার দিকে বাংগালী মুসলমানরা যখন রওনা হলো, তখন হিন্দুরাই সব স্কুল-কলেজে আরবী ও ফারসীর শিক্ষক ছাড়া আর সব বিষয়ের শিক্ষক ছিলো। এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শিক্ষার সুযোগ না থাকায় শিক্ষিত বাংগালী মুসলমানরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মুসলমান না হয়ে বাংগালী হবার প্রেরণাই পেয়েছে। মুসলমানরা জাতি হিসাবে তখন অনেকটা অবচেতন অবস্থায় ছিল।

পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ ঃ

পাকিস্তান আন্দোলন গোটা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলো, একথা নিঃসন্দেহে সত্যই কিন্তু এ চেতনা পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি নয়। মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে অনুভূতিটুকু ছিল, পাকিস্তান আন্দোলন সেটুকুকে কাজে লাগিয়েছে মাত্র। ইসলামের নাম ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি সম্ভব ছিলনা বলেই ঐ অনুভূতিকে উস্কানী দেয়া হয়েছিলো। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কর্মে যদি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার সত্যিকারের প্রভাব থাকতো, তাহলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের জন্য তাঁরা অবশ্যই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের দোহাই দিয়ে তাঁরা মুসলিম গণসমর্থন আদায় করলেন। কিন্তু পাকিস্তানে ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের মাধ্যমে ঐ পৃথক জাতীয়তাবোধকে বলিষ্ঠ পূর্ণতায় রূপ দান করার কোন সামান্য পরিকল্পনাও তাঁরা গ্রহণ করেননি।

ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে সর্ববৃহৎ আজাদ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান কায়েম হওয়া এবং পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের হস্তে নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা অর্পিত

www.bjilibrary.com

হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যের বিপরীত পথেই মুসলমান জাতিকে পরিচালনা করা হলো। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি তাঁরা আন্তরিকভাবে নিষ্ঠাবান হতেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই ঃ

(১) আধুনিক যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক গবেষণা, ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও এ বিষয়ে চিন্তাবিদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতেন।

(২) পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রবিশিষ্ট রূপে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা চালাতেন।

(৩) সর্বস্তরে ইসলামী চরিত্রবিশিষ্ট নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করতেন।

যদি এ ব্যবস্থা ও প্রস্তুতির প্রতি তাঁরা মনোযোগী হতেন তাহলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আইন, শিক্ষা ও প্রচার—এ তিনটি পথেই পাকিস্তানের উদ্দেশ্যের দিকে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারতেন।

আযাদ পাকিস্তানের বিশ বছর ঃ

উপরোক্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা না থাকার ফলে আযাদ পাকিস্তানের গত বিশ বছরে মুসলমান জাতি সর্বদিক দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আইন, শিক্ষা ও প্রচার-এ তিনটি হাতিয়ারই জাতির সভ্যতা ও তমদ্দুনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলাম পাকিস্তানে এ পর্যন্ত আইনের কোন সাহায্য তো পায়ইনি বরং দেড়শ' বছরের কাফের শাসনের চাপ সহ্য করেও মুসলমানদের পারিবারিক আইন যেটুকু আজ টিকে ছিল তাও ধ্বংস করা হয়েছে।

প্রচারের ক্ষেত্রে আজ পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি জাতিকে শুধু যে ইসলামী চেতনা, নৈতিকতা ও মুসলমানিত্ব থেকেই সরিয়ে দিচ্ছে তা নয়, এদেশের মুসলমানদেরকে মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্যুত করে বিবেকহীন পশুতে পরিণত করার মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটা কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। গত বিশ বছরের যে ফসল আজ জাতির সামনে উপস্থিত তা মুসলমান হিসাবে এ জাতির ধ্বংসের সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। মুসলমানী চরিত্র সৃষ্টি তো বহু দূরের কথা, এ শিক্ষা মুসলমানদের জাতীয়তাবোধটুকুকেও অবশিষ্ট রাখেনি।

দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্র জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যাতে নাগরিকদের মন-মগজ ও চরিত্র জাতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী গঠিত হয়।

কিন্তু পাকিস্তানই এ বিষয়ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা যাদেরকে তৈরী করেছে তারা এটুকুও শিখবার সুযোগ পায়নি যে ঃ

(১) পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি কায়েম করার কি প্রয়োজন ছিল? ভারতকে খন্ড খন্ড করে কি লাভ হলো?

(২) পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি? এ জাতির আদর্শের রূপ কি? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতাদর্শের চেয়ে আমাদের জাতীয় আদর্শ শ্রেষ্ঠতর কিনা?

www.bjilibrary.com

(৩) জাতির আদর্শ অনুযায়ী নাগরিকদের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত?

(৪) বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবন সমস্যার সমাধান জাতির আদর্শ মোতাবেক কিভাবে করা সম্ভব?

(৫) জাতির আদর্শকে মানব-জাতির মধ্যে প্রসারিত করার জন্য কিরূপ বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন?

এ শিক্ষার পরিণাম ঃ

যে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার এমন দুর্দশা, সে জাতির ছাত্র ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের পক্ষে যোগ্য নাগরিক হওয়া তো দূরের কথা, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষও তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের মধ্যে জাতির আদর্শ বলে কিছু শেখায় না সেহেতু তারা আদর্শহীন নাগরিক হিসাবেই গড়ে উঠে। তারা দুনিয়ার প্রচলিত যে কোন আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে। তাদের চিন্তাধারা বল্গাহীন হওয়াই স্বাভাবিক, জাতীয়তাবোধ থেকে বঞ্চিত থাকাই এদের ভাগ্য। ফলে জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে এ কিশোর ও যুবকরা পথহারা পথিকের ন্যায়ই অসহায়। এরা যদি এসব বিষয়ে নিজেরা কোন পথ বেছে নেয় তাহলে এদেরকে দোষ দেয়া যায় না।

আজ এদের কতক সমাজতন্ত্রের আদর্শে ঈমান আনতে বাধ্য হয়েছে। আরও কতক বাংগালী জাতীয়তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর বহুসংখ্যক কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী মানব জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ অবস্থায় টেডিবাদের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। বস্তুগত ভোগ ও পাশব জৈব-সুখ ছাড়া মনুষ্যত্বের কোন সন্ধানই এরা পাচ্ছে না। এ সবের জন্য এক বিন্দুও এরা দায়ী নয়। দেশের পরিচালকবৃন্দ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাই এর শতকরা একশ ভাগ দায়ী।

এদের প্রতি মনোভাব ঃ

কিশোর-যুব-সমাজের এ অধঃপতন ও পথভ্রষ্টতা দেখে যারা এদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন, তাদেরকে আর যাই হোক চিন্তাশীল বলা চলে না। যারা চিন্তাশীল ও দরদী মনের লোক, তাঁরা এ অবস্থা দেখে কুপথগামী সন্তানের চিন্তাক্লিষ্ট পিতার ন্যায় যুব-সমাজের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য। যুব-সমাজের মধ্যে সঠিক চিন্তার বিকাশ, জাতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা সৃষ্টি এবং মানসিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যতীত এ মহামারী থেকে জাতির ভবিষ্যত বংশধরদেরকে কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সরকারী প্রচেষ্টায় ও সহায়তায় যুব সমাজ পথভ্রষ্ট হচ্ছে বলেই আমাদের পক্ষেও কি তাদের পতনের এ দৃশ্য নীরবে দেখতে থাকা উচিত?

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের আঁতাত

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান যুব-সমাজের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তা ও পাকিস্তানী জাতিত্ববোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা না থাকায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যারা পাকিস্তানবাদে বিশ্বাসী নয়, তাদের পক্ষে ভাবপ্রবণ ও অনভিজ্ঞ কিশোর সমাজকে বিভ্রান্ত করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছে। নগ্ন পুঁজিবাদ ও একনায়কত্ব দেশের পরিবেশকে ঐ বিভ্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রের জন্য মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিবেচনা ও অবহেলার ফলে বিভিন্ন দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে

www.bjilibrary.com

বে-ইন্‌সাফী হয়েছে, তার প্রতিকারের দোহাই দিয়ে একশ্রেণীর রাজনৈতিক বিভিন্ন মতবাদের ধুয়া তুলেছেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এ মনোবৃত্তির লোকেরাই বাংগালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতিকে সমাজে চালু করার প্রয়াস পাচ্ছেন। এ ভাবেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মধ্যে এক হীন ষড়যন্ত্রমূলক আঁতাত গড়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রীদের একটা মহলও সম্প্রতি এ আঁতাতের সাথে যোগ দিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক কোটি বাংগালী হিন্দু রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক কোটি বাংগালী হিন্দুর বাস। যদি পূর্ব-পাকিস্তানের বাংগালী মুসলমানরা বাংলাদেশ বা বাংলাভাষার ভিত্তিতে বাংগালী জাতির অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুদের সাথে মিলেই সে জাতিত্ব গড়তে হবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি তাতে সম্মতি দিবে? বিশ বছর আগের ইতিহাস আমাদের যুবকদের মোটেই জানা নেই। তাদের নিকট বাংলাভাষী হিন্দু অবাংগালী মুসলমানের চেয়ে বেশী আপন! অথচ তাদের বাপ-দাদার সাথে তাদের বর্তমান হিন্দু বন্ধুদের বাপ-দাদারা কিরূপ ব্যবহার করেছে, সেকথা তাদের জানা নেই। মুসলমান জাতি প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে মিলে অখন্ড-ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হতে কেন রাজী হলোনা, একথা বর্তমান যুব সমাজকে জানান হয় না। সর্বদিক দিয়ে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত মুসলমানরা যে মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাস করার ফলেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিলো, সে চেতনা এদেরকে দেয়া হচ্ছে না।

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান কোন পথে?

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের অবহেলার দরুন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এর প্রতিকার হিসাবে যারা ইসলামী জাতীয়তাকে বর্জন করতে চান; তাদের প্রধান রোগ হলো হীনমন্যতা। পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের বাস পূর্ব-পাকিস্তানে। দুনিয়ার কোন দেশেই অধিকাংশ লোক বিচ্ছিন্ন হবার চিন্তা করেনা। পূর্ব পাকিস্তানই জনসংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তানের বড় অংশ। হীনমন্যতাবোধ না থাকলে আমরা বিচ্ছিন্ন হবার চিন্তা কেন করবো?

আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী, কেন্দ্রীয় চাকুরী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমতার দাবী এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবী আদায় করতে হলে প্রথমতঃ গণতন্ত্র কায়েম করা দরকার এবং যোগ্য প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচিত করা দরকার। এ সব দাবী আদায়ের জন্য বাংগালী হওয়া জরুরী নয়। আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় বঞ্চনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অযোগ্য ও স্বার্থপর নেতৃত্বই প্রধানতঃ দায়ী। নিঃস্বার্থ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারলে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করলেও সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

মুসলিম জাতি হিসাবে সচেতন ও জাগ্রত জীবনযাপনই আমাদের উন্নতির একমাত্র পথ। মুসলমানিত্ব পরিত্যাগ করে এবং অপর জাতির অনুকরণ করে উন্নতি দূরের কথা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য

[ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কৃতি ছাত্রনেতা নির্ভীক সেনানীর ভূমিকা পালন করেছেন তিনি এ নিবন্ধে দলিল প্রমাণসহ অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে জাতির সামনে একটি ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এটা একটা অরাজনৈতিক আন্দোলন ছিল।

যে কোন আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে হলে তার উদ্যোক্তাদের নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যে আন্দোলন ১৯৫২ সালে গণদাবীর রূপ লাভ করে এর সূচনা ১৯৪৭ সালেই হয়। '৪৭-এর ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশটি বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে নতুন রাষ্ট্রটি বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে বর্তমান বাংলাদেশ তারই পূর্বাঞ্চল হিসাবে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত হয় এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে।]

১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামে একটি পুস্তিকার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের প্রচেষ্টা ও সম্পাদনায়ই এ ঐতিহাসিক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। 'তমদ্দুন মসজিলস' নামে একটি নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করে। এ সংগঠনটি এর মাত্র দু'সপ্তাহ পূর্বে ১লা সেপ্টেম্বর জন্মলাভ করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে যার উদ্যোগ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্রটি জন্মলাভের দু'সপ্তাহ পরই তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়, তিনিও ঐ অধ্যাপক আবুল কাসেমই।

এ কথা সত্য যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পূর্ণ কৃতিত্ব কোন এক ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রাপ্য নয়। এ আন্দোলনে যাদের যা যা অবদান রয়েছে ভাষা আন্দোলনের "সঠিক ইতিহাসে" তাদের যথার্থ উল্লেখ থাকবেই। কিন্তু এ আন্দোলনের সূচনা কে করলেন সে কথার যথার্থ স্বীকৃতি ব্যতীত "সঠিক ইতিহাস" রচনা সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে আমি এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। তাই কোন রকম প্রতিবাদের পরওয়া না করে আমি দাবী করে বলতে চাই যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে যদি কোন এক ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করতে হয় তাহলে সে নামটি অধ্যাপক আবুল কাসেম। আর যদি এ ব্যাপারে কোন সংস্থা বা সংগঠনের নাম নিতে হয় তাহলে সে নামটি তমদ্দুন মজলিস।

এ বিষয়টির গুরুত্ব ঃ

ভাষা আন্দোলনের আলোচনায় এর প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তাকে স্বীকৃতি দেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একটি আন্দোলন যিনি শুরু

www.bjilibrary.com

করেন তাঁর চিন্তাধারা, আদর্শ ও মন-মানসিকতা জানা থাকলে ঐ আন্দোলনের পেছনে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সহজ হয়। একই আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যোগদান করতে পারে। ফলে আন্দোলনকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা চলে।

একশ্রেণীর ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী তাদের মতবাদের সমর্থনে এ দাবী করছেন যে ঐ সব মতবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যেই নাকি জনগণ ঐ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ভাষা আন্দোলনে ঐ সব মতবাদে বিশ্বাসী লোকও নিশ্চয়ই শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু গোটা আন্দোলনের কোন পর্যায়েই জনগণের নিকট তাদের ঐ গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিস কোন আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতে আগ্রহী তা কখনো গোপন ছিল না। ছাত্র-জনতা ভাষা আন্দোলনে যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শরীক হয়েছিল তা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের উদ্দেশ্যে নয়। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করার প্রয়োজনে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়াই ছিল ঐ আন্দোলনের আসল লক্ষ্য।

১৯৫৬ সালে রচিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার ফলে ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক সফলতা লাভ করে। এরপর ভাষা আন্দোলনে যারা শরীক ছিলেন তারা নিজ নিজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ কায়েমের কাজ করে এসেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে কোন রাজনৈতিক মতবাদ যে জড়িত ছিলনা সে কথা জোর দিয়েই বলা চলে।

মূল নেতৃত্বে নিয়তের গুরুত্ব ঃ

"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামক যে পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের সূচনা করে তা অধ্যাপক কাজী মুতাহার হোসেন, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেমের লেখা তিনটি প্রবন্ধের একটি সংকলন। এর সম্পাদনা অধ্যাপক আবুল কাসেম নিজেই করেছেন। তিনি যদিও ইসলামী আদর্শে দেশ গঠনের উদ্দেশ্যেই তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তবুও ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্পাদিত ঐ পুস্তিকায় তাঁর আদর্শকে তুলে ধরেননি। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে একটি **সার্বজনীন** আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই সব ধরনের রাজনৈতিক মত ও পথের লোকই তাতে শরীক হবার সুযোগ পেয়েছেন। যদি তিনি ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর আদর্শিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতেন তাহলে ভাষা আন্দোলন কখনও **সার্বজনীন** রূপ লাভ করতে পারতো না। ভাষা আন্দোলনের মূল নেতা হিসাবে এতে তাঁর নিয়তের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।

ঐ পুস্তিকাটির মুখবন্ধে যে প্রস্তাবগুলো সন্নিবেশিত হয়। তা নিম্নরূপঃ

"স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাক-বিতন্ডা শুরু হয়েছে।... আমরা নিম্নরূপ প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের সুধী সমাজের নিকট পেশ করছি ঃ

www.bjilibrary.com

১। বাংলা ভাষাই হবে–

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি- উর্দু ও বাংলা।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশ জনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তপ্রাদেশিক ভাষা।..

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা।... ... ...

ঠিক একই নীতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে স্থানীয় ভাষা বা উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা, আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।"

উপরোক্ত প্রস্তাবাবলীর পেছনে প্রস্তাবকের নিয়ত অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ এবং গোটা প্রস্তাবটাই ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ। জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি বাংলাভাষাকে গোটা পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানো হতো তাহলে তা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো।

ভাষা আন্দোলনের স্থপতিগণের নিয়ত বিশুদ্ধ থাকার কারণেই অতি অল্প সময়ে তা সব মত ও পথের লোকদের নিকট দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, যার ফলে আন্দোলন সফল হয়।

নিয়তের ত্রুটিতে আন্দোলনের ব্যর্থতার নযীর ঃ

যে কোন আন্দোলনের উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয়দের নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে যে আন্দোলন ব্যর্থ হয় এর নযীর যথেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতা এ বিষয়ে অতি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

একটি কেয়ার টেকার সরকারের পরিচালনায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েম করে স্বৈরশাসন খতম করার দাবীতে প্রায় সকল রাজনৈতিক মত ও পথের ছোট বড় অনেক দল '৮৩ সাল থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। দেশব্যাপী যাদের সংগঠন রয়েছে এমন কয়েকটি বড় দল এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে ছাত্র-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণীর মানুষ এতে সাড়া দেয়। কিন্তু একাধিকবার এ আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জনগণের ত্যাগ ও কুরবানী মাঠে মারা যায়।

এর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এ কথাই প্রমাণ করে যে বড় বড় কোন দলের নেতৃত্বে নিয়তের ত্রুটি ছিল। তারা স্বৈরশাসনের অবসানের পর নিজ দলের ক্ষমতা লাভের নিশ্চয়তা না পেলে স্বৈরশাসন উৎখাত করতে চাননি। জনগণের অবাধ ভোটাধিকার

www.bjilibrary.com

বহালের খাঁটি নিয়ত থাকলে তাঁরা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে পারতেন না।

এ উদাহরণটা একথা প্রমাণ করার জন্যই পেশ করা হল যে, ভাষা আন্দোলনের প্রধান ও মূল নেতৃত্বে নিয়তের কোন ত্রুটি ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী যে সব নেতা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অনেকেই ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনের দাবী পূরণ করতে সক্ষম হননি। ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁদের নিয়ত শুদ্ধ হলে তাঁরা বাংলাভাষার জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন।

ভাষা আন্দোলনের দাবী ঃ

ভাষা আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগী ব্যক্তি বাংলাভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও জনগণের ভাষায় পরিণত করার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। তিনি বাংলা কলেজের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। বাংলা বানান পদ্ধতিকে সহজ করার জন্য যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। বাংলাভাষাকে দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, বাংলাদেশের জনগণের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে পশ্চিম বংগের ভাষা থেকে এদেশের ভাষাকে পৃথক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা, পশ্চিম বংগের রচিত পরিভাষার অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিভাষা সৃষ্টি করাই ছিল ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের দাবী। কিন্তু উদ্দেশ্যে সততার অভাবেই জনগণের বাংলাভাষা আজও যথার্থ স্বীকৃতি পায়নি। গত প্রায় কয়েক দশক বাংলা একাডেমী যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাদের নিকট এ সব দাবী কোন গুরুত্ব পায়নি। বরং তারা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী বলে এপার ও ওপারের বাংলায় কোন পার্থক্য বাকী রাখতে চান না। বাংলা একাডেমীর প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম ও তাঁর সাথী কয়েকজন ভাষাসাধক যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে এগিয়ে যেতে পারেনি।

তাই ভাষা আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য আজও সফল হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি।

[এ প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক জাহানে নওতে প্রকাশিত হয়।]

www.bjilibrary.com

সমাজ সংগঠনের হাতিয়ার

যে কোন সমাজ গড়ে তুলতে হলে অথবা তার কাঠামো বদলাতে হলে চারটি প্রধান হাতিয়ার ব্যবহার করা অপরিহার্য। এই হাতিয়ারগুলোর সাথে আনুষংগিক আরও অনেক পন্থা অবলম্বন করতে হয় বটে, কিন্তু মৌলিকভাবে চারটি অস্ত্রই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। সমাজকে গড়বার ব্যাপারে যেমন এ কয়টি হাতিয়ার অপরিহার্য। তেমনি ভাঙ্গার ব্যাপারেও এগুলোই প্রধান অবলম্বন। মোট কথা সমাজের যে কোন প্রকার দীর্ঘস্থায়ী ও বলিষ্ঠ পরিবর্তন এগুলোর সাহায্যেই হয়ে থাকে।

১-আইন ঃ

এ চারটি হাতিয়ারের পয়লাটিই হচ্ছে আইন। সমাজে যে ধরনের আইন জারী করা হয় ঠিক সে ধরনেরই মূল্যবোধ ও চরিত্রগুণ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইংরেজগণ যে সময় এ দেশের মুসলমানদের নিকট থেকে রাজশক্তি কেড়ে নিয়েছিল মুসলানদের সেই পতন যুগেও আদালত ফৌজদারীতে ইসলামী আইন জারী ছিল।

মুসলিম শাসনামলে জেনার জন্য উভয় পক্ষকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো বলে জেনা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে সে আইন বদলিয়ে দেবার ফলে জেনার ব্যাপক প্রসার হতে লাগলো। ইংরেজদের আইনে জেনা কোন দূষণীয় কাজ নয়। তাদের আইনের চোখে শুধু জোরপূর্বক কোন মহিলাকে ধর্ষণ করা অন্যায় বলে স্বীকৃত। উভয় পক্ষ রাজী থাকলে জেনা তাদের নিকট দূষণীয়ই নয়। এমনকি সরকারীভাবে জেনার জন্য সে আইনে লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা আছে।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলামী আইন ও ইংরেজ প্রবর্তিত আইনের এক রকমের পরিণাম নিশ্চয়ই হতে পারে না। জেনা সম্পর্কে ইংরেজদের তথাকথিত উদার আইন সমাজে স্বাভাবিকভাবেই ব্যভিচারের রাজত্ব কায়েম করেছে।

হত্যা করলে আইনের চোখে শাস্তি অনিবার্য বলেই মানুষ সাধারণ খুন করতে সাহস পায় না। যারা খুন করে তারাও ধরা না পড়ার সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে নেয়। তাই খুন সমাজে সহজসাধ্য নয়। আইনে খুনের শাস্তি এত কঠোর না হলে নিশ্চয়ই হত্যার সংখ্যা ব্যাপক হতো। আজকের সমাজে এমন অনেক কাজ আছে যাকে অন্যায় বলে সব মানুষই স্বীকার করে। কিন্তু সে জন্য আইনের কোন চাপ না থাকায় সে অন্যায় কাজও ব্যাপক আকার ধারণ করছে। এখানেও জেনার উদাহরণ অত্যন্ত উপযোগী। বিবাহ ব্যতীত যৌন সম্পর্ককে দূষণীয় বলে সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু আইন এ বিষয়ে কঠোর নয় বলে এ নিন্দনীয় কাজটি মহামারীর ন্যায় সমাজ-দেহে ছড়িয়ে পড়েছে।

www.bjilibrary.com

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে, সমাজকে বিশেষ কোন ছাঁচে ঢালাই করতে হলে সে ধরনের আইনই জারী করা অপরিহার্য। ইসলাম যে ধরনের নৈতিকতা সমাজে চালু করতে চায় সে পরিবেশের উপযোগী আইনও ইসলামে রয়েছে। কিন্তু যারা ইসলামী আইন সমাজে চালু না করেই ইসলামী নৈতিকতা কায়েম হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন, তারা হয় নির্বোধ না হয় ধোঁকাবাজ। তাই সমাজে ইসলামী পরিবেশ ইসলামী চরিত্রগুণ, ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হলে ইসলামী আইনের প্রচলন অত্যাবশ্যক।

ইংরেজ যেমন একদিন এদেশে আইনের হাতিয়ার দ্বারাই তাদের পছন্দসই পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি করেছিল, আজকে সে পরিবেশকে বদলিয়ে ইসলামী সমাজের রূপ দিতে হলে তেমনি আইনের হাতিয়ারটি ইসলামের হাতে আসতেই হবে। কারণ আইনের ন্যায় জবরদস্ত হাতিয়ার জাহেলিয়াতের হাতে থাকলে কোন সমাজেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ইসলামী সমাজ সংগঠন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান হাসিল করা সত্ত্বেও দিন দিন আমাদের সমাজ থেকে ইসলামের মূল্যবোধ ও ইসলামী নৈতিকতা দ্রুত বিদায় গ্রহণ করছে। এর পয়লা কারণই হলো ইসলামী আইনের অভাব। অনেক শিক্ষিত লোকও এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন নন বলে প্রশ্ন করে বলেন যে, এত ওয়াজ এত ওলামা এত কেতাব এত মাদ্রাসা সত্ত্বেও সমাজে ইসলাম কায়েম হয় না কেন? কিন্তু একটু চিন্তা করলে তারা নিজেরাই এর জওয়াব পেতে পারেন। পাকিস্তানে যদি আইন-কানুন জারী করার কোন-শাসন শক্তি না থাকে এবং আইন অমান্য করলে যদি কোন শাস্তির ব্যবস্থা না হয়, তাহলে সরকারী কর্মচারীদের ওয়াজ নছিহত দ্বারা কি আইন এমনিতেই সমাজে কায়েম হয়ে যাবে? দুনিয়ার কোথাও শুধু ওয়াজ নসিহত দ্বারা কোন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। উপদেশ আইন জারী করার বেলায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আইনের শক্তি ব্যতীত সে উপদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয় না। নামাজ রোজা না করলে আইনের মাধ্যমে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই বলে ইসলামের এ বুনিয়াদগুলো সমাজে মজবুত হয়ে কায়েম হতে পারছে না। অথচ শরীয়তে এই জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।

নবী করীম (ছঃ) ১৩ বছরের দীর্ঘ সাধনায় কতক ব্যক্তি গঠন করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু হিজরতের পর আইনের হাতিয়ার হস্তগত না করা পর্যন্ত সমাজে ইসলামের কোন বিধানই তিনি জারী করতে পারেননি। আইনের শক্তি হস্তগত হওয়ার ফলেই ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী সমাজকে পুনর্গঠিত করা তার পক্ষে সম্ভব হলো। আইনের এই মহা অস্ত্রটি অনৈসলামী শক্তির হাতে থাকলে নুহ (আঃ)এর ন্যায় শত শত বছর নসিহত করতে থাকলেও আরব সমাজে ইসলামী সমাজ কায়েম হতে পারতো না।

২-শিক্ষা ঃ

সমাজ সংগঠনে আইন এক মহাশক্তি হলেও একমাত্র শক্তি নয়। আইনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো শিক্ষা। আইনের অস্ত্র যাদের হাতে তারা যে ধরনের

www.bjilibrary.com

আইন সমাজে চালু করতে চান, শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিক সে ধরনের মানুষ তৈরি করার পরিকল্পনা তাদের গ্রহণ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে ইসলামী মন-মগজ তৈরি করার স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। যুবক যুবতীর সহশিক্ষার প্রচলন করে উন্নত নৈতিক চরিত্র সৃষ্টির আশা করা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

বর্তমানকালে রাষ্ট্রের কর্মসীমা ব্যাপক হয়ে পড়ায় শিক্ষাও আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই আইনের অস্ত্র যে ধরনের লোকের হাতে ব্যবহৃত হয়, শিক্ষাও তাদেরই রুচি মোতাবেক গড়ে ওঠে। আইনের প্রভাবকে এড়িয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আইনের অধিকারীরা শিক্ষাকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে সক্ষম।

ইংরেজরা যদি এদেশে নিজেদের আদর্শ মোতাবেক কতক মন-মগজ তৈরি করার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম না হতো, তাহলে কিছুতেই দীর্ঘকাল তারা এদেশের উপর রাজত্ব করতে পারতো না। ইংরেজ আইনের সাথে সাথে শিক্ষার হাতিয়ারটিও নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করার ফলে এদেশের মানুষের মধ্যেই ইংরেজের বহু মানস সন্তানের সৃষ্টি সম্ভব হয়। এমনকি এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমদের ঘরেও ইংরেজদের বান্দা পয়দা হতে থাকে।

আজও আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত রয়েছে তাতে আর যাই হোক ইসলামী সমাজ গঠনের উপযুক্ত কর্মী দল যে মোটেই তৈরি হচ্ছে না সে কথা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। যদি সত্যিই এদেশে কেউ ইসলামী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেন, তাহলে তাকে আইনের অস্ত্রের সাথে সাথে শিক্ষার হাতিয়ারটিকেও সুপরিকল্পিতরূপে ব্যবহার করতে হবে।

৩-প্রচার ঃ

আইন ও শিক্ষার পর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো প্রচার। দেশে যত প্রকার প্রচারযন্ত্র আছে, তা যে ধরনের নীতি ও আদর্শের ধারক হবে, সমাজে সে ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হবে। আধুনিক যুগে প্রচারের জন্য এমন কতক শক্তিশালী উপকরণ রয়েছে যা দ্বারা অতি দ্রুত ও অল্প আয়াশে সমাজে যে কোন বিষয় প্রচার করা সম্ভব। রেডিও, পত্রপত্রিকা, সিনেমা, টেলিভিশন, মাইক্রোফোন, পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রচারযন্ত্রসমূহ আজ যে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, সমাজে তাই দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলছে। আজকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মুখে যে অশ্লীল গান শোনা যায়, তার কৃতিত্ব প্রধানত সিনেমার। আজ সমাজের সর্বত্র যে উলঙ্গ ছবি প্রচলিত হয়ে পড়েছে, তার জন্য পত্র-পত্রিকাগুলোই দায়ী।

যাদের হাতে আইনের অস্ত্র রয়েছে তারাই প্রচারযন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং প্রচারের উপায় উপকরণগুলো তাদের রুচি মোতাবেক সমাজে সব কিছু চালু করে থাকে। যদি সমাজকে ইসলামের আদর্শে গঠন করতে হয় তাহলে এ সব

www.bjilibrary.com

প্রচারযন্ত্রগুলোকে ইসলামের মূল্যমান ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যারা এগুলো দ্বারা সম্পূর্ণ অনৈসলামী পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ দেয় তাদের মুখে ইসলামের নাম শুধু মোনাফেকীর পরিচয়ই দান করে।

এসব শক্তিমান হাতিয়ারের মোকাবেলায় সমগ্র আলেম সমাজের ইসলাম প্রচার, ওয়াজ নসিহত ও ইসলামী সাহিত্যের প্রচার অত্যন্ত নগণ্য। সারা বছরে আলেম সমাজ দেশে ইসলামের পক্ষে যত ওয়াজ করেন রেডিও ও সিনেমার মারফতে মাত্র একদিনেই তার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরীভাবে অনৈসলামী ভাবধারার প্রচার করা সম্ভব। আজকাল এসব শক্তিমান হাতিয়ারের মারফত যে গতিতে জাহেলিয়াতের প্রচার চলছে এসবকে ইসলামী সমাজ গঠনের কাজে ব্যবহার করলে সে গতিতেই খেদমত পাওয়া যেতে পারে। তাই ইসলামী সমাজ গড়তে হলে এসব হাতিয়ারকে ব্যবহার করা অপরিহার্য।

৪-নেতৃবৃন্দের উদাহরণ ঃ

আইন, শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা যে সমাজে ভাঙ্গা গড়ার কাজ ব্যাপকভাবে করা যায়, আমরা উপরে সে আলোচনা করেছি। কিন্তু নেতৃত্বের চাবিকাঠি যাদের হাতে তাদের বাস্তব উদাহরণের চেয়ে আর কোনটাই এত কার্যকরী হয় না। নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মজীবনে যে ধরনের রুচি ও চরিত্রের পরিচয় দেন, সরকারী কর্মচারীরা তাই অনুকরণ ও অনুসরণ করে। ফলে সমাজ-দেহে তা অতি দ্রুত প্রচলিত হয়ে পড়ে। যেসব নেতা মুখে ইসলামের বুলি কপচানো সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে নাচ গান বিচিত্রানুষ্ঠান নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি উপভোগ ও উৎসাহিত করেন তাদের মুখের বুলি কোনদিনই সমাজের মাটিতে শিকড় গাড়ে না বরং তাদের চারিত্রিক উদাহরণই সমাজদেহে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় প্রসারিত হয়। সুতরাং ইসলামী সমাজ গড়তে হলে দেশে এমন সব ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজন, যাদের কর্মজীবন ইসলামী আদর্শের স্বাক্ষর গ্রহণ করে। অনৈসলামী চরিত্রের লোক নেতৃত্বের হাতিয়ার দখল করতে থাকলে তাদের উদাহরণ দ্বারা সমাজে জাহেলিয়াত কায়েম হওয়ার পথই প্রশস্ত হবে।

উপসংহারে আমরা ইসলামপন্থী প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তির নিকট বিষয়টি সম্পর্কে ধীরভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। যারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দ্বীন ইসলামের তরক্কী চান এবং সমাজ-দেহকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত দেখতে চান, তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আইন, শাসন, প্রচার ও নেতৃত্ব এ চারটি প্রধান হাতিয়ার ইসলামের হস্তগত না হওয়া পযর্ন্ত তাদের সে আশা বাস্তবরূপ লাভ করতে পারে না। নবী করীম (ছঃ) তের বছরের চেষ্টায় এ চারটি হাতিয়ার দখল করতে পেরেছিলেন বলেই তৎকালীন সমাজে ইসলাম কায়েম হয়েছিল।

[সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় ১৯৬৮ সনের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গোলাম আযম

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপর এদেশের স্বাধীনতা ও অগ্রগতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অধ্যাপক গোলাম আযম এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তার যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ ঘটে তা পুরোপুরি বিকাশ লাভ করে ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এ পাশ করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ ও ১৯৪৭-৪৮ এবং ৪৮-৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৪৯ সালে ঢাকা আগমন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে জনাব গোলাম আযমই তাঁকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবী সম্বলিত স্মারক লিপি প্রদান করেন এবং সেটি পাঠ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের জন্য পুনরায় গ্রেফতার হন।

অধ্যাপক আযম ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। '৫৭ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। '৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন এবং বাংলাদেশের জন্মকাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর লাহোর যান। ডিসেম্বরের তিন তারিখে করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ সম্ভব না হওয়ায় বিমানটি পথ পরিবর্তন করে জেদ্দায় চলে যায়। তখন থেকেই তার বাধ্যতামূলক প্রবাস জীবন শুরু হয়। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই তিনি ঢাকা ফিরে আসেন।

www.bjilibrary.com

প্রতিশ্রুতিশীল নেতৃত্বের যোগ্যতার কারণে তিনি পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের (পিডিএম) পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। '৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত 'ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি' (ডাক) ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাজনৈতিক জীবনে অধ্যাপক গোলাম আযম বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে তাকে রংপুরে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তাঁকে আটক করে লাহোরে জেলে রাখা হয়।

সে বছরের মার্চে লাহোর থেকে মুক্তি দেয়া হলেও ঢাকায় ফিরে আসার পর বিমানবন্দরে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

একজন রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগত থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন। দেশ বিভাগের আগে ৪৫-৪৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। '৫৬-৫৭ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদনা পরিষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানার জন্য দৈনিক সংগ্রামের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মহল আপনাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ যখন বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো তখন স্বাধীন বাংলাদেশকে আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ত আমার কোন আচরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রমাণ করার কারো ক্ষমতা নেই। সুতরাং শুধু ৭১-এর ভূমিকার কারণেই আমাকে এদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে গালি দেয়া অযৌক্তিক।

৭১-এ আমার যে ভূমিকা ছিলো তা আমার একার ছিলো না। এদেশে সব ক'টি ইসলামপন্থী দল এবং লক্ষ লক্ষ সক্রিয় ইসলামপন্থী লোক এই ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হলেও আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তারাই সবচেয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তার পক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তার ফলেই ভারত বিভাগ হলো ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। এই আন্দোলনকেই উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন বলে গ্রহণ করে মুসলিম ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, উলেমা সকলেই অংশগ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, নজরুল ইসলাম এবং

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও এ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান নেতা ও কর্মী হিসেবে অংশ নেন। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে পরাধীন দেশ মনে করতো না। স্বাধীন দেশ মনে করতো। ৬ দফাকে স্বাধীনতার দাবী বলেনি বরং স্বায়ত্তশাসনের দাবী বলেছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো সংগ্রাম করেছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথেই আমি 'কপ' 'পিডিএম' ও 'ডাক'-এ 'গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেছি। আজীবন যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হয়েছেন তারা আওয়ামী লীগের সাথে ১৯৭১ সালে একমত না হয়ে থাকলে কোনক্রমেই স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে না। তাকে বড়জোর রাজনৈতিক মতপার্থক্য বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করলো এবং যারা অংশ গ্রহণ করলোনা বা ভিন্ন মত পোষণ করলো তাদের সম্পর্কে মরহুম আবুল মনসুর আহমদ এত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন যা আমি বললে হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আমাকে শাস্তি পেতে হতো। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে প্রতিপক্ষকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করার চিরাচরিত প্রথা সাময়িকভাবে গুরুত্ব পেলেও স্থায়ীভাবে তা গুরুত্ব পেতে পারে না।

আওয়ামী লীগ আজ সেকুলারিজমের ধারক ও দ্বি-জাতিত্বের বিরোধী। মূলত তার রাজনীতির সূচনা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে। ৫৪ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল। মুসলিম শব্দটি বর্জন ও যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করে মুসলিম জাতীয়তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন মনে করা হলো যখন শেরে বাংলা, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং ব্যালেন্স অব পাওয়ার এসে গেল আইন সভার অমুসলিম সদস্যদের হাতে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী মুসলিম লীগকে অমুসলিম সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দল বলে মনে করতেন বলেই তাঁরা শেরে বাংলা ও আবু হোসেন সরকারের সাথে হাত মিলালেন। আওয়ামী লীগ 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে ক্রমে ক্রমে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেল। সুতরাং কোন ইসলামপন্থী দল বা ব্যক্তি যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল হতে না পেরে থাকে এজন্য তাদের রাজনৈতিক গালি দেয়া যেতে পারে, দেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ইসলামপন্থী যেসব দল ও ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সহযোগিতার ক্ষেত্র স্থাপন করতে পারেনি, সহযোগিতাকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণময় বলে বিশ্বাস করতে পারেনি এবং তদানীন্তন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি আজ তাদের কোন কার্যকলাপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা কোন দিক থেকে? আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারত রাশিয়া সবার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে আজাদী নিয়ে বাঁচতে চায়। তবুও একথা বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর

www.bjilibrary.com

আঘাত আসার সবচেয়ে বেশী আশংকা ভারত ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে। রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করার পর এখানে রুশপন্থীদের আচরণে এই আশংকা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

'৭৫ সালের আগস্টের পর যারা এদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়ে আবার ভারতের সাহায্য নিয়ে এদেশে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে এবং এখনো করছে বলে শোনা যায় তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কি ধারণা বিরাজ করছে? তাদেরকে কি জনগণ স্বাধীনতার সংরক্ষক বলে মনে করে? এদেশের কোনো ইসলামপন্থী দল বা ব্যক্তি রাশিয়া বা ভারতের সাথে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা নষ্ট করবে বলে কারো কি আশংকা রয়েছে? যদি ভারত ও রাশিয়ার সাথে যোগসাজশে স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার সামান্যতম সন্দেহও ইসলামপন্থীদের করা না যায়, তাহলে কোন্ যুক্তিতে ইসলামপন্থীদেরকে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করা হবে?

বর্তমানে ইসলামপন্থী দল ও নেতৃবৃন্দ যদি এমন কিছু করছে বলে প্রমাণিত হয় যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সামান্যতম ও ক্ষতিকর, তবে তা জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হোক। তা না করে যদি '৭১ এর ভূমিকার কারণেই তাদের স্বাধীনতা বিরোধী বলে গালি দেয়া হয় তাহলে সেটা 'রাজনৈতিক ভোতা অস্ত্র' ছাড়া আর কোন সংজ্ঞায় পড়ে না।

ভারত বিভাগ ছিল একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ হওয়ার পর ভারতে মুসলিম লীগ নেতাদেরকে এবং পাকিস্তানে কংগ্রেস নেতাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করা হয়নি। '৭১ সালে আমার যে ভূমিকা ছিল তা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই। এ প্রসঙ্গে আমি শেরে বাংলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেছিলেন অথচ ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও জনগণ তাঁকে দেশদ্রোহী বলেনি। বরং তিনি পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রন্টে নেতৃত্ব দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। অথচ তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে গালি দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকার সোহরাওয়ার্দীকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে ২৪ ঘন্টার জন্য কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু তিনিই পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তাই এ ধরনের গালি দ্বারা কোন দেশপ্রেমিক নেতার জনপ্রিয়তা ম্লান করা সম্ভব নয়। আমাকে তো দূরে থাক যারা '৭১ এ একই সাথে একই দলে কাজ করেছিলেন, তারাই আজ পরস্পরকে দেশদ্রোহী স্বাধীনতার শত্রু ইত্যাদি গালি দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, আপনি নাকি বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানাতে চান?

www.bjilibrary.com

উত্তর ঃ যদি ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকতো, তাহলেও এসন্দেহ করার একটা যুক্তি ছিল। দুই দেশের মাঝখানে বিরাট একটা দেশ। দেশটা একদেশ থাকতেই এক রাখা যায়নি। এ সত্ত্বেও একথা পাগলেই বলতে পারে কিন্তু কোন পাগলও তা বিশ্বাস করবে না।

প্রশ্ন ঃ গত কিছুদিন থেকে পত্র-পত্রিকায় আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা প্রকাশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ যারা লিখছে তারা কোনপন্থী দেশের জনগণেরই তা বিচার্য। তাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা কতটুকু নিরাপদ সেটাও জনগণ দেখবে; গত ১ বছর ৮ মাসের মধ্যে আমি কোথায়ও কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখিনি কোন জনসমাবেশে দেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করিনি।

এ সময়ের মধ্যে দেশে আমি কোন সফর করিনি।

এ পর্যন্ত দু'টি সীরাত মাহফিলে বক্তৃতা করেছি। কেউ বলুক আমার কোন কথাটি আপত্তিকর হয়েছে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে প্রমাণ করুক। নারায়ণগঞ্জে তমদ্দুন একাডেমী আয়োজিত সীরাত মাহফিলে বক্তৃতা দেয়ার পর থেকে যেভাবে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি হয়েছে তাতে আমার এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে যে পত্রপত্রিকায় যে মহল হৈ চৈ শুরু করেছে তাদের পরিচয়ই আমার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট। রসূলুল্লাহর (সঃ) যে আদর্শকে এ দেশে আমি বাস্তবায়িত দেখতে চাই, তারা এর বিরোধী হওয়ার কারণেই আমার বিরোধিতা করছে।

কিন্তু সেটাকে দোষ হিসাবে পেশ করার কোন উপায় নেই বলে আমাকে দেশবাসীর কাছে হেয় করার এই অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আপনাকে যেসব হুমকি দেয়া হচ্ছে তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর ঃ দেশের আইন-শৃংখলা অবস্থা এ থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। দেশে একটা সরকার কায়েম আছে এবং আমি যে এদেশে আছি সরকার তা জানে। দেশে আসার পর প্রায় দেড় বছর হতে যাচ্ছে নাগরিকত্বের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানো হয়েছে। এ অবস্থায় লিখিত আকারে পত্রিকায় লিখে হত্যার হুমকি দেয়ার কোন নজীর আমার জানা নেই। যারা আমাকে দেশ থেকে তাড়াবার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছেন তারা যদি দেশপ্রেমের কারণেই এটা করে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বর্তমানে দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে একদল আরেক দলকে দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা বিরোধী ইত্যাদি অপবাদ দিচ্ছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে হামলা করা হচ্ছে। এটা আমাদের দেশের একটা রাজনৈতিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, আমিও এটাকে সে হিসেবেই গ্রহণ করেছি। এটা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। প্রতিপক্ষকে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে মোকাবেলা করা দরকার।

www.bjilibrary.com

প্রশ্ন ঃ নাগরিকত্ব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ নাগরিকত্ব মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা সর্বত্র স্বীকৃত এবং কোন সরকারেরই নাগরিকত্ব হরণ করার এখতিয়ার নেই। যত বড় অন্যায়ই কেউ করুক দেশের আইন দ্বারা সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন অন্যায়ের জন্যই নাগরিকত্ব হরণ করা যেতে পারে না। তবু অতীতের সরকার এই অন্যায় আদেশ দিয়েছে সেজন্য আমি আইনগত দিক পূরণের উদ্দেশ্যে আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিদেশে থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে বারবার দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দেশে এসে আবার যথাযথ নিয়মেই দরখাস্ত দিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব বহাল করার ব্যাপারে যতটুকু করণীয় ছিল তা করার পর আমি এদেশের নাগরিক নই একথা বলার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। যাদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল যদি তাদের কাউকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে না দেয়া হতো তাহলে এর একটা যুক্তি ছিল। যারাই নাগরিকত্ব চেয়েছে, দেয়া হয়েছে। আমি ছাড়া চেয়েছে অথচ নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি এমন কেউ নেই।

আমি সরকারের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করছি না। এমনকি যে দু'টো সিরাত মাহফিলে আমার উপস্থিতিতে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার শ্লোগান দেয়া হয়েছে। সেখানে এর প্রয়োজন নেই বলে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ না করার জন্য আমি তাদের বলেছি। সরকার কি কারণে নাগরিকত্ব বহাল করতে বিলম্ব করছেন তা আমি জানি না। তবু দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার কারণে আমি দেশের রাজনীতিতে এ পর্যন্ত কোন অংশ নেইনি।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে ফিরে আসার পূর্বে আপনি কোথায় কিভাবে কাটিয়েছেন?

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য আমরা কয়েকজন '৭১ এর ২২শে নভেম্বর লাহোর যাই। দু'জন নভেম্বরেই চলে আসেন। ডিসেম্বরের তিন তারিখ আমি করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হই। ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল বলে কলম্বো হয়ে ঢাকা আসতে হতো, কলম্বো হয়ে আসতে ৬ ঘন্টা সময় লাগতো। কিন্তু আমাদের বিমানটি সাড়ে চার ঘন্টার সফর হয়ে যাওয়ার পর আবার কলম্বো ফিরে গেল।

কারণ তখন ঢাকায় যুদ্ধ চলছিল এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকা বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করায় ঢাকায় অবতরণ সম্ভব ছিল না। বিমানটি করাচীতেও ফিরে যেতে না পেরে পথ পরিবর্তন করে জেদ্দা চলে গেল। পরে পাকিস্তানে ফিরে লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এক বছর পর্যন্ত ভুট্টো আমাকে পাকিস্তান থেকে কোথায়ও যাওয়ার অনুমতি দেননি। ৭২ সালে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাই। এরপর আর পাকিস্তানে যাইনি। বিদেশে থাকাকালে পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম যে,আমার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। সে কারণে আমাকে বাধ্য হয়েই পাকিস্তানী পাসপোর্ট ৭ বছর ব্যবহার করতে হলো।

হজ্ব পরবর্তী ৬ বছর আমি প্রধানতঃ লন্ডনে কাটিয়েছি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। যেহেতু বিভিন্ন স্থানে আমি এটা লক্ষ্য করলাম যে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই ধারণা বিরাজ করছে যে,

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেহেতু ইসলামী আদর্শের ভবিষ্যত বিপন্ন হয়েছে।

এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিদেশে অবস্থানকালে যেখানেই গিয়েছি সেখানে আমি বাংলাদেশে ইসলামকে কোন শক্তি দাবিয়ে রাখতে পারবে না এবং এখানকার মুসলমানরা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বরদাশত করতে রাজী হবে না এ বিষয়ে মুসলিম বিশ্বকে নিশ্চয়তা দিয়েছি। তবে যাতে সংবিধান থেকে সেকুলারিজম প্রত্যাহার করা হয় এবং ইসলামের কাজ করতে যেসব বাধা আছে তা দূর করা হয় সে উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহান ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের উপর নৈতিক চাপ প্রয়োগের আবেদন জানিয়েছি।

এটা যদি বাংলাদেশের বিরোধিতা করা হয়ে থাকে তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ যারা আপনাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে অভিহিত করছে, তাদের উদ্দেশে আপনার কিছু বলার আছে কি?

উত্তর ঃ তাঁরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন আমিও সেদেশে জন্মেছি? এদেশের ভালোমন্দ কিসে এ সম্পর্কে আমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। দেশে এখন বহু মত ও পথ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক—এটা আমি চাই। এ নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। যারা আমার বিরোধিতা করছেন তাঁদেরকে অনুরোধ করবো যেন তাঁরা ইসলামকে জানার চেষ্টা করেন। এ আদর্শের জন্য তাঁরা যদি কাজ করেন তাহলে তাঁদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হইনি বলেই আমি স্বাধীনতার বিরোধী, এই চিন্তা থেকে তারা বিরত হবেন বলে আমি আশা করি।

আমি সবার প্রতি এ আহ্বান জানাচ্ছি যে, ইসলাম কোন দল বা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার উপর এদেশের স্বাধীনতা ও অগ্রগতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলে আমি বিশ্বাস করি। তাদেরকেও সে মহান আদর্শ গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি এবং আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ এ মুহূর্তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কোন কথাটি বলার প্রয়োজন মনে করছেন?

উত্তর ঃ বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা দুটো জোনে বিভক্ত। একটা সিন কিয়াং থেকে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া নিয়ে গঠিত এ দুটি জোন থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের চারিদিকে যদি কয়েকটি দেশ থাকতো তাহলে কোন একটির সাথে সংঘর্ষ হলেও অন্যটির সহযোগিতা আশা করা যেতো। কিন্তু সাড়ে তিন দিকেই এমন একটি দেশ দ্বারা বেষ্টিত যে দেশ থেকে এদেশের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। জনগণের মধ্যে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জজবা ও মুসলিম চেতনাবোধ এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে ইসলামী জেহাদের প্রেরণাই এদেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ। এ কারণে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকুল আবেদন জানাই।

[এ সাক্ষাৎকারটি ১৯৮০ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়।]

www.bjilibrary.com

১৯৮৮ সালের ৩০শে মে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

[জাতীয় সংসেদ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কে ২৯শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত বিতর্ক উপলক্ষে পরদিন এ সাংবাদিক সম্মেলন হয়]

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি জন্মসূত্রে আপনাদের মতো এদেশের একজন নাগরিক। অথচ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমাকে পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে চিত্রিত করে একতরফা মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল, যেহেতু অবৈধভাবে সরকার আমাকে-সহ বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করলেও পরবর্তী সময়ে যারাই নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য আবেদন করেছেন তাদের নাগরিকত্ব বহাল করা হয়েছে, সেহেতু আমার ব্যাপারেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু আমার নাগরিকত্বের ব্যাপারটি রহস্যজনকভাবে অদ্যাবধি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আমি আমার প্রিয় দেশবাসীর খেদমতে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে চাই।

১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর তদানীন্তন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি লাহোর যাই। বৈঠক শেষে ৩রা ডিসেম্বর করাচী থেকে ঢাকার পথে রওনা হই। ঐ দিনই ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে বোমা ফেলায় আমার বিমানটি দেশের কাছে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং সৌদী আরব যেয়ে আশ্রয় নেয়। তাই তখন আমার ঢাকা ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। এভাবে আমি বাধ্য হয়ে বিদেশে আটকা পড়ে যাই।

নাগরিকত্ব সংকট ঃ

বিদেশে বাধ্য হয়ে থাকা অবস্থায় দেশে ফিরে আসার সুযোগের অপেক্ষায় থাকা কালেই পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে আমাকেও বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। আমি তখন হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কা শরীফে ছিলাম। নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান ছাড়া দেশে ফিরে আসার উপায় না দেখে দেশের সাথে যোগাযোগের সুবিধার জন্য হজ্জের পরই লন্ডন চলে গেলাম।

আমার পরিবার, বৃদ্ধ পিতামাতা, ভাইবোন ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে অনিশ্চিত নির্বাসন জীবন বরণ করতে হল। দেশে ফিরে আসার

www.bjilibrary.com

কোন পথই খুজে পাচ্ছিলাম না। দেশে ফিরে আসবার আকাংখা এত তীব্র ছিল যে অনেকের পরামর্শ সত্ত্বেও লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার জন্য মনকে কিছুতেই রাযী করতে পারলাম না।

নাগরিকত্ব বহালের চেষ্টা ঃ

১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন যে পূর্ববর্তী সরকার যাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন তারা সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবরে দরখাস্ত করতে পারেন। আমি এ সুযোগে ১৯৭৬-এর মে মাসে লন্ডন থেকে যথারীতি দরখাস্ত পাঠাই। ১৯৭৭ সালে জানুয়ারীতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিকটও আবেদন জানাই। ১৯৭৮ সালে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নিকট আবার দরখাস্ত করি। অবশেষে আমার বৃদ্ধা ও অসুস্থ আম্মার আবেদনে সরকার আমাকে দেশে আসার অনুমতি দেন।

১৯৭৮ এর জুলাই মাসে দেশে আসার পর আবার নাগরিকত্ব বহালের জন্য যথারীতি দরখাস্ত করি। নভেম্বর মাসে সরকার ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে দেশ থেকে চলে যাবার নির্দেশ দেন। আমি লিখিতভাবে প্রেসিডেন্টকে জানাই যে আমার পক্ষে দেশ থেকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এর পর সরকার আমাকে আর কিছুই জানাননি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে আমি জানতাম যে ১৯৭৯ সালের মে মাসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পক্ষে সুপারিশ করে প্রেসিডেন্টের বরাবরে দস্তখতের জন্য পাঠিয়েছেন। ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জওয়াবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকার আমার নাগরিকত্ব বহালের প্রশ্নটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন এবং তা বহাল হওয়ার অপেক্ষায় আমি দেশে থাকতে পারি।

নাগরিকত্বের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিধান ঃ

আন্তর্জাতিক আইনের সকল বিধি-বিধান এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেহেতু ১৯৭২ সালের আদেশ বলে গৃহীত বাংলাদেশ নাগরিকত্ব এ্যাক্ট ১৯৫১ যা ১৯৭২ সালের ২২শে মে থেকে কার্যকর তদনুযায়ী আমি বাংলাদেশের নাগরিক। অধিকন্তু বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ ১৯৭২ (অস্থায়ী বিধান)এর ধারা ২ (১) অনুযায়ী আমি বাংলাদেশের নাগরিক যেহেতু আমার পিতা, পিতামহ সকলেরই জন্ম বর্তমান বাংলাদেশ বলে পরিচিত ভূখণ্ডে এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমি এই ভূখণ্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলাম এবং বাধ্য হয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক বছর বাইরে কাটানোর সময়টুকু বাদে আজ পর্যন্ত আমি স্থায়ীভাবে আমার জন্মভূমিতেই বসবাস করে আসছি।

www.bjilibrary.com

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লন্ডনে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের ২(১) ধারা (অস্থায়ী বিধান) মতে আমার নাগরিকত্বের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল বাংলাদেশের সরকার এক আদেশ বলে আমার নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয় যা আইন অনুযায়ী করা হয়নি সুতরাং বেআইনী। সুতরাং এটা ছিল দেশের সর্বোচ্চ আইন ও আইনের উৎস সংবিধানের ৬নং ধারার সম্পূর্ণ লংঘন, যাতে বলা হয়েছে "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।" তদানীন্তন সরকার কর্তৃক আমাকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের (Universal Declaration of Human Rights by the UNO in 1948) সুস্পষ্ট খেলাফ। কেননা বাংলাদেশও এই সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী। মানবাধিকার সনদের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "কোন ব্যক্তিকে খামখেয়ালিভাবে তার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।"

উল্লেখ্য যে জন্মসূত্রে নাগরিক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধান এতই সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় তার জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তার নিজ দেশের নাগরিক বলেই গণ্য হবে। এমন কি সে যদি অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর আবার নিজ দেশে ফিরে এসে তার জন্মভূমিতেই থাকতে চায় এবং অন্যদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে তাহলে আপনাআপনিই তার নাগরিকত্ব বহাল হয়ে যাবে।

বিষয়টি ঝুলে আছে কেন?

১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই দেশে আসার পর প্রায় দশ বছর আমি দেশে আছি। আট বছর পর্যন্ত চুপ থাকার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে লিখিতভাবে আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে আমি এতদিন কীভাবে দেশে আছি। জওয়াবে আমি জানিয়ে দিলাম যে জন্মগত অধিকারের দাবীতেই আমি নিজ দেশের নিজ বাড়ীতে বাস করছি। এরপর আজ পর্যন্ত সরকার আর কিছুই বলছেন না।

১৯৭৩ সালে যে ৮৪ জনকে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারাই নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার ইচ্ছায় দেশে এসেছেন তাদের সবারই নাগরিকত্ব বহাল হয়েছে। শুধু আমার বেলায় এ বিষয়টি কেন অমিমাংসিত রাখা হয় তার কোন কারণ সরকার আজ পর্যন্ত আমাকে জানাননি। সরকার আমার জন্মগত নাগরিক অধিকার বহাল না করে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নিয়ে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার সুযোগ করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং সরকারের একটি মহল অন্যায়ভাবে উস্কানীমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি সরকারী সাপ্তাহিকসহ কতক পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কিয়ে দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার বাড়ীতে সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত চালানো হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা ঃ

আমার বিরুদ্ধে যেসব অলীক কল্পকাহিনী পত্রপত্রিকায় লিখে আমার সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা খুবই ন্যক্কারজনক। আমি শৈশবকাল থেকেই এদেশের মাটি, আলো, বাতাস ও জনগণের সংগে একাকার হয়ে আছি। ছাত্র জীবন, কর্ম জীবন ও রাজনৈতিক জীবনে যাদের সাথে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছে তারা আমাকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন। আমার আদর্শিক দৃষ্টিভংগি, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছাত্র জীবন থেকে একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। যারা ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্রমন্ত্রে মুক্তির সন্ধান করেন তাদের সাথে আমার মত ও পথের বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। যারা আমার বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় মিথ্যার ঝড় তুলেছেন তারাও জানেন যে, ভিনদেশী মতাদর্শে বিশ্বাসী গুটিকতক লোক বিভ্রান্ত হলেও এদেশের বৃহত্তর জনতা একথা ভালো করেই উপলব্ধি করেন যে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিরোধ করাই এ প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কায়েম হবার পর বিদেশে আমার বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার নতুন নতুন যেসব হাস্যকর অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদেরই। বাংলাদেশ কায়েম হবার পর আমি এ সিদ্ধান্তই নিয়েছি যে আমার নিজ জন্মভূমিতেই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবো। আর এ কারণেই প্রথম সুযোগেই দেশে ফিরে এসেছি এবং কারো নির্দেশে দেশ থেকে চলে যেতে রাযী হইনি।

সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত পরিচয় ঃ

এদেশের দশ কোটি মানুষের ন্যায় আমিও জন্মসূত্রে বাংলাদেশী। ১৯২২ সালের ২২শে নভেম্বর ঢাকা মহানগরীর লক্ষ্মীবাজারস্থ মিয়া সাহেব ময়দান বা শাহ সাহেব বাড়ীতে আমার জন্ম। এটা আমার নানার বাড়ী। পিতামাতার পয়লা সন্তান হিসেবে মায়ের পিত্রালয়ে জন্মলাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার বাপদাদার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার নবীনগর উপজেলায় বীরগাঁও গ্রামে। ইউনিয়নের নামও বীরগাঁও। অন্তত ৭ পুরুষ থেকে আমাদের বংশের এটাই আদি বাসস্থান। ১৯৪৮ সালে আমার আব্বা ঢাকার মগবাজারে রমনা থানার কাছে একটু জায়গা কেনার পর থেকে আমরা ঢাকারই স্থায়ী বাসিন্দা।

নিজের গ্রামে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে একটু দূরে বড়াইল গ্রামে ৬ষ্ঠ শ্রেণী এবং কুমিল্লা শহরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর নবম শ্রেণী থেকে এম. এ পর্যন্ত আমার গোটা ছাত্র জীবন ঢাকা শহরেই কেটেছে। এম এ পাশ করার পর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার সময়টুকু বাদ দিলে আমার কর্মজীবনও ঢাকায়ই কেটেছে।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৫০ থেকে ৫ বছর তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে অগণিত মানুষের সাথে

www.bjilibrary.com

ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর ইসলামী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এ দেশের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামী ও রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন জোটের সাথে আমি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি। তবে '৭১ সালে আমার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সে বিষয়ে আমার বক্তব্য দেশবাসীর নিকট পেশ করা কর্তব্য মনে করেই "পলাশী থেকে বাংলাদেশ" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। আমি এবং আমার সহকর্মীরা ১৯৭১ সালে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদের আশংকায় রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণ করেছিল। এখনও আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি কেবলমাত্র ঐ দেশ থেকেই আসতে পারে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা নেতৃত্বদান করেন তাদের সাথে একমত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করার কথাও আমি কল্পনা করতে পারিনি। ভারতের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। যে ভারত মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, সে ভারত শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বাংলাদেশের কল্যাণকামী হতে পারে এমনটি ভাবতে পারিনি। তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসাবে আলাদা হওয়ার কথাও চিন্তা করা সমীচীন মনে করিনি। আমার বিশ্বাস ছিল ইসলামের ইনসাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে জনগণের অধিকার ও মর্যাদা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটবে। আজও আমি বিশ্বাস করি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম না হবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং শোষণ, জুলুম ও নিপীড়নের অবসান ঘটতে পারে না।

দশ বছর আমি যা করেছি ঃ

১৯৭৮ এ দেশে আসার পর আমার প্রতিটি তৎপরতা বা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশকে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আমি আমার নগণ্য মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করেছি। আমার লেখনি, বক্তব্য, আলোচনা, জুময়ার খুতবা ইত্যাদির মাধ্যমে এ প্রচেষ্টাই অব্যাহত রেখেছি যে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য সম্মিলিত সংগ্রাম চালাতে হবে। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের নাজাতের জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করেই চলতে হবে। জাতীয় আদর্শ ইসলামের ভিত্তিতেই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করা ছাড়া মানবতার মুক্তি আসতে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, ওলামা, ছাত্র, শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী, পেশাজীবী, সুধী, বুদ্ধিজীবী যাদের সামনেই আমার কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে সকলকেই আমি আল্লাহর দ্বীনের পথে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি।

www.bjilibrary.com

জনগণকে যুলুম ও শোষণ থেকে বাঁচাতে হলে ঈমানদার, সৎ ও চরিত্রবান লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমে এগিয়ে আসতে হবে। চরিত্রহীন, স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, স্বেচ্ছাচারী ও প্রতারকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে জনগণের দুরবস্থা আরো বেড়েই যাবে। চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, গণতন্ত্রমনা ও জনসেবার জযবা যাদের আছে তারা রাজনৈতিক ময়দানকে অপছন্দ করে দূরে সরে আছেন বলেই দেশের এ দুর্দশা। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাদেরকে সুসংগঠিত হয়ে জনগণের কাংখিত নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

যারা আমার উল্লেখিত ভূমিকা ও বক্তব্য অপছন্দ করেন তারা আমাকে পছন্দ না করাই স্বাভাবিক বরং আমার এ তৎপরতাকে তারা 'অপরাধ' বলেই গণ্য করবেন। কেউ পছন্দ করুন বা না করুন একজন মুসলমান হিসাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ কার্যক্রম আমাকে চালিয়েই যেতে হবে এবং আপনাদের কাছেও এ দোয়াই কামনা করি যে আল্লাহ পাক আমাকে এ তৎপরতা চালিয়ে যাবার তাওফিক যেন দান করেন।

যারা আমাকে মহব্বত করেন ঃ

যারা আমাকে দ্বীনের কারণেই মহব্বত করেন তাদের খেদমতে আরয করছি যে "আপনারা দোয়া করুন, মোটেই পেরেশান হবেন না। আমি তো আল্লাহর এক নগণ্য গোলাম মাত্র। আল্লাহর রাসূলগণও অত্যাচার ও হত্যার শিকার হয়েছেন। যদি আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদাত নসীব করেন তাহলে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? আপনাদের নিকট এ দোয়াই চাই যে আল্লাহ পাক যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত ইকামতে দ্বীনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার তাওফীক দান করেন।"

কুরআন পাক এ কথার সাক্ষী যে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন যখনি হয়েছে তখন সকল কায়েমী স্বার্থ এর গতিরোধ করার অপচেষ্টা করেছে। যেদেশে আল্লাহর আইন চালু নেই সে দেশের সরকার প্রত্যেক নবীর যুগেই চরম বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। আজও এর ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। যারা শুধু দ্বীনের খেদমতে আছেন তাদেরকে বাতিল শক্তি বরদাশত করতে পারে। কিন্তু দ্বীনে হক কায়েমের আন্দোলনকে বাতিল শক্তি কী করে সহ্য করবে? তাই আমার বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে তাতে আমার অন্তরে তৃপ্তিবোধ করছি যে আমি আল্লাহর পথেই এগিয়ে চলছি। এর জন্য মহান মনিবের দরবারেই শুকরিয়া জানাই।

আমি ঐসব অগণিত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ওলামা ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে দোয়া করছি যারা গত ১০ বছরে আমার জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবীতে বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমার প্রতি সুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

কারো বিরুদ্ধে আমার বিদ্বেষ নেই ঃ

আমি যে মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চাই তারা নবী ও রাসূল। তাই তাদের নীতি অনুযায়ীই আমি কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না। আদর্শের

www.bjilibrary.com

খাতিরে যাদের পথকে আমি ভ্রান্ত মনে করি তাদের সমালোচনা অবশ্যই করি। কিন্তু আমার সমালোচনার ভাষাই একথা প্রমাণ করে যে তাদের পথকে আমি ভ্রান্ত মনে করলেও অশালীন ভাষায় তাদের উল্লেখ করি না। আল্লাহ পাক এ বিষয়ে আমাকে যেন ভুল করা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

সংক্ষেপে আমি আমার কথা পেশ করলাম। আসল ফায়সালার মালিক আল্লাহ তায়ালা। দুনিয়ার বিচারে আমার প্রতি কী আচরণ হওয়া উচিত সে বিষয়ে জনগণের আদালতেই আমি নিজকে পেশ করলাম। আল্লাহ যে দেশে আমাকে পয়দা করেছেন আমি মৃত্যু পর্যন্ত সে দেশেরই খেদমত করতে চাই। প্রায় ৭ বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে থাকাকালে আল্লাহ পাকের নিকট এ দোয়াই করেছি যে তিনি যেন আমাকে দেশে এসে ইসলাম, দেশ ও জনগণের খেদমত করার সুযোগ দান করেন। আমার সে দোয়া কবুল করে দয়াময় রব আমাকে দেশে আসার তাওফীক দান করেছেন। যতদিন তিনি হায়াত রেখেছেন ততদিন যেন দ্বীন, দেশ ও জাতির কল্যাণে আমার দেহ, মন ও মগজের সামান্য যোগ্যতাটুকু কাজে লাগাতে পারি এ বাসনাই অন্তরে পোষণ করছি। আপনাদের নিকটও এ দোয়াই চাই। বাকী আল্লাহ পাকের মরযী।

যারা আমার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন তাদের জন্যও দোয়া করি। আমার সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের লড়াই নেই। তারা যদি ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বুঝতে পারেন তাহলে তাদের বর্তমান মতাদর্শ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। এমন উদাহরণ ক্রমেই বাড়ছে। অনেকেই না বুঝে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করলেও এক সময়ে ইসলামের দাওয়াত ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত করেছেন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

প্রিয় দেশবাসী ঃ

১। আমি জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা কি বে-আইনী নয়?

২। আমি যদি বে-আইনী কোন কাজ করে থাকি তাহলে আইন মতো আমার বিচার করা হলো না কেন?

৩। যদি বিদেশে থাকার কারণে আমার বিচার করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে গত ১০ বছর দেশে থাকা সত্ত্বেও কেন বিচার করা হয়নি?

৪। আমার মতো একই অজুহাতে যাদের নাগরিকত্ব অবৈধভাবে হরণ করা হয়েছিল তাদের সবারই নাগরিকত্ব বহাল হওয়া সত্ত্বেও আমার বেলায় হচ্ছে না কেন?

৫। দেশের অগণিত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ওলামা ও সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবিতে পত্রিকায় বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে নীরব কেন?

www.bjilibrary.com

নাগিরকত্ব ও মাতৃভাষা আল্লাহরই দান। কে কোন্ দেশে পয়দা হবে এবং কোন্ মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করবে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সিদ্ধান্ত নেন। আমি চেষ্টা করে বাংলাদেশে পয়দা হইনি। আমার আল্লাহই এ দেশকে আমার জন্মভূমি হিসাবে বাছাই করেছেন। তাই যারা আমার নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন তারা আমার ওপর কত বড় যুলম্ করেছেন তা আপনারাই বিবেচনা করুন। আর যারা আমার ঐ জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছেন না তারা কত বড় জঘন্য অন্যায় করেছেন তাও আপনারা চিন্তা করে দেখুন।

কোন নাগরিক দেশের আইনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে ঐ আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এমনকি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা চরম মানবতা বিরোধী কাজ। দুনিয়ার কোন দেশে এমন উদ্ভট ব্যাপার ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই।

দেশবাসী সবার প্রতি আবেদন ঃ

সর্বশেষে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, উপজাতি, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে আমার জন্মভূমির সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আমরা কেউ যেন অন্ধতার বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এটা কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়। ইসলাম থেকে প্রতিটি মানব সন্তানই কল্যাণ লাভের অধিকারী। আল্লাহর সৃষ্ট সূর্যের আলো যেমন সবার জন্য, আল্লাহর দ্বীন ইসলামও সকলের জন্যই। যারা দরজা জানালা খুলে রেখে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকার সুযোগ দেয় তারাই আলো পায়। তেমনি মনের কপাট খুলে যদি কেউ আল্লাহর দেয়া বিধানকে জানতে ও বুঝতে চায় তাহলে ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষের মনের উপর জোর খাটে না। এটা প্রতিটি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ প্রত্যেককে তার বিধান থেকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.bjilibrary.com

কারামুক্তির পর সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

সাংবাদিক সাক্ষাতকার ঃ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর প্রবীণ জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম দীর্ঘ ষোল মাস কারা যন্ত্রণা ভোগ করার পর আবার জনগণের মাঝে ফিরে এসেছেন। জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও গণধিকৃত কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী গোলাম আযমের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে তার গৌরবময় রাজনৈতিক অতীতকে কালিমালিপ্ত করার যে অশুভ চক্রান্ত শুরু করেছিল, জনগণের কাছে তাকে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করে তার ভাবমূর্তি বিনাশের যে ষড়যন্ত্র করেছিল তারই অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালের ২৪শে মার্চ সরকার তাকে ফরেনার্স অ্যাক্টে গ্রেফতার করে। কিন্তু হাইকোর্ট তাকে বাংলাদেশের জন্মগত নাগরিক ও তার নাগরিকত্ব হরণকারী আদেশটিকে অবৈধ ঘোষণা করে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দেয়। হাইকোর্ট তার আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে অবিলম্বে কারাগার থেকে মুক্তির নির্দেশ দেয়। গত ১৫ই জুলাই তিনি মুক্তিলাভ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ঘোষণার পর তাকে নিয়ে সৃষ্ট অহেতুক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে নতুন ঢাকা ডাইজেস্টের পক্ষ থেকে তার একটি দীর্ঘ সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছিল যা ডাইজেস্টের ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মুক্তিলাভের পর গত ১৯শে জুলাই ডাইজেস্টের পক্ষ থেকে তার আর একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাক্ষাতকারে অধ্যাপক আযম মুক্তিলাভের পর তার অনুভূতি ব্যক্ত করার সাথে সাথে তাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক, বর্তমান রাজনীতি এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিয়ে তার চিন্তাভাবনার কথা বলেছেন।

সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন নতুন ঢাকা ডাইজেস্টের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, দৈনিক সংগ্রামের বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ও দৈনিক সংগ্রামের সিনিয়র রিপোর্টার আযম মীর।

আলোকচিত্র তুলেছেন সংগ্রামের ফটো সাংবাদিক নবীউল হাসান।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ ষোল মাস কারাবন্দী থাকার পর আপনি মুক্তি পেয়েছেন। মুক্তি পাওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন?

গোলাম আযমঃ আমি রংপুর কলেজে অধ্যাপনা করার সময় বায়ান্ন সালে সারাদেশে বহু লোক গ্রেফতার হয় ভাষা আন্দোলনের জন্য। রংপুরে যে ক'জন পয়লা কাতারের ভাষা আন্দোলন কর্মী ছিলেন, আমি তার একজন। আমাকেও গ্রেফতার করা হলো। এরপর ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হলো, ইস্কান্দার মীর্জা গভর্ণর হয়ে আসলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, প্রত্যেক জেলায়

www.bjilibrary.com

স্ক্রিনিং কমিটি করে স্কুল-কলেজে যেসব পলিটিক্যাল এলিমেন্ট আছে, তাদের বের করতে হবে। ডিসি, এসপি এবং গভর্ণমেন্ট প্লিডার এই তিনজনকে দিয়ে স্ক্রিনিং কমিটি করা হলো। কলেজে তো ডিসিই থাকে গভর্নিং কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমার কলেজেও ডিসিই প্রেসিডেন্ট। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় ডাকলেন। তার ছেলে ছিল আমার ডাইরেক্ট ছাত্র। তখন ডিসিকে ডিএম বলা হতো। ডিএম আমাকে তার একেবারে প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বললেন, অধ্যাপক সাহেব, রংপুরের স্কুল-কলেজের পলিটিক্যাল এলিমেন্টদের তালিকা করা হয়েছে। আপনি তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কি করণীয়। তিনি বললেন, আরো দু'জন অধ্যাপকের কাছ থেকে আমি পদত্যাগপত্র নিয়েছি যদি আপনি পদত্যাগ করতেন তবে কোন ঝামেলা হতো না। আমি বললাম আপনি গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট, আমি মেম্বার। যদি একজন ছাত্রও আমাকে শিক্ষক হিসাবে পছন্দ না করে তবে আমি পদত্যাগ করবো এছাড়া তো আমি পদত্যাগের কোন কারণ দেখি না। একথা বলে চলে আসলাম। তার পরদিনই আমাকে গ্রেফতার করা হলো। তখন এই ছিল পরিবেশ। সেবার হাইকোর্ট করে জেল থেকে মুক্তি পাই।

তারপর আইয়ুব এর আমলে ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো। ঘটনাক্রমে আমি তখন লাহোরে সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ। সেখানে এ্যারেস্ট হলাম। দু'মাস থাকলাম। নিয়ম ছিল দু'মাসের মধ্যে রিভিউ বোর্ডের সামনে হাজির করা। আমি বোর্ডকে বললাম ১৫ দিনে একবার আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের নিয়ম আছে। দু'মাস আমাকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তারা আমাকে সোজা প্লেনে পাঠিয়ে দিল। প্লেনে ঘটনাক্রমে দেখা হলো সিএসপি মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর সাথে। যখন ফজলুল হক মুসলিম হলে আমি জিএস, মোয়াজ্জেম সাহেব ছিলেন ভিপি। আমি তাকে বললাম যেন বাড়ীতে গ্রেফতারের খবরটা দেয়া হয়।

জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণার পর এখানে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। আর সমগ্র পাকিস্তানে ৬০ জন গ্রেফতার হন। বেআইনী ঘোষণা ও গ্রেফতারির বিরুদ্ধে কেস হলো। এখানে জাস্টিস মোর্শেদ ছিলেন চীফ জাস্টিস। ঢাকা হাইকোর্ট জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা অবৈধ বলে ঘোষণা করলো। কিন্তু ওখানকার হাইকোর্ট সরকারী ঘোষণা বহাল রাখলো। আমরা গেলাম সুপ্রীম কোর্টে। এ কে রোহী আমাদের উকিল ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে কর্ণেলিয়াম ছিলেন চীফ জাস্টিস। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ বলতেন, এই খৃষ্টান লোকটি যতটুকু মুসলিম এ রকম মুসলিম আমি কম পেয়েছি। রীট পিটিশন শুনানীর আগেই তৎকালীন সরকার আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি হয়। এবার সাড়ে ৫ মাস ছিলাম। এবারের আগে দু'বার রীট করে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি।

ঢাকা ডাইজেস্ট ঃ এবার জেলে কর্মকর্তারা আপনার সাথে কোন বিরূপ আচরণ করেছেন?

www.bjilibrary.com

গোলাম আযমঃ জেল কর্মকর্তারা অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছেন, যে আচরণ তারা করেছেন তা শুধু আইনগত আচরণ নয়। মহব্বত না থাকলে এ রকম আচরণ পেতাম না। শুধু কর্তৃপক্ষই নয়, সিপাই, সুবেদার, জামাদার, কয়েদী সকলের কাছ থেকে মহব্বতই পেয়েছি। নিজামী সাহেবরা যখন আমাকে নিতে গেলেন ডিআইজি (প্রিজন) অফিসে, ডিআইজি বলেন, একটু বসেন, লক আপ করার সময় হয়ে এসেছে। লক আপ না হলে উনাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার চেষ্টা করবে। তাই লকআপ সেরে প্রায় ৬টায় আমাকে বের করা হয়। আসার পথে ওয়ার্ডগুলোর জানালা থেকে কয়েদীরা সবাই সালাম জানায়। রীতিমত হৈ চৈ করে উঠে তারা। যেসব কয়েদী আমার খেদমত করেছে, তারা চোখের পানিতে আমাকে বিদায় দিয়েছে। আমি যেখানে ছিলাম, সেটা সেন্ট্রাল জেলের বেস্ট জায়গা। এর নাম ছাব্বিশ সেল। ১২টা কামরা। ৯টা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়।দক্ষিণ দুয়ারী কামরা। এক একর জায়গা নিয়ে সামনে বাগান আছে ঘোরাফিরার জন্য। এটাকে মন্ত্রীদের সেল বলা হয়। মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, কর্নেল মালেক এই কামরায় ছিলেন।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ মুক্তির পর আপনার সময় কিভাবে কাটছে? আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি কেমন?

গোলাম আযমঃ জেলে তো বেকার ছিলাম। বেকার এই অর্থে যে কাজের কোন তাড়া ছিল না। বক্তৃতা দেয়ার বা লেখা দেয়ার কোন তাগিদ ছিল না সে হিসেবে জেলে ধীরে সুস্থে কাজ করতাম।জেল থেকে আসার পর এমন অবস্থা হয়েছে যে, এর মধ্যেই ঘুমের যথেষ্ট এরিয়ার (বাকী) হয়ে গেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সকলে দেখা সাক্ষাত করতে আসছেন। দেখা সাক্ষাতের আনন্দের জন্য ক্লান্তি অনুভব করা যাচ্ছে না।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ জেলে থাকা অবস্থায় আপনি বিশেষ কিছু লিখেছেন। এ সম্পর্কে জানাবেন কি?

গোলাম আযমঃ (একটি তালিকা দেখিয়ে) হ্যাঁ কিছু লিখেছি। এর মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়েছে। বাকী প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ তাহফিমের উপর কিছু কাজ করেছেন শুনেছি?

গোলাম আযম ঃ আমপারা থেকেই তো শুরু করেছিলাম আগে। মওলানা মওদূদীর তাফসির তাহফিমুল কুরআন খুব একটা বিরাট না। কিন্তু এটুকুও পড়ার সময় অনেকের নেই। তারপর মওলানা আব্দুর রহিম সাহেব যে অনুবাদ করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অনুবাদের ভাষা কঠিন করেছেন উচ্চশিক্ষিত লোকদের টার্গেট করে। উনি বলতেন ভাষা কঠিন না হলে তাদের কাছে গুরুত্ব পাবে না। আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের কর্মীদের মধ্যে যারা অল্প লেখাপড়া জানেন তাদের পক্ষে এই ভাষা বোঝা কঠিন। তাই আমি পরীক্ষামূলকভাবে সহজ ভাষায় আমপারা অনুবাদের কাজে হাত দিই। পরে অন্যান্য পারাও অনুবাদের তাগিদ আসে। তাই একে একে ২৯ পারা ২৮ পারা ও ২৭ পারার

www.bjilibrary.com

কাজও কিছুটা করেছিলাম। সাধারণত রমযানে এতেকাফের সময় এই কাজ করতাম। জেলে গিয়ে ২৬ পারার বাকী কাজটুকু শেষ করি।

মওলানা মওদূদী (রঃ) নিজে তরজমায়ে কুরআন মজিদ নামে একটি সংকলনের মধ্যে অনুবাদ এবং ফুটনোট তৈরি করেছেন। বাংলায় তা অনুবাদও হয়েছে। কিন্তু ভাষায় কাঠিন্যের দিক দিয়ে একই রকম। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি অনুবাদ ও ফুটনোটটা সহজ ভাষায় করবো। ১০ পারার কাজ শেষ হয়েছে। এক সংগে বের না করে ১০ পারার একটি খণ্ড করা হচ্ছে। শেষের দিকের ৫ পারা তো হয়ে আছে। এখন ২১ থেকে ২৫ পারার কাজ শুরু করতে চাই। এই ১০ পারা নিয়ে এক খণ্ড হবে। মাঝখানের ১০ পারা আল্লাহ যদি সময় দেন তো পরে করা যাবে।

এছাড়া ইসলামী আন্দোলনের ৭ দফা যা সম্মেলনের আগে প্রকাশিত হয়েছে। আদম সৃষ্টির হাকীকত নামে একটি বই লিখেছি।

আমার জন্মভূমিকে গড়ে তোলার জন্য সিরিয়াসলি চিন্তাভাবনা করে একটি বই লিখেছি 'দেশ গড়ার ডাক' নামে। তার মধ্যে দেশ গড়ার জন্য কি করা দরকার, ব্রিটিশরা চলে যাবার পর দেশ গড়ার কাজ কেন হয়নি, দেশ গড়ার কাজ বলতে কি বুঝায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এতে। এরকম আরো কিছু লেখা জেলে বসে শেষ করেছি।

ঢাকা ডাইজেস্ট ঃ জেলে থাকা অবস্থায় আপনি দেশের রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, দেশের উন্নতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

গোলাম আযমঃ বৃটিশ চলে যাওয়ার পর থেকে যে রাজনীতি চলে আসছে, এটা নিছক ক্ষমতার রাজনীতি। ক্ষমতার প্রয়োজনে একটা আদর্শের শ্লোগান দিতে হয়, তাই দেয়। একদল প্রকাশ্যে জোরে সোরে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে। কিন্তু যারা ক্ষমতায় আছে তারাও সমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। ইসলামের সাথে আচরণের দিক দিয়ে উভয় পক্ষের সামান্যতম পার্থক্য নেই। একদল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিভাষাটা বলে। অন্যদল বলে না। কার্যকলাপ ও আচরণে কোন পার্থক্য নেই। এমনকি ইসলামের দোহাই দিয়ে, ইসলামী রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারাও সেক্যুলারই ছিলেন। এদের মধ্যে যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তারা সংখ্যায় কম বলে কিছু করতে পারেননি। নাজিমুদ্দীন সাহেব ইসলাম সম্পর্কে জানতেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি সিরিয়াসলি ইসলামের পক্ষে ছিলেন। তিনি ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী হওয়ার কারণে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়।

প্রচলিত রাজনীতিতে ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু ব্যক্তি বদলায়। এখানে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা পলিটিক্স করে তারা কেউই দলের বাইরে নয়। পলিটিক্যাল এলিমেন্ট দলের বাইরে হয় না। এজন্যই জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে দল বানাতে চাইলে বিভিন্ন দল থেকে লোক নিয়ে দল বানাতে হয়। এরশাদকেও তাই

www.bjilibrary.com

করতে হয়েছে। এসবই ক্ষমতার রাজনীতি, সুবিধাবাদের রাজনীতি। আমরা করি আদর্শের রাজনীতি। কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বলেছেন আপনারা কোয়ালিশন সরকারে গেলে আজ আর আপনাদের এ সমস্যায় পড়তে হতো না। আমি বলেছি, আমরাতো ক্ষমতার রাজনীতি করি না। আমরা হয়ত মন্ত্রী হতে পারতাম। কিন্তু আমরা যে আদর্শ কায়েম করতে চাই তাতো শুধু মন্ত্রিত্ব পেলেই কায়েম হবে না। বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকারী দলের নীতি হচ্ছে কোন রকমে ক্ষমতায় টিকে থাকা। দূরদর্শীতার কোন পরিচয় তাদের মধ্যে নেই। তারা যা করছে তা যে জনপ্রিয়তা হারাবার কারণ হবে এটা তারা চিন্তা করে না। আমি লক্ষ্য করছি, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া। সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যেসব আলামত ইংগিত পাওয়া গেছে, তা নিয়ে ময়দানে নেমেছে। বর্ষাকালে তো রাজনীতিও ভিজে যায়। তাই এখন থেকে কিছু কিছু কর্মসূচী নিয়ে শুকনা মওসুমে আন্দোলন তুংগে তুলবে। আমার ধারণা তারা এখনই মধ্যবর্তী নির্বাচন চায় না। ময়দানটা আরো খানিকটা তাদের পক্ষে আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। ক্ষমতাসীনদের যেভাবেই হোক কনডেম করার, অচল করার এই যে রাজনীতি এতে গণতন্ত্র আসবে না। সুতরাং যারা ক্ষমতায় আছে তারাও যেমন সত্যিকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তেমনি বিরোধী দলের অভ্যন্তরেও গণতন্ত্র নেই। তাদের দলের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই।

ঢাকা ডাইজেস্ট ঃ দেশে রাজনৈতিক দলগুলির বিরাট মতপার্থক্য ও অনৈক্য রয়েছে। পারস্পরিক বিদ্বেষ রয়েছে। আপনার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধেও অনেকেই বিদ্বেষ পোষণ করে। এসবের মোকাবিলায় আপনি কি ভূমিকা রাখবেন?

গোলাম আযমঃ আমি খুব ধীর স্থিরভাবে সিরিয়াসলি চিন্তা করে দেখেছি। আল্লাহ যখনই আমাকে মুখ খুলে জনগণের কাছে কথা বলার সুযোগ দেবেন, তখনই আমি এমন কিছু কথা বলবো, যা রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি। আমি রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করি। একঃ প্রকাশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বাংগালী জাতীয়তাবাদী শক্তি। দুইঃ পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি। তিনঃ ইসলামী শক্তিই একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকার করে। না করলে ইসলামী শক্তিকে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো না। আর এটাও তারা নিশ্চয়ই অনুভব করে যে, ইসলামী শক্তির পাতাকাবাহীর দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামী পালন করছে। তারা তাদের আচরণের দ্বারাই তা প্রমাণ করছে। ইসলামী সংগঠন আরো আছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরকার বা বিরোধীদল কেউই উঠে পরে লাগেনি।

জামায়াতে ইসলামী কোন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে, পতাকাবহন করছে তা তারা তাদের আচরণের দ্বারা সার্টিফাই করার পর, আমি তাদের কাছে এই আবেদন জানাবো যে, দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য যা কিছু হওয়া দরকার অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে যদি আমরা মত বিনিময় করি- আমি মনে

www.bjilibrary.com

করি যে, আদর্শিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও সমস্যা যেহেতু বাস্তব এবং এর সমাধানও বাস্তব চিন্তার মাধ্যমেই করতে হবে, তাই সকলের চিন্তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকার কথা নয়। আমরা দেশ ও জনগণকে বাঁচাবার জন্য মত বিনিময় করি তাহলে আমাদের মধ্যে চিন্তায় ঐক্য আসবে। যেটুকু ঐক্য আসবে তা নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। আর আমরা যদি একে অপরকে নির্মূল করতে চাই, তবে নিজেরা নির্মূল হবো, দেশকে নির্মূল করবো। এ জন্য আমি আমার সাথীদের বলেছি, আপনারা যে যে পর্যায়ে আছেন অন্য দলের নেতাদের সাথে আলোচনা করুন তারা প্রত্যাখান করলে আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ অর্থাৎ আপনি একটা সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার কথা বলছেন। প্রক্রিয়াটি কি হবে?

গোলাম আযমঃ পক্রিয়া তো এটাই। নেতারা একসাথে বসা, দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, সমাধান বের করা। যেই ক্ষমতায় যান সমস্যা একলা সমাধান করতে পারবেন না, সহযোগিতা লাগবেই এবং আমি এটা বিশ্বাস করি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাদেরকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ দেয়া দরকার, যাতে জনগণও মূল্যায়ন করতে পারে যে তাদেরকে আবার ক্ষমতায় যেতে দেয়া যায় কিনা। কিন্তু মাঝখানে যদি ক্ষমতা থেকে নামানো হয়, তবে তারা এটা বলার সুযোগ পাবে যে, আমাদের কাজ করার সময় দেয়া হলো না। নির্বাচনের মাধ্যম ছাড়া আর কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে পরিবর্তনের আমি পক্ষপাতি নই।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ জামায়াতে ইসলামীতে এখন নানা স্রোতের মানুষ আসছে। বিভিন্ন স্রোতের মানুষকে সমন্বিত করে জামায়াতের আদর্শে সংঘবদ্ধ করার কাজ কিভাবে করবেন? এটা কি সম্ভব?

গোলাম আযমঃ নিশ্চয়ই সম্ভব। এ জন্যই যে মানুষও বিকল্প তালাশ করে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে বলেই তো তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। বি এন পি সম্পর্কেও নৈরাশ্য সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এর পর কি- তা তালাশ করছে মানুষ। জামায়াত সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াত বিকল্প শক্তি হতে পারে কি না জনগণ ভাবছে। যারা জামায়াতে ইসলামীকে বিকল্প শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে এতে যোগ দেবে তাদের আমরা বোঝাবার চেষ্টা করবো যে নবী করিম (সঃ)-এর আদর্শ ও পদ্ধতি আমরা হুবুহু অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। যদি তারা আমাদের কোন ভুল–ত্রুটি নির্দেশ করেন তবে আমরা নিজেদের সংশোধন করে নেব।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ধারণা যে, জামায়াত মূলতঃ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সংগঠন। আরো একটু ব্যাপকভাবে বললে, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ লোকদের একটি দল।.....

গোলাম আযমঃ এই ধারণা এখন অনেক কমে গেছে। একটা বিপ্লবী আন্দোলনের গতি সঞ্চারের জন্য তিনটি উপাদান দরকার।

www.bjilibrary.com

এক ঃ বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব। দুই ঃ সংগ্রামী কর্মী বাহিনী। তিন ঃ এ আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত করা, তাদের মধ্যে আলোচনা চর্চা হওয়া। জামায়াত এই তিনটি উপাদান অর্জন করার চেষ্টা করছে। গত দেড় বছরের ঘটনাবলী থেকেও এটা উপলব্ধি করা যায়।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ জামায়াত সম্পর্কে শুরু থেকে 'স্বাধীনতার বিরোধী' বলে বিরূপ প্রচারণা চলছে। এ নিয়ে এখনো বিতর্ক জিইয়ে রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনাকে একটা প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসও রয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে জামায়তকে একটা গণসংগঠন হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কি চিন্তা করছেন?

গোলাম আযম ঃ একাত্তরের ভূমিকা সম্পর্কে ১৯৮৮ সালের ৩০ শে মে আমি যে সাংবাদিক সম্মেলন করলাম, সেখানে আমার লেখা 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ' বইটি বিলি করেছিলাম। আমি খুব আশা করেছিলাম যে, যারা আমার বিরোধী, যারা আমার একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন, তারা এটার জবাব দেবেন। কিন্তু এর জবাব আমি পাইনি। এর দ্বারা আমি অনুভব করছি যে, যারা বইটি পড়বেন তারা কনভিন্স হবেন। এর পরও অনেক কথা বলা হয়েছে। কামরুজ্জামান সাহেব আমার যে জীবনী লিখেছেন, সেখানেও এ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। তারপরও যারা একাত্তরের হত্যার জন্য আমাকে দায়ী করেন, আমি তাদেরকে প্রশ্ন করবো, ভাই আপনারা কি এ কথা মনে করেন যে, একাত্তরের যুদ্ধটা ছিল একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতীয় সরকার ও বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী এবং অন্যদিকে গোলাম আযমের মধ্যে? একাত্তরের জন্য আসল দায়ী যারা তাদের আপনারা চিনেন না এমন তো হতে পারে না। আপনারা যখন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা করেন, সেই তালিকায় আমার নাম আসলো না কেন? অথচ আজ আমাকে একমাত্র অপরাধী বলছেন। রাজনৈতিকভাবে আমাদের মোকাবিলা করার সাধ্য আপনাদের নেই বলে এসব কথা বলছেন এ কথা বললে কি অন্যায় হবে? জনগণ কোন সমস্যা নয়। ১৬ই জুলাই দু'টি জনসভার ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে সংবাদপত্রে। উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায়, তারা ক্রমশঃ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ঢাকা ডাইজেস্ট ঃ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কনসেনশাসের সম্ভাবনা কতটুকু?

গোলাম আযম ঃ গণতান্ত্রিক দেশে সবাই একমত হবে সব ব্যাপারে—এটা হয় না। এ জন্যই নির্বাচন যেটা ফয়সালা করে সেটা সবাই মেনে নেয়। তবু যদি কোন একটা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও মতপার্থক্য দূর করার জন্য তবে কিছু সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে। যতটুকু ঐকমত্য হয় সেটুকু দেশের জন্য কল্যাণকর।

ঢাকা ডাইজেস্ট ঃ দেশে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের কোন সম্ভাবনা দেখছেন কি?

গোলাম আযম ঃ আমার লেখা বই ইসলামী ঐক্য- ইসলামী আন্দোলনে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলিগ জামায়াত, ফোরকানিয়া

www.bjilibrary.com

মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা ইত্যাদি ইসলামের যত রকম খেদমত আছে তার উল্লেখ করে এই বই-এ বলেছি এই খেদমতগুলো সবই একই দ্বীনের খেদমত। অথচ যে যেটা করছেন সেটাকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন, বাকীটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এটা ঠিক নয়। সব খেদমতকেই স্বীকৃতি দেয়া দরকার। এরপর বলেছি খেদমতে দ্বীন ও একামতে দ্বীন এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর পরের বইটা লিখেছি একামতে দ্বীন। আমরা ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা করেছি। নতুন করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের ঐক্যের চিন্তা আমাদের আছে। যদি তারা না আসেন তবে জনগণের মধ্যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ দেশে প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্র কতটা সফল হয়েছে। পুরোপুরি সফল না হলে, তার পিছনে কারণ কি?

গোলাম আযমঃ আমি মনে করি সংসদীয় গণতন্ত্র হাতে খড়ির' পর্যায়ে রয়েছে। এর আগে এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল না। এখন সংসদীয় গণতন্ত্র শুরু হয়েছে। শিশুরা যেমন আছাড় খেয়ে খেয়ে হাটা শিখে, আমরা তেমনি শিখছি। যদি কোন শিশু আছাড় খাওয়ার ভয়ে হাটতে চেষ্টা না করে, তবে সে হাটা শিখবে না। দেখা যাক, কে আছাড় খেতে রাজী আর কে রাজী নয়। আছাড় তো খেতেই হবে। দলীয়ভাবে মন-মগজে গণতন্ত্র না আসা পর্যন্ত গণতন্ত্র আসবে না।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ জামায়াত কি আগামী সংসদ নির্বাচনে সকল আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেবে?

গোলাম আযমঃ এ কথা বলার সময় এখনো আসেনি।আমরা যদি অনুভব করি, জনগণ যদি সাড়া দেয় তবে অবস্থা অনুযায়ী জামায়াত সিদ্ধান্ত নেবে। গত নির্বাচনে একটা দল আমাদের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করবেন বলে বহু আগে থেকেই বলে আসছিলেন। কিন্তু তারা এমন অবাস্তব প্রস্তাব দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হলো না।

ঢাকা ডাইজেস্টঃ উপমহাদেশের রাজনৈতিক গতিধারাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

গোলাম আযমঃ রাজনীতিতে একটি পরিবারের প্রাধান্য দূর হওয়ার পর ভারতে গণতন্ত্রের বিকাশ হবে বলেই মনে হয়। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক নয়। ভারত এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আমাদের আশেপাশের কিছু দেশে দেখা যাচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্ধারিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এটা সুবিধাজনক নয়। কারণ রাজনৈতিক যোগ্যতার চেয়ে আবেগকে সেক্ষেত্রে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় দলীয় সিদ্ধান্ত এবং দলীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করে একজন। এ নিয়ে দলে মতপার্থক্য হয়। কারণ একজনের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গণতন্ত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের যে চর্চা

www.bjilibrary.com

উপমহাদেশে হচ্ছে তাতে মতপার্থক্যও প্রবল হচ্ছে। কারণ এর ফলে জনগণ, এমনকি দলীয় কর্মীরাও জানতে পারে না দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত কোন দিকে ছিল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট অবসানে বর্তমান ব্যবস্থা কল্যাণকর হবে বলেই আমি মনে করি। সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ হবে বলেই আশা করা যায়। সামরিক বাহিনী সরকার কায়েমের সিদ্ধান্ত না নিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে আশা করা যায়। যদি তা হয় তবে তা সে দেশের ভবিষ্যতের জন্যই ভালো হবে।

[নতুন ঢাকা ডাইজেস্টের ১৯৯৩ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা কমিশনের সুফারিশ

[১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ শাসনকালে চীফ মিনিস্টার ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের সমালোচনায় এই প্রবন্ধটি প্রথমে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ও পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।]

প্রথম কথা ঃ

বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সুফারিশ প্রকাশিত হইবার পর হইতে প্রদেশের সর্বত্র সভা-সমিতি, বিবৃতি ও অন্যান্য উপায়ে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে। আলেম সমাজ কমিশনের রিপোর্টকে ইসলাম বিরোধী বলিয়া রায় দিয়াছেন। অপরদিকে সরকার সমর্থক পত্রিকায় এই প্রতিবাদকে প্রগতির নামে মোল্লাদের বাজে চিৎকার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি কোন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ নই, সে অহংকারও আমার নাই। কিন্তু একটি ডিগ্রী কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার ফলে শিক্ষার প্রতি স্বভাবতই আন্তরিক আগ্রহ পোষণ করি। প্রদেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণ কমিশনের রিপোর্ট ও সুফারিশকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিয়া বিজ্ঞানসম্মত কোন আলোচনা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। তাই শিক্ষা কমিশনের সুফারিশসমূহকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়া সুধী সমাজের সম্মুখে পেশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াই এই আলোচনায় হাত দিয়াছি।

আলোচনার ধারা

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাদের এই আলোচনা নিম্নলিখিত ধারা অনুযায়ী লিখিত হইবে ঃ

(১) প্রথমে এই কমিশনের গঠন প্রকৃতি (Compositoin) সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পেশ করিব। কেননা কমিশনের সদস্যদের নির্বাচনের উপর সুফারিশের ধরন অনেকখানি নির্ভর করে।

(২) ইহার পর কমিশনের চেয়ারম্যানের উদ্বোধনী বক্তৃতা ও রিপোর্টের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইবে যে, পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন আদর্শে পুনর্গঠন করা হইবে, সেই বিষয়েই কমিশনের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

(৩) বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের কি ধারণা ও ইহার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কি কি সুফারিশ করা হইয়াছে এবং তাহা কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

www.bjilibrary.com

(৪) আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুফারিশ, পাকিস্তানে কোন ধরনের নাগরিক গড়িয়া তুলিবে।

(৫) কমিশনের সুফারিশ হইতে ইসলাম সম্বন্ধে কিরূপ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়-অন্য কথায় কমিশনের সুফারিশকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের স্থান কোথায়।

(৬) কমিশনের সুফারিশে কি কি ইসলাম বিরোধী বিষয় রহিয়াছে।

(৭) শিক্ষা পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ।

কমিশনের গঠন প্রকৃতি ঃ

শিক্ষা সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পূর্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান স্বয়ং পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন নেতা। শিক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়িয়া তোলা তাহার আদর্শের পরিপন্থী। সম্ভবতঃ এই জন্যই কমিশনে শুধু এমন সব দেশবিখ্যাত শিক্ষাবিদকেই গ্রহণ করা হইয়াছে যাহারা ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগই পান নাই। কমিশনের সুযোগ্য সদস্যগণের সকলেই পাশ্চাত্য জীবন দর্শনে উচ্চ শিক্ষিত। ইসলামকে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে সরাসরি অধ্যয়ন করিবার কোন যোগ্যতা সৃষ্টির সুযোগ তাহাদের ঘটে নাই। তাহারা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিয়া আমাদের দেশে তাহা প্রবর্তন করিবার আন্তরিক প্রেরণাও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিতে হইলে কোন ধরনের মন মস্তিষ্ক ও চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে তাহাদের কোন পরিষ্কার জ্ঞান আছে কিনা এবং পাকিস্তানকে তাহারা একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তুলিতে আগ্রহ রাখেন কিনা তাহা আমাদের জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

এমন একটি কমিশনের নিকট হইতে যে প্রকার সুফারিশ আশা করা যায় আলোচ্য রিপোর্টে তাহাই পরিবেশন করা হইয়াছে। তাহারা এই সুফারিশ সর্বসম্মতিক্রমে পেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া আত্মতৃপ্তিও ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কমিশন-চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার সহিত কমিশনের সদস্যগণের আদর্শিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কমিশনের গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা সমগ্র সুফারিশকেই বর্জন করা বুঝায় না। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিক্ষা সম্বন্ধীয় গবেষণাবলী হইতে কমিশন যে সমস্ত মঙ্গলকর ব্যবস্থা সুফারিশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য; কিন্তু যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণই হইল উহার আদর্শের দিক এই জন্য আদর্শিক দৃষ্টিকোণ হইতেই আমরা এই রিপোর্টকে বিবেচনা করিব। আদর্শের দিক দিয়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য না হইলে উহার বাহ্যিক কাঠামোর কোন সৌন্দর্যই আকর্ষণীয় হইতে পারে না।

www.bjilibrary.com

চেয়ারম্যানের উদ্বোধনী বক্তৃতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্র গঠন করা। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মনমস্তিষ্ক ও চরিত্রকে গঠন করিবার চেষ্টা প্রতেকটি সজাগ জাতির কার্যসূচীর প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়া অনেক সামঞ্জস্য থাকিলেও মূলতঃ তাহাদের সকলেরই একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে প্রকার মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হইতেছে রাশিয়ায় হুবহু তাহার অনুকরণ হইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ হইল তাহাদের আদর্শের পার্থক্য। ভাল-মন্দের পাথর্ক্য জ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ব্যক্তি চরিত্রের মান-নির্ণয়, জগত ও জীবন সম্বন্ধে কতক ধারণা ইত্যাদির সমন্বয়েই একটি আদর্শ গড়িয়া উঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য সেই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই উক্ত জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলা হয়।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে হইলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাকিস্তানে কোন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের যদি নিজস্ব কোন মত-বিশ্বাস, জীবন-দর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলিতে কিছু থাকে, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন তাহারা আমাদের তাহজীব-তমদ্দুনকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। আর যদি আমাদের নিজস্ব কোন আদর্শ না-ই থাকে তাহা হইলে অন্য কোন জাতির অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত কোন উপায়ই নাই।

আমরা আলোচ্য শিক্ষা-কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর গবেষণা চালাইয়া কোন সুস্পষ্ট আদর্শের সন্ধান পাই নাই। কমিশনের রিপোর্টের মূল ভূমিকায়ও ইহার পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য চেয়ারম্যানের বক্তৃতার নিম্ন উদ্ধৃতিসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তিনি পাকিস্তানের জীবনাদর্শের কোন সঠিক ঘোষণা করেন নাই।

বক্তৃতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেনঃ

It is, therefore, imperative that we change our attitude and course of action and endeavour to develop a system of education which will enable our younger generation to realise the true national ideal.

(অনুবাদঃ সুতরাং আমাদের মনোভাব ও কর্ম-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করা কর্তব্য, যেন আমাদের বংশধরগণ জাতির প্রকৃত আদর্শকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়)।

www.bjilibrary.com

কিন্তু তিনি সমগ্র বক্তৃতার কোথাও জাতির প্রকৃত আদর্শের নাম উল্লেখ করেন নাই। বক্তৃতার ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেনঃ

We must so re-orientate our educational policy that we have a definite purposefulness in our objective.

(অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে হইবে)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ চেয়ারম্যান সাহেব সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটিও নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই।

কমিশনের রিপোর্টের মূল ভূমিকায় বলা হইয়াছেঃ

The system should at the same time have its roots deep into the cultural heritage of the nation and permitted with such ideological values that the nation has cherished through long centuries.

(অনুবাদঃ এতদসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির কৃষ্টিগত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এবং জাতির বহু শতাব্দীর আকাঙ্ক্ষিত মান অনুযায়ী গড়িয়া উঠা উচিত)।

আমাদের জাতির কৃষ্টিগত ঐতিহ্য কোন ধরনের, উহার কোন মান আছে কিনা, জাতির আদর্শগত মান বলিতে কোন আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে, তাহা রিপোর্টের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছি যে, সুবিজ্ঞ কমিশন জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন, অথচ রিপোর্টের কোথাও সেই আদর্শের উল্লেখ করেন নাই। যদি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ ইহা ধরিয়া লইয়া থাকেন যে, জাতির আদর্শ সকলেরই জানা আছে বলিয়া তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু পাকিস্তানকে কোন আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কোন মতভেদ না থাকিলেও ইহা সর্বজনবিদিত যে, ইংরেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গঠিত ব্যক্তিদের একটি শ্রেণী মুসলিম "জাতির বহু শতাব্দীর আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের" ঘোর বিরোধী। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সময়ও এই শ্রেণীটির পরিচয় জাতির নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় (Preamble) উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'পাকিস্তানের জনসাধারণ আল্লার সার্বভৌমত্বের সীমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই তাহাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করিবে এবং কায়েদে আযম পাকিস্তানকে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।'

শাসনতন্ত্রের ৩ নং মূলনীতি নির্ধারক ধারায় (২৫ ধারা) স্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'মুসলমানগণ যাহাতে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করিতে পারে সেই জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করিবে।'

www.bjilibrary.com

সুতরাং শাসনতন্ত্রে ইসলামই জাতীয় আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আল্লাহর দেয়া সীমার অধীনে পরিচালনা করিয়া ইসলামের গণতান্ত্রিক ধারণাকে রূপ দিবার নির্দেশও রহিয়াছে। আর এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যেই শাসনতন্ত্র মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার মূলনীতিও ঘোষণা করিয়াছে।

শাসনতন্ত্রের এই সুস্পষ্ট ঘোষণার সহিত কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তৃতা ও রিপোর্টের মূল ভূমিকার কোনই মিল নাই। তদুপরি কমিশনের চেয়ারম্যান একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসেবে সকলেরই নিকট পরিচিত। তাহার ও তাহার দলের আদর্শ কি, তাহা আমাদের পরিষ্কার জানা নাই। তবে একথা কাহারো অবিদিত নহে যে, তিনি এবং তাহার দল ইসলামকে পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করেন না। তাঁহার দল রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সহিতও ইসলামের সম্পর্ক স্বীকার করে না। কমিশনের সহিত আমাদের এই খানেই মৌলিক পার্থক্য। যাঁহারা পাকিস্তানকে ইসলামের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্টকে তাহাদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে করিতে বাধ্য।

৩। প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের রায় ঃ

কমিশনের চেয়ারম্যান তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"It will be no exaggeration to say that Madrasa education is a total waste".

(অর্থাৎ "মাদ্রাসা শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অপচয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।" শিক্ষা কমিশনও এই মতই পোষণ করেন।)

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা যে উন্নত ধরনের নয় এবং যে উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে তাহা যে সত্যই পূর্ণ হইতেছে না, তাহা আলেমগণও উপলব্ধি করিতে সক্ষম। মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা মাদ্রাসা পরিচালকগণও অন্তরের সহিত অনুভব করেন। কিন্তু যে ভাবে এই শিক্ষাকে 'সম্পূর্ণ অপচয়' বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দরদের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। ইহাতে শুধু মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রতি কমিশনের ঘৃণাই ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে তাহারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিষয়টির বিচার না করিয়া চরম অবিচারই করিয়াছেন।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইংরেজ এই দেশকে মুসলমানদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার পর স্বভাবতঃই তাহাদের আদর্শ এই দেশে কায়েম করিতে যত্নবান হয়। ইংরেজদের আদর্শ অনুযায়ী এই দেশে কতক লোকের মন, মগজ ও চরিত্র গঠন না করিলে তাহাদের রাজত্ব যে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না সুচতুর ইংরেজ তাহা উপলব্ধি করিয়াই এই দেশে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা কায়েম করে।

www.bjilibrary.com

পরাজিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ পূর্ব হইতেই যে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা পতনোন্মুখ জাতির জীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু শিক্ষা- ব্যবস্থা জীর্ণ হইলেও ইসলামই ঐ শিক্ষার আদর্শগত ভিত্তি ছিল। মুসলিম চিন্তানায়কগণ স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতির আদর্শ ধ্বংস হইবে। তাই ঐ শিক্ষাকে বর্জন করিবার জন্য তাহারা জাতিকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যে আদর্শে তাহারা জাতিকে গঠন করিতে চাহিলেন, তাহার ভিত্তিতে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও তখন সম্ভবপর ছিল না। ফলে মুসলিমগণ তাহাদের পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চালু রাখিয়া জাতীয় আদর্শকে বাঁচাইবার একমাত্র পথই গ্রহণ করিলেন।

ইংরেজ শাসকগণ ইসলামী শিক্ষাকে বন্ধ না করিলেও দুইটি বিশেষ কারণে এই শিক্ষা পঙ্গু হইয়া রহিল। প্রথমতঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার জন্য ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য করিয়া দেওয়া হইল এবং ইংরেজের অফিসে পুরাতন শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ব্যতীত, শাসকদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই ইসলামী শিক্ষা চালু রহিল।

এই অবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা যদি উন্নতি ও প্রগতিশীল হইতে না পারে, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কি আছে? সরকারী সাহায্যের শতকরা নিরানব্বই ভাগই যে ইংরেজী শিক্ষায় ব্যয়িত হইতেছে এবং সরকারের যাবতীয় যত্ন ও মনোযোগ যে শিক্ষার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই আধুনিক শিক্ষাও কমিশনের মতে একেবারেই অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্রের নিকট হইতে মোটা অংকের বেতন আদায় করা হয়, সেখানেও সরকারী শিক্ষা খাতের বিরাট অংক ব্যয় না করিলে শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। অথচ সরকারের উপেক্ষিত মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থা দেখিয়া কমিশন নাক সিটকাইতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। কি আশ্চর্য বিচার!

কমিশনের চেয়ারম্যানের মনে রাখা উচিত যেঃ

(ক) ইসলামের প্রতি দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের গভীর আকর্ষণের দরুন তাহাদের সামান্য দানে অত্যন্ত দারিদ্র্যের সহিত বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আপন অস্তিত্বের কংকালটুকু বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

(খ) শুধু দরিদ্র ছাত্ররাই এই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে বলিয়া মাদ্রসার শিক্ষকগণ সামান্য জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই শিক্ষাকে জীবনের সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) সমাজে মাদ্রাসা-শিক্ষিত লোকদের অর্থনীতিক কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা না থাকার দরুনই তাহাদের পক্ষে ইসলাম সম্বন্ধে গবেষণা করা ও উন্নত চিন্তাধারা গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই।

(ঘ) সরকারের ইচ্ছা, সাহায্য ও সহানুভূতির বিরুদ্ধে একটি বিরাট শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু প্রাইভেট চাঁদা দ্বারা সমগ্র দেশে দুইশত বৎসর পর্যন্ত চালু রাখা একটা অলৌকিক ঘটনার মতোই মনে হয়। ইংরেজী শিক্ষা না পাওয়ার দরুন অশিক্ষিত মুসলমানদের

www.bjilibrary.com

ভিতর ইসলামের প্রতি যে ঈমানটুকু এখনও বাঁচিয়া আছে তাহা শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে।

(চ) ইংরেজী শিক্ষা যেভাবে মুসলমানদের ঘরে হাজার হাজার বে-ঈমান সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইংরেজের আদর্শকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এই দেশ হইতে ইসলামকে নির্বাসিত করিবার চেষ্টায় মাতিয়াছে তাহাতে মাদ্রাসা- শিক্ষার ক্ষীণ আলোটুকু না থাকিলে এই দেশে ইসলামের নামটুকুও আজ বাকী থাকিত না। কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারাই,ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

(ছ) মাদ্রাসা শিক্ষা যদি কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলিকেও শুধু বাঁচাইয়া রাখিয়া থাকে তাহা হইলেও যথেষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই মাদ্রাসা শিক্ষা না থাকিলে আজ কুরআন বুঝিবার চেষ্টা দূরে থাকুক, কুরআন শুধু পড়িবার উপায়ও হইত না।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যাহারা নির্বিচারে ইহাকে "সম্পূর্ণ অপচয়" বলিয়া ঘোষণা করেন তাহাদিগকে আমরা কিছুতেই সুবিবেচক মনে করিতে পারি না। আশ্চর্যের বিষয় যে, কমিশন বর্তমান ইংরেজী শিক্ষাকে অপচয় মনে করেন না। এই দেশের জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা, নীতি ও চরিত্রহীন রাজনীতি, যৌন উচ্ছৃংখলতা ইত্যাদি ইংরেজী শিক্ষিতদের অবদান নয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কমিশন নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "ইহা ইংরেজী শিক্ষার দোষ নয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও সংগঠনের অভাবেই এইরূপ পরিণাম দেখা দিয়াছে।" এই ধরনের অভাবে যে মাদ্রাসা শিক্ষাও স্বার্থক হইতে পারে নাই, তাহা কমিশনের উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

আমাদের মতে, মাদ্রাসা শিক্ষা অপচয় নয় মোটেই—ইহা অনুন্নত ও জীর্ণ মাত্র। অর্থাৎ ইহা বর্তমান যুগের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। ইহাকে নতুন করিয়া গড়িতে হইবে—যাহাতে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করিবার উপযোগী মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে অপচয়। শুধু অপচয়ই নয়, মারাত্মকও বটে।

সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন যে সকল সুফারিশ পেশ করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের দাবি পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করা কমিশনের উদ্দেশ্য নয়—তবে একেবারে অপচয় বলিয়াও ইহাকে হঠাৎ বন্ধ করা সম্ভবপর নয়। তাই উহাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ বন্ধ করাই কমিশনের প্রকৃত লক্ষ্য। প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার যে মৌলিক উদ্দেশ্য, তাহা আরও উন্নত পদ্ধতিতে সংগঠিত করিবার জন্য কমিশন যদি সুফারিশ করিতেন তাহা হইলে মাদ্রাসা শিক্ষার পরিচালকগণ তাহা আনন্দিত চিত্তেই গ্রহণ করিতে রাজী হইতেন। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা বর্তমানে যেটুকু খেদমত হইতেছে, তাহাও বন্ধ করিয়া দিবার এই প্রচেষ্টা কোন ইসলামপন্থী লোকই বরদাশত করিতে রাজী নয়।

www.bjilibrary.com

নিউস্কিম শিক্ষায় (Reformed Madarasa scheme) যদিও আরবী ও কুরআন হাদীসের শিক্ষার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী—তবুও ইংরেজী, বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ের সহিত বিচিত্র সংযোগের ফলে তাহা দ্বারাও প্রকৃত উপকার হয় নাই। শিক্ষা কমিশন নিউস্কিমকে উঠাইয়া দিবার সুফারিশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরাতন মাদ্রাসা শিক্ষার সহিত তাহারা যেভাবে ইংরেজী, বাংলা ও অংক জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও আবার নিউস্কিমই জন্মলাভ করিবে। সম্ভবতঃ তখনই মাদ্রাসা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে মনে করিয়া কমিশন এই সুফারিশ করিয়াছেন।

৪। আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুফারিশ ঃ

সহযোগিতায় সমগ্র দেশে একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে চালু করিবার সুফারিশ করিয়াছেন তাহাতে ইংল্যান্ড বা আমেরিকার আদর্শে এই দেশকে গঠন করা হয়ত সম্ভব হইবে; কিন্তু পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়িয়া তুলিবার কোন পরিকল্পনার আভাষও সেখানে নাই। কমিশনের নিকট আমাদের ইহাই প্রধান জিজ্ঞাসা যে, তাহারা যখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তোলার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করিতে না-ই পারিলেন, তখন শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় হিসাবে নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেই কি শোভন হইত না?

অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, কমিশনের সুফারিশ যে ধরনের লোক তৈয়ার করিবে, তাহারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীই হইবে। ইহা দ্বারা ইসলামকে ব্যক্তিগত জীবনের গন্ডির ভিতরে আবদ্ধ অন্যান্য ধর্মের ন্যায় অনুষ্ঠান- সর্বস্ব একটি ধর্মে পরিণত করিবারই ব্যবস্থা হইবে। ইহার ফলে মুসলমানদের বহু কুরবানী লব্ধ এই দেশে ইংরেজের সাধনাই সার্থক হইবে।

৫। ইসলাম সম্বন্ধে কমিশনের ধারণা ঃ

কমিশনের সুফারিশ এবং উহার দীর্ঘ পরিশিষ্ট পুংখানুপুংখরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার পর ইসলাম সম্বন্ধে কমিশনের যে ধারণা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুনই হউক বা পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসী বলিয়াই হউক, কমিশন ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন-বিধান (A complete & balanced Code of Life) হিসেবে স্বীকার করেন নাই।

কমিশন অন্যান্য অনৈসলামিক তথাকথিত প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহের আদর্শকে সামনে রাখিয়া যে শিক্ষা ব্যবস্থার সুফারিশ করিয়াছেন, তাহার সহিত Religious instruction-এর নামে যে দ্বীনিয়াতের সংযোগ করিয়াছেন, তাহাও ঐ সকল দেশেরই অনুকরণ মাত্র। ঐ সকল দেশে দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল অংক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে যে প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, জগত ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মলাভ করে, বিশ্বাস ও জ্ঞান যে পথে ধাবিত হয়, আমাদের

www.bjilibrary.com

দেশেও তাহাই হইবে। ঐ সকল দেশে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সংযোগে যেরূপ ফল দেখা দেয়, এখানেও তাহাই হইবে।

বিশাল শিক্ষা-বৃক্ষকে যদি ইসলামের জীবন দর্শন হইতে নিরপেক্ষ হিসাবে গড়িয়া তোলা হয়, তাহা হইলে সেই শিক্ষাবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত দ্বীনীয়াতের আলাদা কলম বাধিয়া দিলে যে কি পরিণাম হয়, তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হইয়াছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালেও এই পরিকল্পনা লইয়াই শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের ভিত্তিতে যাবতীয় শিক্ষা দিবার সঙ্গে দ্বীনিয়াতের অস্বাভাবিক সংযোগ সেখানেও ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এক প্রকারের জীবের শরীরে অন্য জীবের অংশবিশেষ বাঁধিয়া দিলে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা বেশী ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষায় পার্থিব সকল শাস্ত্র এমনভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখানো হইতেছে যে, এই বিশাল বিশ্বে কোন স্রষ্টা নাই; ইহা নিজে নিজেই চলিতেছে এবং সাফল্যের সহিত নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবেই চলিতেছে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনীতিক বিধান শিক্ষা দেওয়ার ভিতর দিয়া ছাত্রদের মগজে এই ধারণাই জন্মাইতেছে যে, খোদা, রসূল, অহী কুরআন ইত্যাদি ব্যতীতই জগত উন্নতি করিতেছে। সমগ্র শিক্ষার মাধ্যমে গোটা জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধেই তাহারা সৃষ্ট—নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদেরকে যখন হঠাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন আল্লাহ রসূল আখেরাত, অহী ইত্যাদির কথা প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অবাক করে। অতঃপর এই সকল বিষয় তাহাদের বিদ্রূপের পাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মকে হেয় মনে করা, ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ধরনের ব্যবস্থায় বড়জোর ধর্মকে শুধু মতবিশ্বাস হিসেবে কিছু লোকের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে মাত্র। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা জীবনকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত করিবার যোগ্যতা কিছুতেই সৃষ্টি করিবে না। নিউস্কিমের বর্তমান রূপ ইহারই এক বিশেষ সংস্করণ মাত্র।

কমিশনের সুফারিশ হইতে ইসলাম সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা যে রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে আমাদের শিক্ষায়ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পাইবে। এই কমিশন দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে আর যাহাই হউক—কুরআন ও সুন্নাহ তাহা সমর্থন করে না। কারণ ইসলাম এমন কোন ধর্মের নাম নয় যে, মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজ করিবার অনুমতি দিবে, আর সেই সঙ্গে কতক কর্মহীন বিশ্বাস ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের পরিশিষ্ট জুড়িয়া দিলেই রাজী হইবে। কাহারো গড বা ভগবান হয়তো বা ইহাতে রাজী হইতে পারে যে, গির্জা ও মন্দিরে তাহাকে ডাকিলেই সে সন্তুষ্ট হইবে এবং জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কর্মে তাহাকে ত্যাগ করিলে কোন আপত্তি

www.bjilibrary.com

করিবে না। কিন্তু কুরআনের আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কাহারো সহিত আপোস করিতে রাজী নহেন। এই কারণেই তিনি মুমিনদের "সম্পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও" বলিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন।

আমরা ইহাকে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক মনে করি যে, আল্লাহ আছেন বলিয়া মানিব, অথচ তিনি পার্থিব জীবনে আমাদের পথ প্রদর্শক হইবেন না। যে আল্লাহ দুনিয়ায় চলার পথে আমাকে সঠিক হেদায়াত দেন না, তাহাকে শুধু মসজিদে মানিয়াই- বা লাভ কি?

সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে কমিশনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ পার্থিব শিক্ষার সহিত দ্বীনিয়াতের শিক্ষাকে জুড়িয়া দিয়া ইসলামকে একটি অনুষ্ঠান- সর্বস্ব নির্জীব ধর্মে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন।

কমিশনের সুফারিশে কি কি ইসলাম
বিরোধী বিষয় রহিয়াছে ঃ

উপরোক্ত আলোচনায় শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্টকে আমরা ইসলামী জীবনাদর্শের উপযোগী নয় বলিয়া যুক্তিসহকারে আলোচনা করিয়াছি। সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সমগ্র সুফারিশটিকেই ইসলাম বিরোধী বলা চলে। এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় তাহা নহে।

কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার যে কাঠামো তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাতে যেমন উন্নত শিক্ষা প্রণালী প্রণয়নের অনেক প্রস্তাব রহিয়াছে, তেমনি প্রকাশ্যভাবে ইসলাম বিরোধী কিছু প্রস্তাবও আছে। এখানে আমি সেই ইসলাম বিরোধী সুফারিশসমূহের আলোচনা করিতে চাই।

(ক) প্রথমতঃ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে (Scondary Education) কমিশন যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার জোর সুফারিশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সাধারণভাবে যুবতীদের জন্য পৃথক শিক্ষাগার থাকিবে না। অবশ্য যেখানে ইহার জন্য দাবী হইবে, সেখানে ইহার অনুমতি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষার বন্দোবস্তই থাকিবে। আর উচ্চ শিক্ষায় পৃথক ব্যবস্থা থাকার তো কোন প্রয়োজনই নাই।

কমিশন যে জীবনাদর্শে বিশ্বাস করেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, তাহাতে সহশিক্ষার সুফারিশ করাই স্বাভাবিক। ইহাতে আমরাও আশ্চর্য হই নাই।

কমিশন-রিপোর্টের পরিশিষ্টের ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কমিশনের পক্ষ হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট যে প্রশ্নমালা পাঠানো হইয়াছিল তাহার ৪০ নং প্রশ্ন এই যে, আপনি কি শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা সমর্থন করেন? ৮৮ জন ব্যক্তির নিকট হইতে ইহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহার ৭৩ জনই সহশিক্ষার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত পৃষ্ঠায় অংক কষিয়া ইহাও দেখানো হইয়াছে যে, শতকরা ৮২·৯ জন সহশিক্ষার বিরোধী। ইহা সত্ত্বেও কমিশন কিরূপে সহশিক্ষার সুফারিশ করিলেন, তাহা আমরা আদৌ ভাবিয়া পাইতেছিনা।

www.bjilibrary.com

নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার কোন সুযোগ থাকা যে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরোধী, একথা অশিক্ষিত মুসলমানদেরও জানা আছে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি কমিশনের কোন শ্রদ্ধা না থাকুক, জাতির শতকরা ৮২·৯ জনের মতের প্রতি তাহারা সম্মান না দেখান, অন্ততঃ নিছক সামাজিক দিক দিয়া সহশিক্ষা কতটুকু অকল্যাণকর, তাহা কমিশনের সুযোগে সদস্যদের চিন্তা করা উচিত ছিল। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে যদি কমিশন জাতিকে জোরপূর্বক টানিয়া লইয়া চলেন, তাহা হইলে যাহারা এখনো অন্ধ হইয়া যায় নাই, তাহারা নিশ্চয়ই ইহার প্রতিরোধ করিবে।

আমরা কমিশনকে জিজ্ঞাসা করি যে, মানুষকে সমাজের বিভিন্ন কাজের (Function) উদ্দেশ্যে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলাই যদি সুপরিকল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সমাজের সকল লোককে প্রাথমিক স্তরের পরও একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার স্বার্থকতা কি? বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য কমিশন মাধ্যমিক স্তরেই বিভিন্ন কোর্সের সুফারিশ করিয়াছেন। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সহশিক্ষা যে সম্ভব নয়, তাহা কমিশনও স্বীকার করিবেন। কেননা সমাজে তাহাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। সুতরাং এখানে আমরা একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলিব। সমাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক প্রবণতা ও কর্মক্ষেত্র কি সমান ও এক? প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহাদের গঠন প্রকৃতি, শক্তি ও যোগ্যতা ভিন্ন ধরনের। নারীর কর্মক্ষেত্র স্বভাবতঃই পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। একের কর্মক্ষেত্রে অপর তুলনামূলকভাবে অযোগ্য; কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার পর হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নারী-পুরুষের শিক্ষাও পৃথক হওয়াই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত। সমাজে যে শ্রম বিভাগ (Division of Labour) আছে, তাহা অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে যেমন প্রযোজ্য, নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্যের ভিত্তিতেও তেমনি প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার ভিতর দিয়া নারীকে পুরুষ করিয়া গড়িবার কৃত্রিম পথ পরিহার করাই উচিত। সহশিক্ষার পরিণামে ইউরোপের পারিবারিক জীবন যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যৌন উচ্ছৃংখলতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, জারজ সন্তান উৎপাদনের সংখ্যা যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, তাহা জানিয়া শুনিয়াও আমরা ঐ সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে মাত্রই রাজী নহি। কমিশন হয়তো ইহাকে সভ্যতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইসলাম ইহাকে চরম মূর্খতা (জাহেলিয়াত) ও বর্বরতা বলিয়াই মনে করে।

(খ) কমিশনের সুফারিশে দ্বিতীয় ইসলাম বিরোধী বিষয় হইল শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে সঙ্গীতকে বাধ্যতামূলক যুক্ত করা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া আপাততঃ এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইসলাম সঙ্গীতকে একটি শিল্প হিসাবে চর্চা করার পক্ষপাতী নয়। যাহারা সঙ্গীতকে জায়েয (Permissible) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহারাও ইহার জন্য এতসব শর্ত আরোপ করিয়াছেন যে, তাহাতে সামাজিকভাবে সঙ্গীত চর্চা সম্ভবপরই নয়।

www.bjilibrary.com

(গ) কমিশন প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত—অর্থাৎ ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা পড়ানো নিষেধ করিয়াছেন। তাহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, কোন ভাষা না বুঝিয়া পড়া আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর বিরোধী। আমাদের দেশে যে না- বুঝিয়া কুরআন পাঠ করা শিক্ষা দেয়া হয়, কমিশন সম্ভবতঃ সেই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে প্রথম কথা হইল যে সাত বৎসর হইতে নামায শিক্ষা দেয়া ইসলামের নির্দেশ। দশ বৎসর বয়সে ইসলাম নামাযের জন্য বিশেষ চাপ দিতে বলে। অথচ ১১ বৎসর পর্যন্ত যদি কুরআন পড়ার কোন সুযোগই না থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া চলিবে? তাহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার পরেই যাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তাহার কুরআন শিক্ষার উপায় কি?

কুরআনকে হেফাজত করিবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে সমস্ত দেশেই এবং রসূলের সময় হইতেই কিশোর বয়সে কুরআন মুখস্থ করিবার ঐতিহ্য চলিয়া আসিয়াছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি কুরআনকে ১১ বৎসর পর্যন্ত না পড়ার বন্দোবস্তই থাকে, তাহা হইলে কুরআনের অনুবাদের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নির্ভর করিতে থাকিবে। কুরআনের অনুবাদ কুরআন নয়, অনুবাদ মাত্র। শুধু কুরআনই আল্লাহর বাণী; অনুবাদ মানুষের বাণী—আল্লাহর বাণীর তরজমা মাত্র।

কমিশন যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করিবার সুফারিশ করিয়াছেন, তাহাই দেশের সকল বালক-বালিকার জন্য প্রযোজ্য হইবে। ইহার বাহিরে দেশে কোন শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই বাকী রাখা হইবে না। সুতরাং বর্তমানে কোরআন শিক্ষার যেটুকু সুযোগ রহিয়াছে, কমিশনের সুফারিশ কার্যকরী হইলে তাহা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শিক্ষা পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ ঃ

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিবার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পরামর্শসমূহ সরকার ও জনগণ—বিশেষভাবে ইসলামী চিন্তাবিদগণের নিকট পেশ করিতেছি।

(ক) প্রথমতঃ এমন সব শিক্ষাবিদকে লইয়া একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করিতে হইবে, যাহাতে পুরাতন মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। কারণ উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের পথে আগাইয়া নেওয়ার সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

(খ) শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইবে, তাহাদিগকে সর্বপ্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। জাতিকে কোন আদর্শে গঠন করা তাহাদের লক্ষ্য, কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি জাতির আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক, তাহা প্রথমেই ঘোষণা করিতে হইবে।

(গ) নীতিগতভাবে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটিই থাকিবে। একাধিক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষিত সমাজে বিপরীতমুখী শক্তির সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

হয়। জাতির চিন্তাধারায় ঐক্য স্থাপন করা ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভবপর নয়। জাতির আদর্শ যাহাই নির্ধারিত হইবে, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

যদি ইসলামী আদর্শেই জাতি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে শুধু দ্বীনিয়াত ক্লাসে ইসলাম শিক্ষা দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না। প্রকৃত মুসলমান সৃষ্টি উদ্দেশ্য হইলে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেননা আমরা মসজিদে মুসলমান হইব, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী বনিব, আর অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী সাজিব—এই রূপ কার্টুন গড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার শিক্ষা গ্রহণ করিলে কুরআনের ইতিহাস দর্শনকে অস্বীকার করাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শিক্ষা মগজে ঢুকাইয়া দিয়া হযরতের শাসন ব্যবস্থার ভাসাভাসা আলোচনা অর্থহীন হইবে। সুদকষার অংকে সুদে টাকা বাড়ে বলিয়া মগজে অলক্ষ্যে ঢুকাইয়া দেওয়ার পর সুদ হারাম হওয়ার যুক্তি বুঝানো মুশকিল।

তাই আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে মুসলমান বৈজ্ঞানিক, মুসলমান দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং মুসলমান অর্থনীতিবিদ হিসাবে জাতির প্রতিভাবান লোকদিগকে গড়িয়া তোলা যায়। ইহার জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ সম্বন্ধেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হইবে।

www.bjilibrary.com

শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা

[১৯৬১ সালে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে মজলিসে তামীরে মিল্লাত-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী সেমিনারে পেশ করা হয় এবং তা "চিন্তাধারা" প্রবন্ধ-সংকলনে প্রকাশিত হয়।]

আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কথাটি যেরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন, "ইসলামী শিক্ষা" কথাটিও তেমনি অস্পষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাই যদি ইসলামী শিক্ষা হয় তাহা হইলে প্রতিভাবান ছাত্রদের এ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কোন কারণ নাই এবং সমাজে উন্নতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কোন অভিভাবকই তাহাদের সন্তানদিগকে এ শিক্ষা দিতে রাজী হইবেনা। আর ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই যদি আদর্শ শিক্ষা বলিয়া প্রচারিত হয় তাহা হইলে এ শিক্ষার ফল দেখিয়া কোন ইসলামপন্থী লোকই সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করিতে পারেনা। যাহারা ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব দেখিতে চায়, তাহারা প্রচলিত দুইটি শিক্ষা ব্যবস্থার কোনটিকেই আদর্শ শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। তাই বর্তমান যুগে দুনিয়াতে শান্তি ও মর্যাদার সহিত জীবন-যাপন করিয়া আখেরাতের আদালতে মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যেসব অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার অন্বেষণ করেন, তাহারা রীতিমত এক মহাসংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন। মাদ্রাসার শিক্ষা দ্বারা পার্থিব কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। আর আধুনিক শিক্ষায় ইসলামী চরিত্র সৃষ্টিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই আধুনিক দুনিয়ার উপযোগী ইসলামী শিক্ষা কোন্ ধরনের হইবে, তাহা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সরকারী পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না হইলেও যাহাতে আগ্রহশীল লোকদের প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে গড়িয়া তোলা যায়, সেদিকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করিতেছি।

যেহেতু বর্তমান শিক্ষা-সংকট হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায়ই ইসলামী শিক্ষার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি, সেহেতু পাকিস্তানের পটভূমিকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। শুধু অবাস্তব মতবাদ লইয়া চর্চা করায় কোন লাভ নাই। এরূপ কল্পনাবিলাসের অবসরও আমাদের নাই। তাই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করিতে হইবে।

এ ব্যাপারে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করিয়া আমাদের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা অত্যন্ত জরুরী মনে করি। প্রথমতঃ শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহাই পরিষ্কার হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ

www.bjilibrary.com

মানুষের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা রচনাকালে মানুষের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে। মানুষকে দেহসর্বস্ব জীব মনে করিলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মার বিকাশ লাভের কোন বন্দোবস্তই থাকিবে না। আবার মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষা করিয়া একমাত্র আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা পদ্ধতি কায়েম হইবে তাহা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ যে ধরনের লোক তৈয়ার করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্ধারিত হইবে, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে তদনুযায়ী পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত জাতীয় জীবনাদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। যে আদর্শকে জাতির লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত করা হইবে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সে আদর্শের উপযোগী চরিত্রই গঠন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল ত্রুটি কোথায়, তাহা সঠিকরূপে অবগত না হইলে শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। কেননা রোগের প্রকৃত কারণ না জানিলে নির্ভুল চিকিৎসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই চারিটি বিষয়ের মীমাংসা শিক্ষা-পুনর্গঠনের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া শিক্ষার বাহ্যিক কাঠামো, আধুনিক উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, শিক্ষার স্তর বিভাগ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদির শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। রোগ নির্ণয় ও নির্ভুল চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করিয়া রোগীকে যত সুন্দরভাবেই রাখা হউক, এবং যতই সেবাশুশ্রূষা করা হউক- রোগীর অবস্থার উন্নতি এইসব বাহ্যিক ব্যবস্থা দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। সুচিকিৎসার সহিত এইসব বাহ্যিক ব্যবস্থা যুক্ত হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা কাহাকে বলে?

শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে শিক্ষা বিজ্ঞানীদের দার্শনিক জটিলতা হইতে মুক্ত হইয়া জনসাধারণের (Layman's) বোধগম্য ও সরল আলোচনাই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের যেসব জীব-জানোয়ারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, উহাদের মধ্যে শিক্ষার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাইনা। স্রষ্টা তাহাদের স্বভাবের মধ্যেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহারা বিচার বিবেচনা করিয়া, পরামর্শ ও গবেষণা চালাইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করে না। ইহাদের সহজাত বৃত্তির (Instinct) তাগিদেই প্রাকৃতিক নিয়মে উহারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কোন উস্তাদের কাছে সবক লইয়া ইহারা শিক্ষা লাভ করে না। বয়স্ক জীবেরা ছোটদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে বলিয়াও আমরা জানি না। জীবশিশুদের পিতা-মাতাকে তাহাদের সন্তানসন্ততির উপযুক্ত শিক্ষার জন্য পেরেশান হইতেও দেখা যায় না।

কিন্তু তাই বলিয়া কি উহাদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই? প্রত্যেক জীবেরই জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়। নিতান্ত বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনেই উহাদিগকে কাজ করিতেও আমরা দেখিতে পাই। জীব-শিশু তাহার পূর্ণ

www.bjilibrary.com

বিকাশ লাভের উপযোগী গুণাবলীও অর্জন করিয়া থাকে। এইসব মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে মানুষের ন্যায় 'বুদ্ধি' প্রয়োগ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হয় না।

মানব-শিশুর বিকাশ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত তাহার পিতামাতা এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপর যেরূপ নির্ভরশীল, অন্যান্য জীবের মধ্যে সেরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। মানব শিশু আগুনকে খেলার জিনিস মনে করিয়া উহাতে হাত দেয়, নিজের পায়খানাকে 'হালুয়া' মনে করিয়া মুখে পুরিয়া বসে। কিন্তু কোন বিড়াল-শিশুকে এইরূপ করিতে দেখা যায় না। যে কুকুর মানুষের মলকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তাহার শিশুকেও কোনদিন নিজের পায়খানা মুখে দিতে দেখা যায় না। মানুষের শৈশবকাল এত দীর্ঘ যে, পনর-বিশ বৎসর পর্যন্ত তাহাকে পিতা-মাতা শিক্ষক ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের উপযোগী গুণাবলী অর্জন করিতে হয়। অথচ মানুষের চেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীদের বেলায়ও এরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, মানবশিশুকে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা যাহা শিক্ষা দিতে হয়, অন্যান্য জীবশিশু তাহা সহজাত বৃত্তি দ্বারা আপনা আপনিই লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এইদিক দিয়া বিবেচনা করিলে মানুষের শিক্ষার সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ আপন প্রয়োজনের তাগিদে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থার নামই শিক্ষা।

এই ধরনের শিক্ষা একমাত্র মানুষেরই প্রয়োজন। অন্যান্য জীব- জানোয়ার এ ঝামেলা হইতে মুক্ত। কোন্‌টা খাওয়া ঠিক এবং কোন্‌টা ঠিক নয়, তাহা জানিবার জন্য ছাগশিশুর নাসিকা যন্ত্রের সহজাত ক্ষমতাই যথেষ্ট। কিন্তু মানবশিশুকে তাহা বড়দের নিকট হইতে শিখিতে হয়।

শৈশবকালে মানুষও সহজাত বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় বটে; কিন্তু যতই তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই উক্ত সহজাত বৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানব চরিত্র গঠনের প্রাথমিক স্তরে বালক বালিকারা ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা না করিলেও বড়দের ইচ্ছাকৃত চেষ্টার ফলেই তখন তাহারা শিক্ষা লাভ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া জ্ঞান অর্জন করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে।

মানুষের পরিচয় ঃ

মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ব্যতীত যদি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় তাহা হইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইতে পারে না। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন।

মানুষ সৃষ্টিজগতের বহু রহস্য উদঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুগেই বস্তুজগতের বিভিন্ন শক্তিকে নিজের উপকারে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু অহীর জ্ঞান ব্যতীত এবং নবীদের শিক্ষা ব্যতীত কোন কালেই মানুষ তাহার নিজের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

www.bjilibrary.com

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে এত বিপুল শক্তির অধিকারী করিয়াছে যে, মানুষ আজ পাখীর চেয়েও দ্রুত উড়িতে সক্ষম, দ্রুততম প্রাণীর চেয়েও অধিকতর বেগে চলিবার উপযোগী যানবাহনের অধিকারী। এমন কি গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বিচরণের ক্ষমতায়ও ভূষিত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রকৃত মানুষ' হিসাবে দুনিয়ায় জীবন যাপন করিবার উপযোগী শিক্ষা হইতে আধুনিক মানুষ বঞ্চিতই রহিয়া গেল।

ইহার মূল কারণ এই যে, মানুষ নিজকে ভালরূপে চিনিতে সক্ষম হয় নাই। শুধু বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মানুষ নিজকে চিনিতে অক্ষম বলিয়াই মানুষের মহান স্রষ্টা রাসূলের মারফতে যুগে যুগে মানুষকে আত্মজ্ঞান দান করিয়াছেন। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে কোরআন মজীদের নিকট 'ধর্ণা' দিতে হইবে।

কোরআনে মানুষের পরিচয় ঃ

কোরআন অন্যান্য জীবের সহিত মানুষের যে ব্যবধান নির্দেশ করে তাহা এই যে, 'মানুষ নৈতিক জীব' আর অন্যান্য জীব নৈতিকতার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসৎ, সত্য ও মিথ্যার বিচার করিবার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই না। মিথ্যার বেসাতিই যাহার সম্বল, সে মানুষটিও 'মিথ্যা-বলা অন্যায়' বলিয়া স্বীকার করে। মিথ্যা বলাকে ভাল কাজ মনে করিলে সে 'মিথ্যুক' উপাধিতে ভূষিত হওয়া পছন্দ করিত। "চুরি করা খারাপ" একথা স্বীকার করে বলিয়াই চোর প্রকাশ্যে না যাইয়া গোপনে চুরি করিতে যায়। ভাল মন্দের এই বিচার-জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়াছে। যাহারা এই নৈতিক দিককে উন্নত করিবার চেষ্টা করে না, কোরআন তাহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে, اولئك كالانعام بل هم اضل

"তাহারা পশুর ন্যায়; বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।" নৈতিকতার উন্নতি ব্যতীত মানুষ তাহার যাবতীয় শক্তি যখন ব্যবহার করে তখন সে পশুর চেয়েও অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি মানুষের এক বিরাট অস্ত্র। এই অস্ত্রের সাহায্যে শারীরিক আকারে ক্ষুদ্র হইয়াও সে বিরাট বপু-বিশিষ্ট হাতীর উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু নৈতিকতার বিকাশ না হইলে এই বুদ্ধি শক্তিকেই সে মানব জাতির অকল্যাণে প্রয়োগ করে। কথা বলার শক্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে। কিন্তু নৈতিক অবনতির ফলে যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন সে কুকুরের চেয়েও অধম হইয়া পড়ে। কেননা কুকুর মিথ্যা বলিতে পারে না। তাই বস্তুগত শক্তির সঠিক ব্যবহার নৈতিকতার উপরই নির্ভরশীল। এক তরোবারি নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হইলে তাহা মানুষের উপকারই করিবে। কিন্তু নৈতিকতার অভাব হইলে এই তরোবারিই তাহাকেই ডাকাতে পরিণত করিবে। নৈতিকতার বিকাশ ব্যতীত আধুনিক বিশ্ব এত প্রচন্ড বস্তুশক্তির অধিকারী হইয়াছে বলিয়াই আজ মানব জাতি এত বড় সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। আণবিক শক্তি ও মহাশূন্যের ব্যবহার আজ মানব জাতির অস্তিত্বকে

www.bjilibrary.com

শংকাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কেননা এই সব শক্তি নৈতিকতায় ভূষিত মানবের হাতে ব্যবহৃত হইতেছে না-নৈতিকতাহীন দানবের হিংস্র থাবা দ্বারাই ইহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

কোরআন হাত, পা, চোখ-কান বিশিষ্ট শরীরটাকে প্রকৃত মানুষ মনে করেনা। কোরআনের মতে এই দেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। কোরআনের পরিভাষায় সেই মানুষটিই হইল 'রূহ্ বা আত্মা।' এই আত্মাই নৈতিকতার আধার। রূহকে উন্নত করার ব্যবস্থা না করিলে এই শরীর পশুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। শরীরের যত সব বস্তুগত দাবী আছে তাহা পূরণের জন্য মানবদেহ সকল সময়ই ব্যস্ত। পেট খালি হইলেই সে খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ সেই খাদ্য চুরি করিয়া আনিল না পরিশ্রম করিয়া অর্জন করিল সে বিষয়ে পেটের কোন মাথাব্যথা নেই। তাহার খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যায়ভাবে খাদ্য আনিয়া দিলেও সে নিশ্চিন্তে খাইতে থাকে। কিন্তু তখন রূহ বলিতে থাকে যে, কাজটা অন্যায় হইল। গৃহপালিত পশু রজ্জু ছিঁড়িয়া নিজেরই দয়ালু মনিবের সাজানো বাগান খাইতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনা। নৈতিকতার বন্ধন ছিঁড়িতে পারিলে মানবদেহও তেমনি একটি পশুতে পরিণত হয়। মহানবী তাই নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষকে এমন এক ঘোড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহা রজ্জু দ্বারা এক খুঁটির সহিত আবদ্ধ। এই ঘোড়াটি যেমন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না; মানুষের স্বাধীনতাও নৈতিকতার রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই একমাত্র রজ্জুর সীমা পর্যন্তই সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে সক্ষম।

দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব ঃ

উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, মানুষের আত্মার সহিত তাহার দেহের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। মানুষ অনেক নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অনেক সময় দেহের তাগিদের নিকট পরাজয় বরণ করে। এই দ্বন্দ্বে দেহের জ্বালায় অস্থির হইয়াই একশ্রেণীর মানুষ নৈতিকতার চাপে বৈরাগী হইবার প্রেরণা লাভ করে। তাহারা 'দরবেশ' ও 'সন্ন্যাসী' হইলেও মানুষের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা নির্জীব পাথর ও নিশ্চল গাছের ন্যায় জীবন-যাপন করিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চস্থান হইতে পতিত হয়। আবার অন্যদিকে অধিকাংশ লোক দেহের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মাকে পঙ্গু করিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। কোরআন মানুষকে এই দ্বন্দ্বে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে বিধান দিয়াছে, তাহা দেহের সকল দাবীকে নৈতিকতার সীমার ভিতরে পূরণ করিতে সাহায্য করে। দেহের দাবীকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে কোরআন বলে ঃ "বৈরাগ্য সাধনের নীতি মানুষ নিজেই আবিষ্কার করিয়াছে—আমরা তাহাকে এই নির্দেশ দান করি নাই।"

আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্বে দেহকে অস্বীকার করার বৈরাগ্য নীতি যেমন মানুষের উপযোগী নয়, তেমনি আত্মাকে পরাজিত করিয়া পশুর ন্যায় ভোগবাদী জীবনযাপনও

www.bjilibrary.com

মানুষের অপমৃত্যু বই আর কিছুই নয়। বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মাঝামাঝি মনুষ্যত্বের ছিরাতুল মুস্তাকীমই কোরআনের শিখানো পথ। তাই কোরাআনের মতে মানুষ আত্মাহীনও নয়, দেহহীনও নয়; আবার আত্মাসর্বস্বও নয়, দেহ সর্বস্বও নয়- বরং সে দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমন্বয়। এইখানে দেহ আত্মার বাহন, আর আত্মা দেহেরই সহিস।

প্রবৃত্তি ও বিবেক ঃ

সাধারণ অর্থে দেহের দাবীকে প্রবৃত্তি এবং আত্মাকে বিবেক বলিয়া অভিহিত করা চলে। মানব দেহের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আকর্ষণই প্রবৃত্তি। এক দিকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের প্রতি মানুষের তীব্রভাবে আকৃষ্ট হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে-অপরদিকে তাহাকে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সচেতন বিবেক শক্তি দান করা হইয়াছে। এইরূপে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের বিপরীতমুখী তাড়না সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখনই বিবেকের বিপরীত কাজ করে তখনই বিবেক তাহাকে দংশন করিতে থাকে। দেহ অসুস্থ হইলে যেমন উহার আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে ধাবিত হয়না; তেমনি বিবেক অসুস্থ হইলেও তাহার দংশন করার শক্তি হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করিলে যেমন দেহ অসুস্থ হয় তেমনি বিবেকের বিরুদ্ধে বারবার চলিলে বিবেকশক্তি লোপ পাইতে থাকে। এই দুইটি শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপরই মানব জীবনের শান্তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মানুষের উপযোগী শিক্ষা ঃ

মানুষকে যাহারা আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থ মনে করেন, তাঁহারা শিক্ষা ব্যবস্থা তৈয়ার করার বেলায় মানুষের শুধু বস্তুগত প্রয়োজনের (Material need) দিকেই লক্ষ্য রাখেন। আর মানুষের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়ার ফলে সে ব্যবস্থার মানুষকে অন্যান্য জীবের ন্যায়ই দেহ-সর্বস্ব মনে করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাবিমুখ বলিয়া তাহার পক্ষে মানুষকে আত্মাপ্রধান হিসাবে চিনিবার সুযোগ হয় নাই। ডারউইন মানুষকে বানরের উন্নত সংস্করণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছেন। এই শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আবার যাহারা মানুষকে আত্মাসর্বস্ব মনে করেন অথবা তাহার জৈবিক প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রচলন করেন, তাঁহারাও মানুষের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা দিতে অক্ষম! এ শিক্ষা মানুষকে যতই খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করুক, বাস্তব জীবনে বস্তুগত প্রয়োজনের তাগিদ তাহাকে ঈমানের বিপরীত পথে যাইতে বাধ্য করে। তাই এই প্রকার শিক্ষাও মানুষের স্বভাবের বিপরীত।

www.bjilibrary.com

তাই যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌছাইয়া এই জগতের রূপ-রস-গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করিবার যোগ্যতা দান করে, সেই শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানবতার উন্নতি ও নৈতিকতার বিকাশে প্রয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই মানুষের উপযোগী শিক্ষা। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দান করা সত্ত্বেও যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব ও আত্মার উন্নতিকে ব্যাহত করে তাহা প্রকৃতপক্ষে মানব-ধ্বংসী শিক্ষা, তাহাকে কিছুতেই মানুষের উপযোগী শিক্ষা বলা চলে না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শের স্থান ঃ

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্র গঠন। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্রকে গঠন করিবার চেষ্টা প্রত্যেকটি সজাগ জাতির কার্যসূচীর প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়া অনেক সামঞ্জস্য থাকিলেও মূলতঃ তাহাদের সকলেরই একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে প্রকার মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হইতেছে, রাশিয়ায় হুবহু তাহার অনুকরণ হইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ হইল তাহাদের আদর্শের পার্থক্য। ভাল মন্দের পার্থক্যজ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তিচরিত্রের মান নির্ণয়, জগত ও জীবন সম্বন্ধে কতক ধারণা ইত্যাদির সমন্বয়েই একটি আদর্শ গড়িয়া উঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য, সেই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই উক্ত জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলা হয়। প্রত্যেক দেশের কোননা কোন আদর্শ থাকে। সে আদর্শ নিজস্বও হইতে পারে, অথবা অপর কোন দেশের নিকট হইতে ধার করাও হইতে পারে; কিন্তু কোন আদর্শ নির্ধারণ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির পথে পদক্ষেপ করিতে পারেনা। আদর্শ একটি জাতির লক্ষ্য। যে জাতির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, সে অপরাপর জাতির উচ্ছিষ্টভোগী হইতে বাধ্য। একটি বিশেষ আদর্শে জাতিকে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হউক, তাহা শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যের দিকে দেশকে পরিচালিত করিবে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ অপরিহার্য।

আমাদের জাতীয় আদর্শ ঃ

আমরা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী সে রাষ্ট্রটি ভারত উপমহাদেশের বুক চিরিয়া নূতনভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে যে ইসলামের আদর্শই একমাত্র প্রেরণা দানকারী শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে, একথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামী আদর্শের রূপায়ণই পাকিস্তান দাবীর উদ্দেশ্য। সুতরাং পাকিস্তানের আদর্শ লইয়া বিতর্ক করার কোন অবকাশই নাই। ইসলামই পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ। ইসলামী জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাকিস্তানকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই পাকিস্তানী মুসলিমদের নৈতিক দায়িত্ব।

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ঃ

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে হইলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তানে কোন্ ধরনের মানুষ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের নিজস্ব কোন মত, বিশ্বাস, জীবন-দর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবন ধারা বলিতে যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যত বংশধরগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন তাহারা আমাদের তাহজীব তমদ্দুনকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে যে আদর্শ রহিয়াছে তাহাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মৌলিক দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। আমাদের দেশ ইসলামী জীবন বিধান সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমান এবং পাকিস্তানের আজাদী, অখন্ডতা ও দৃঢ়তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেরণাদানকারী আদর্শ হইতে হইবে।

সুতরাং পাকিস্তানে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যাহার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আদর্শকে মানব জাতির মুক্তিবিধানরূপে পেশ করিবার যোগ্য লোক তৈয়ার করিতে হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষায় এবং সাহিত্যে ইসলামী নৈতিকতা, মূল্যমান ও মূল্যবোধের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। কাজেই বস্তুগত জ্ঞানের সহিত নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হইতে হইবে। আমরা যদি গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই তাহা হইলে দিশাহারার ন্যায় অনিশ্চিত পথে চলিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইব।

আমাদের শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা ঃ

বর্তমানে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুইটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। একটি হইল প্রাচীন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি ইংরেজী শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি 'ইসলামী শিক্ষা' বলিয়া দাবী করে এবং দ্বিতীয়টি 'আধুনিক শিক্ষা' হিসাবে গৌরব বোধ করে। যাহারা মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে, তাহারা কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি অধ্যয়ন করে বটে; কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার কোনই সুযোগ পায় না। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত প্রকার সমস্যা আছে, উহার আধুনিক রূপ ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাহারা কোন ধারণাই লাভ করেনা। ফলে মানব সমস্যার যে সুষ্ঠু সমাধান আল্লাহর কোরআন ও রসূলের হাদীসে দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গিই তাহারা লাভ করিতে পারে না। এই কারণে দীর্ঘকাল মাদ্রাসায় কঠোর সাধনা করিয়াও তাহারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

www.bjilibrary.com

আর যাহারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে, তাহারা প্রচলিত দুনিয়ার ভালমন্দ জ্ঞান অনেক কিছুই হাসিল করিতে সক্ষম হয় বটে; কিন্তু মুসলিম হিসাবে জীবন যাপনের কোন প্রেরণাই তাহারা লাভ করে না। চিন্তা ও কর্মে তাহারা প্রায়ই অমুসলিম হিসাবে গড়িয়া উঠে। এ শিক্ষা পাওয়ার পরও যাহারা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থার বাহিরের পরিবেশে নিজদিগকে খাঁটি মুসলিমরূপে গঠন করেন। তাঁহারা নিয়মের ব্যতিক্রম।

এমতাবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষা পুনর্গঠন করা রীতিমত জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের নাগরিকদিগকে উপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। দুই ধরনের শিক্ষিত লোক সমাজকে দুই বিপরীত দিকে টানিতে থাকিলে দেশের বিপর্যয় অনিবার্য। উপরোক্ত দুই প্রকারের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পাকিস্তানের আদর্শ ইসলাম বলিয়া স্বীকার করিবার পর ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা বলিয়া দুই প্রকার শিক্ষা চলিতে থাকার কোন অর্থই হয় না। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক করিয়া তুলিতে হইবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষার রূপ দিতে হইবে। উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকিলে এই কাজ অসম্ভব নয়। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার আন্তরিক ইচ্ছার অভাবেই আজ পর্যন্ত শিক্ষা পুনর্গঠনের এই বাস্তব সমাধানটি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

পাকিস্তানের শিক্ষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা ঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হয় নাই। এ পর্যন্ত যতগুলি শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, উহাদের কোনটিই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়িবার সুফারিশ করিতে পারে নাই। সকলেই ইসলামকে একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়াছে মাত্র। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় খৃষ্টধর্মকে যেটুকু স্থান দেওয়া হইয়াছে, পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকেও মাত্র ততটুকু স্বীকৃতিই দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতঃ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষবাদের ভিত্তিতে গঠন করিয়া ইহার সহিত Religious Instruction (ধর্মীয় শিক্ষা)-এর লেজটুকু জুড়িয়া দিলেই কোন শিক্ষাপদ্ধতি ইসলামী হইয়া যায় না। এই ধরনের অস্বাভাবিক সংযোগ দ্বারা আর যাহাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক গলদ ঃ

ইসলামকে পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা পুনর্গঠন করিতে হইলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক গলদটুকু তালাশ করিয়া বাহির করিতে হইবে।

www.bjilibrary.com

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে তাহা এই যে, উহা দ্বারা কোন্ ধরনের মানুষ গঠন করা হইবে। এ দেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি ইংরেজ শাসকদের অবদান। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ নিশ্চয়ই এদেশের আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করে নাই। এমনকি তাহারা নিজ দেশে যে প্রকার নাগরিক গঠন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে, সে ধরনের উদ্দেশ্য এখানে ছিল না; বরং এমন কতক লোক তৈয়ার করা তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল, যাহারা মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসকদের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে এদেশে ইংরেজ শাসনকে জারী রাখিতে সাহায্য করিবে। তাহাদের এমন কতক লোক যোগাড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাহারা ইংরেজদের কথা বুঝতে পারে, তাহাদের আদব কায়দা, চালচলন, রীতি-নীতি অনুকরণ করিতে সক্ষম এবং তাহাদের আদর্শকে ভালবাসিতে রাজী।

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বর্তমানে অধিকতর উন্নত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সেই ব্যবস্থার সহিত Religious Instruction-এর নামে দ্বীনিয়াতের সংযোগ ও ইংরেজদের অনুকরণ মাত্র। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, অংক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে যে প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়, জগত ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মলাভ করে, বিশ্বাস ও জ্ঞান যে পথে ধাবিত হয়, আমাদের দেশে উহার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নাই।

বিশাল শিক্ষা-বৃক্ষকে যদি ইসলামের জীবন দর্শন হইতে নিরপেক্ষ হিসাবে গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে সেই শিক্ষাবৃক্ষের কান্ডের সহিত দ্বীনিয়াতের আলাদা কলম বাধিয়া দিলে যে কি পরিণাম হয়,তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হইয়াছে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে এই পরিকল্পনাই গঠন করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের ভিত্তিতে সবকিছু শিক্ষা দিবার সঙ্গে দ্বীনিয়াতের অস্বাভাবিক সংযোগ সেখানেও ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এক প্রকারের জীবের শরীরে অন্য জীবের অংশবিশেষ বাঁধিয়া দিলে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা বেশী ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পার্থিব সকল শাস্ত্র এমনভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে ও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখান হইতেছে যে, এ বিশাল বিশ্বের কোন স্রষ্টা নাই। ইহা নিজে নিজেই চলিতেছে এবং সাফল্যের সহিত নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবেই চলিতেছে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিধান শিক্ষা দেওয়ার ভিতর দিয়া ছাত্রদের মগজে এই ধারণাই জন্মাইতেছে যে, আল্লাহ, রসূল,অহী, কোরআন ইত্যাদি ব্যতীতই জগত, উন্নতি লাভ করিতেছে। সমগ্র শিক্ষার মাধ্যমে গোটা জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধেই তাহারা স্রষ্টানিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদেরকে যখন হঠাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন আল্লাহ, রসূল,আখেরাত, অহী ইত্যাদির কথা প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অবাক করে। অতঃপর এই সকল বিষয় তাহাদের বিদ্রূপের জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।

www.bjilibrary.com

এই ধ· নের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মকে হেয় মনে করা, ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ধরনের ব্যবস্থায় বড়জোর ধর্মকে শুধু একটি নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞান হিসাবে কিছুলোকের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহা জীবনকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত করিবার যোগ্যতা কিছুতেই সৃষ্টি করিবে না। এই ধরনের শিক্ষার ফলে ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসাবে স্থান পাইবে।

ইসলাম এমন কোন ধর্মের নাম নয় যে, মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজ করিবার অনুমতি দিবে, আর সেই সংগে কিছু কর্মহীন বিশ্বাস ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের পরিশিষ্ট জুড়িয়া দিলেই রাজী হইবে। কাহারো গড্ বা ভগবান হয়ত বা ইহাতে রাজী হইতে পারে যে গীর্জ্জা ও মন্দিরে তাহাকে ডাকিলেই সে সন্তুষ্ট হইবে এবং জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কর্মে তাহাকে ত্যাগ করিলে কোন আপত্তি করিবে না; কিন্তু কোরআনের আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কাহারো সহিত আপোস করিতে রাজী নহেন। এই কারণেই তিনি মু'মিনদের "সম্পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও" বলিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন।

আমরা ইহাকে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক মনে করি যে,আল্লাহ আছেন বলিয়া মানিব, অথচ তিনি পার্থিব জীবনে আমাদের পথ প্রদর্শক হইবেন না। যে আল্লাহ দুনিয়ার চলার পথে আমাকে সঠিক হেদায়েত দেন না, তাঁহাকে শুধু মসজিদে মানিয়াই বা লাভ কি?

সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে যে শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই তাহা বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। ইহার সহিত দ্বীনিয়াতের শিক্ষাকে জুড়িয়া দিয়া ইসলামকেও একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব নির্জীব ধর্মেই পরিণত করা হইয়াছে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন ঃ

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ইসলামের ধর্মীয় দিকটুকুরই চর্চা হয় মাত্র। ইসলামকে একটি ধর্ম হিসাবে শিক্ষা করার নাম ইসলামী শিক্ষা বলা কিছুতেই উচিত নয়। ইসলাম একটি জীবন দর্শন ও জীবন বিধান। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্যই ইহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিধান রহিয়াছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ বলিয়া স্বীকার করিলে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, ফরায়েজ ইত্যাদি শিক্ষা দান করার দ্বারাই ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না।

যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে তাহাই ইসলামী শিক্ষা। সে শিক্ষা লাভ করিবার ফলে শিক্ষার্থীদের মন, মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়িয়া উঠিবে, যাহাতে ইসলামের আদর্শে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সে শিক্ষা লাভ করিলে জগত ও জীবন সম্পর্কে কুরআন যে দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিতে চায়,তাহাই লাভ করা যাইবে। এই শিক্ষা ব্যক্তি জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল দিকেই ইসলামের আদর্শকে মানব

www.bjilibrary.com

রচিত সকল আদর্শ হইতে উন্নত ও প্রগতিশীল বলিয়া প্রমাণিত করিবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চতম মান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায়ই কুরআন ও সুন্না'র আলোকে যাবতীয় শিক্ষা দান করিতে হইবে। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে মানব রচিত মতবাদসমূহের সহিত তুলনা করিয়া ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে।

মোট কথা, যে শিক্ষা মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম শাসক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করিবে তাহাই ইসলামী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যদি ইসলামই আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তাহা হইলে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইলে ছয়টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১) শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইতে হইবে।

(২) পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয় সে সবকেই ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশকেই ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে।

(৪) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সহিত মানব রচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে।

(৫) যেহেতু কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস, সেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চস্তরে উন্নতমানের মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকিতে হইবে।

ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ ঃ

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে লক্ষ্য হিসাবে স্থির করিয়া যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলা হয় তাহা হইলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবরূপ কি দাঁড়াইবে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

(১) দ্বীন ও দুনিয়া ঃ

প্রথম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ করিবার যোগ্য হইতে হইবে। দ্বীন ও দুনিয়া কথাটি দ্বারা সাধারণতঃ ধর্মীয় ও পার্থিব বলিয়া কথিত দুইটি পৃথক দিক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন ও

www.bjilibrary.com

দুনিয়া দুইটি সামঞ্জস্যহীন পৃথক সত্তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যেহেতু জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ বিধান নাই (অন্ততঃঅন্য কোন ধর্মের নেতৃবৃন্দ এইরূপ দাবী করেন না) সেহেতু সেই সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় শিক্ষার সহিত তাহাদের পার্থিব শিক্ষার যোগাযোগ নাই। তাহারা দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাহা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মের প্রভাবমুক্ত। তাহারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষার পরিশিষ্টটুকু জুড়িয়া দেয়।

কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোন ধর্ম মাত্র নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয় তাহা হইলেই উহা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়।

মানুষকে পার্থিব জীবনে যাহা কিছু করিতে হয় তাহা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী করিলেই উহা এবাদতে পরিণত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন ও বিচার পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম সকল মানুষকেই করিতে হয়। যাহারা আল্লাহকে স্বীকারই করেনা তাহাদেরও এই সব কাজ না করিলে চলে না। জীবনের সকল কাজকর্মেই তাহারা নিজেদের মনগড়া নীতি বা অন্য কোন মানুষের রচিত নীতি ও বিধান অনুসরণ করিয়া চলে। কিন্তু এই কাজগুলিই যদি কুরআন ও হাদীসের নীতি ও আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয় তাহা হইলে এই সবই এবাদতে পরিণত হয়—ইসলামে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানই শুধু এবাদত নয়—গোটা জীবনটাকে এবাদতে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে।

জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তব জীবন হইতে পৃথক কোন নিষ্ক্রিয় শিক্ষা হইতে পারেনা। দুনিয়ায় আল্লাহর প্রকৃত দান হিসাবে জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। তাই ইসলামী শিক্ষায় দ্বীন ও দুনিয়ার প্রচলিত কৃত্রিম পার্থক্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনকে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন করিয়া দেখাও অসম্ভব।

পার্থিব শিক্ষায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ ঃ

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান পরোক্ষ (Indirect) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া এবং বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা বিজ্ঞানীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিক্ষার্থীদিগকে নীতি জ্ঞান ও তত্ত্বকথা পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে গেলে যতটা কার্যকরী হয়, বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে সে শিক্ষা দিলে অবচেতনভাবেই তাহা অধিকতর সুফল ও ফলপ্রসূ হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও আভ্যন্তরীণ প্রেরণায় যাহা করিতে চায় তাহাকেই শিক্ষামূলক করিয়া

www.bjilibrary.com

তোলার নামই পরোক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষায় এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই খেলার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান, শব্দগঠন ইত্যাদি শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করা সম্ভব হইয়াছে।

শিক্ষাপদ্ধতির এই পরোক্ষ নীতিকে অবলম্বন করিয়া পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাকে ইসলামী ছাঁচে ঢালিয়া শিক্ষা দিলে বাস্তব দিক দিয়া অধিক কার্যকরী হইবে। সুদ যে এক প্রকার জঘন্য জুলুম তাহা পৃথকভাবে মুখস্থ না করাইয়া যদি সুদের অংক কষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবচেতনভাবেই শিক্ষার্থীর মনে উহা সহজে কায়েম হইবে। আমরা স্কুল জীবনে গোয়ালা কর্তৃক দুধে পানি মিশাইয়া বিক্রয় করার অংকের মাধ্যমে যাহা শিখিয়াছি তাহাতে এইরূপ সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের প্রতি অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয় নাই। সেখানে পরোক্ষ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে কিরূপে বেশী দামে কিনিয়া পানি মিশাইবার ফলে কম দামে বিক্রয় করিয়াও গোয়ালা লাভবান হইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই অংকটিতে "গোয়ালা কত লাভ করিয়াছে" জিজ্ঞাসা না করিয়া যদি "গোয়ালা মানুষকে কত পরিমাণ ঠকাইয়াছে" জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে সহজেই এই কাজের প্রতি ছাত্রদের ঘৃণার উদ্রেক হইবে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়াইবার সঙ্গেই পবিত্রতায় ইসলামী ধারণা দান করা হইলে পবিত্রতা সম্পর্কে পৃথকভাবে মাসআলা শিক্ষা দেওয়ার অপেক্ষা বেশী উপকারী হইবে। সৌরজগত সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান দান করিবার সঙ্গেই যদি সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে ভূগোল-বিজ্ঞানেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করিবে।

এইভাবে সকল স্তরের শিক্ষাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং সকল বিষয়কেই কুরআন হাদীসের জ্ঞান দান করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শিক্ষার পরিবেশ ঃ

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গোটা পরিবেশ একেবারেই ইসলাম বিরোধী। এই পরিবেশে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করিলেও শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ইসলামের কোন প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। নামাজ ইসলামী জীবন-বিধানের দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট উহা 'ফরজ' বলিয়া গণ্য নয়। সেখানে নামাজ বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মোবাহ (যা করা ও না করায় কোন লাভ ক্ষতি নাই) কাজ মাত্র। ইসলাম পর্দার নির্দেশ দেয়; কিন্তু সেখানে পর্দা 'হারাম'। মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য ইসলামে হারাম, কিন্তু সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে এ সবই আর্টের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী নৈতিকতার অধিকাংশ সীমাই সেখানে লংঘন করা সহজ; নৈতিকতা পালন করা সেখানে অত্যন্ত কঠিন।

www.bjilibrary.com

বিশেষ করিয়া মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামের বিশ্বাস ও মূল্যমান সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা ছোট-সময় হইতে শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসে, কলেজ-জীবনে যখন তাহাদের বিশ্বাস ও মূল্যমানের বিপরীত চলাই সহজতর মনে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের বিশ্বাস ও কর্মে প্রথমে দ্বন্দ্ব এবং পরে স্পষ্ট বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। তাহাদের নৈতিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়। গোটা শিক্ষা জীবনেই তাহারা বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করার এক ব্যাপক ট্রেনিং লাভ করিতে থাকে।

ইহারই ফলে তাহাদের বাস্তব জীবন কোন বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় বহন করে না। তাহারা ঘুষ খাওয়াকে অন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করিলেও এই বিশ্বাসের বিপরীত চলারই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। জাতির খেদমত করা কর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজের খেদমত করিবার মহান ট্রেনিংই শিক্ষা ব্যবস্থায় লাভ করিয়াছে।

জাতির মূল্যমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশ গড়িয়া তোলা না হইলে শুধু কিতাবী বিদ্যা দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি হইতে পারে না। বিদেশে যে সমস্ত বই পড়ান হয় আমাদের কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই সব বই-ই পাঠ্য আছে। কিন্তু ঐ সব দেশে সমাজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সহিত শিক্ষার পরিবেশের বিরোধ সামান্যই আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা তাহাদের বিশ্বাসের বিপরীত নয়। সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস মোতাবেক চরিত্রই সেখানে সৃষ্টি হয়। ফলে সে সব দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এতটা নৈতিক অধঃপতন দেখা যায় না।

প্রকৃত কথা এই যে, চরিত্র সৃষ্টির জন্য কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। যদি মূল্যবোধ ও বাস্তব শিক্ষা একরূপ হয় তবেই চরিত্রের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত আমাদের সাধারণ মূল্যবোধের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং হয় আমাদের মূল্যবোধের বিশ্বাসকে বদলাইয়া শিক্ষার পরিবেশ মোতাবেক গঠন করিতে হইবে, না হয় পরিবেশকে ঈমান অনুযায়ী সংস্কার করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় আমরা বিশুদ্ধ অনৈসলামী চরিত্র সৃষ্টি করিব। আর দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যিকার ইসলামী চরিত্র গঠিত হইবে।

উচ্চ শিক্ষার ইসলামী রূপ ঃ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই নেতৃত্ব দান করে। কারণ চিন্তার নেতৃত্ব প্রকৃত নেতৃত্ব। বর্তমানে আমাদের দেশে অনৈসলামী বা ইসলাম নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিত লোকের নেতৃত্বের ফলেই সমাজে ইসলামের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। তাই উচ্চশিক্ষাকে 'ইসলামী' করিয়া গঠন না করিলে বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

উচ্চ-শিক্ষা-পর্যায়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামী রাষ্ট্র

www.bjilibrary.com

ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান এবং কুরআনের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত প্রচলিত পন্থায় এইসব বিষয় শিক্ষা দিতে থাকিলে পৃথকভাবে দ্বীনিয়াত শিক্ষা যতই দেওয়া হউক তাহাতে ছাত্র ছাত্রীদের মন-মগজ কিছুতেই ইসলামের ছাঁচে গঠিত হইবেনা।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর শুধু কুরআনের অনুবাদ ও তফসীর শিক্ষা দ্বারা কিছুতেই ইসলামের ইতিহাস- দর্শনকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের উচ্চ শিক্ষায় কুরআনের ইতিহাস দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা দ্বারাই তাহা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিবার পর হযরতের শাসন ব্যবস্থার ভাসাভাসা আলোচনা কিছুতেই মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানী সৃষ্টি করিবেনা। তাই শিক্ষার বিষয়সমূহকে এমনভাবে পরিবেশন করিতে হইবে, যাহাতে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীগণ মুসলমান বৈজ্ঞানিক, মুসলমান, দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং মুসলমান অর্থনীতিবিদ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হইবে।

শিক্ষার বিষয়সমূহকে প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা দিতে থাকিলে ধর্মীয় শিক্ষা যদি শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক করা হয় তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের একাংশ মসজিদে মুসলমান, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী, অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী এবং পারিবারিক জীবনে ফ্রয়েডপন্থী হিসাবে গঠিত হইয়া কিছুসংখ্যক কার্টুনে পরিণত হইবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গঠন করিতে হইলে শিক্ষার সকল বিষয়কেই ইসলামের ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিতে হইবে।

ইসলামে জ্ঞানের উৎস ঃ

কুরআন ও হাদীসই ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। আরবী ভাষায় মূল কুরআন ও হাদীসকে পূর্ণরূপে বুঝিবার লোকের অভাব হইলে জীবনের সকল দিকেই ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ন হইবে। তদুপরি বহু শতাব্দীর কঠোর সাধনার ফলে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যে ইসলামী আইন শাস্ত্র বা ফেকাহ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও আরবী ভাষায়ই রচিত। সুতরাং কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করিবার যোগ্য প্রতিভাশালী লোক তৈয়ার না হইলে ইসলামী শিক্ষা তো দূরের কথা, ইসলামী সমাজই টিকিতে পারিবেনা।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা থাকে, তেমনি কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য শিক্ষার উচ্চস্তরে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ইহার মাধ্যমে যে সকল মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈয়ার হইবে প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ইসলামী দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে জাতিকে নেতৃত্ব দিবার যোগ্য হইবে। কিন্তু তাহারা যদি মানব সমস্যা, আধুনিক জগত ও প্রচলিত চিন্তাধারার সহিত পরিচিত না হয় তাহা হইলে তাহাদের কুরআন, হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের

www.bjilibrary.com

কোন উপকারে আসিবেনা। সুতরাং তাহাদিগকে ডিগ্রি পর্যায়েও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জাতিকে যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষকদের আদর্শ ঃ

শিক্ষার ব্যাপারে সকল অবস্থায়ই শিক্ষকের গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষকের বিদ্যা ও চরিত্রের মানের উপর চিরদিনই শিক্ষার ফল প্রধানতঃ নির্ভরশীল। "কী পড়ান হইতেছে" তাহার চেয়ে "কি ধরনের শিক্ষক পড়াইতেছেন" উহার মূল্য ও গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলমান হইতে হইবে। কিতাবী বিদ্যার অপেক্ষা বাস্তব উদাহরণ অনেক বেশী কার্যকরী হয়। যদি শিক্ষকগণ ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শস্থানীয় হন তাহা হইলে শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হইবে।

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের উন্নতি ঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ন্যায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান আজ বিরাট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই উন্নতিকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যাহাতে ব্যবহার করা যায়, সেদিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইসলামের চর্চা করিবার জন্য আমরা যেমন মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হইয়াছে, তাহাও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই কাজে লাগাইতে হইবে।

অতীত ও বর্তমানের দার্শনিকদের গবেষণা এবং শিক্ষাবিদদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা সম্পর্কে এত তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে যে, শিক্ষা আজ রীতিমত এক বিরাট বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিলে বর্তমান যুগের উপযোগী মানের লোকদিগকে ইসলামী শিক্ষা দান করা অসম্ভব হইবে। সুতরাং ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে থাকিয়া আধুনিক সকল উপায় উপকরণকেই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রেও কাজে লাগাইতে হইবে।

উপসংহার ঃ

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রবন্ধে শিক্ষাপদ্ধতির ইসলামী রূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সরকারী পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যাপকভাবে প্রচলন করা কিছুতেই সম্ভব হইবেনা। আর যে সরকার ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করে নাই, সে ধরনের কোন সরকারকে এইরূপ কোন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বলিলেও কোন সুফল ফলিবে না।

সমাজে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করিবার জন্য সর্বক্ষেত্রে যেমন কিছুসংখ্যক মুজাহিদদের সুসংবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে। তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহাদিগকে

www.bjilibrary.com

চিন্তা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকারে হইলেও এইরূপ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। এইভাবেই যখন কোন সমাজে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন চলিতে থাকে, তখন জীবনের সকল দিকেই উপযুক্ত চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের দল তৈয়ার হইতে থাকে। কোথাও এইরূপ একটি আন্দোলন বিজয়ী হইলে অতি সহজেই উপরোক্ত রূপ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হইবে। সুতরাং যাহারা ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেন তাহাদিগকে একটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনাকেও নিজেদের কর্মসূচীর একটি বিশিষ্ট অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঢাকায় ১৯৬১ ইসলামী সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা)

-"ইসলামের ইতিহাস থেকে আমি একটি শিক্ষালাভ করেছি যে, মুসলিমদের ভয়াবহ বিপদের সময় একমাত্র ইসলামই তাদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ যদি আপনারা পুনর্বার ইসলামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তার জীবনী শক্তি উৎপাদক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন, তাহলেই আপনাদের মহান অস্তিত্ব ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা পাবে।"

www.bjilibrary.com

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি

[আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন 'ইফসু'র উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলামী যুব সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের ট্রেনিং ক্যাম্পে ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ। মাসিক পৃথিবীর ১৯৯১ সনের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত]

শুরুতেই আমি কালামে পাক থেকে কয়েকটি আয়াত পেশ করতে চাই।

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। মেহেরবান আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না, আবার তাকাও কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারে বারে দৃষ্টি ফেরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।" (সূরা আল-মূলক ৩-৪)

কালামে পাকের আলোচ্য অংশটির মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীন মানব সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর সৃষ্টি জগতে সামান্যতম ত্রুটি বা দুর্বলতা পাবে না। এর অর্থ-এ বিশাল সৃষ্টি জগত অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক, সুশৃংখল। এখানে বিশৃংখলা নেই বরং সর্বত্রই শৃংখলা বিদ্যমান। কাজেই অত্যন্ত সুশৃংখল এই বিশ্বজগতে কোন কিছু সফল করতে হলে অবশ্যই তা নীতি নির্ধারিত বা যথার্থ উপায়েই হতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, চাষ একটি পদ্ধতি এবং ফসল উৎপাদনের জন্য চাষের প্রয়োজন। উপকারী অপকারী নির্বিশেষে শস্য উৎপাদনের জন্য চাষ জরুরী। কিন্তু উভয় শস্যের জন্য অর্থাৎ উপকারী বা অপকারী উভয়ের জন্য চাষের প্রক্রিয়া অভিন্ন। আপনাকে জমিতে লাঙ্গল দিতে হবে। আগাছামুক্ত করতে হবে, বীজ বপন করতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সার দিতে হবে এবং চারাগাছের পরিচর্যা করতে হবে। খাদ্যশস্যসহ যে কোন ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য এটাই হচ্ছে নির্ধারিত পদ্ধতি। এর অর্থ হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রেই একটা নিয়ম অবশ্যই পালনীয়।

বিপ্লবের সাধারণ পদ্ধতি ঃ

আপনি যদি কোন সমাজকে পরিবর্তন করতে চান এবং সে সমাজকে কমিউনিস্ট বা ইসলামী যে সমাজেই পরিবর্তন করতে চান না কেন উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ম মেনে চলতে হবে, যেমন ফসল উৎপাদনের জন্য চাষ জরুরী। একইভাবে সকল বিপ্লবের জন্যই নিয়ম বা পদ্ধতি প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, নাৎসী বা ইসলামী যে কোন সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কিছু বিষয়ের মিল বিদ্যমান। যদিও বিস্তারিত পর্যালোচনায় সমাজ বদলের বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেশ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

আপনি সমাজকে যে রঙে রঙ্গিন করতে চান সে আদর্শের ব্যাপক প্রচারের সাথে সাথে জনগণকে সে আদর্শের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন সামাজিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক

www.bjilibrary.com

প্রচেষ্টা বা সমষ্টিগত উদ্যোগ। আর এ জন্য একটা পদ্ধতির প্রয়োজন। বিপ্লবের পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে বিপ্লব বলতে কি বুঝায় আমরা তা আলোচনা করব। অনেকে বিপ্লব বলতে 'বল' প্রয়োগে কিছু করা বুঝেন, কিন্তু বিপ্লব সাধনের জন্য বল প্রয়োগ জরুরী নয়।

দু'ধরনের বিপ্লব ঃ

রাজনৈতিক পরিভাষায় বিপ্লব সাধারণতঃ দু'ধরনের। সশস্ত্র বিপ্লব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বা দার্শনিক বা Philosophical বিপ্লব। দু'টোই বিপ্লব। বার্মায় আউং সাং এবং তার মন্ত্রীবর্গকে হত্যা করার পর একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করেছিল। আমরা এটাকে বুদ্ধিবৃত্তিক বা Philosophical revolution বলতে পারি না। বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব বা দার্শনিক বা Philosophical বিপ্লব হচ্ছে জনগণকে একটা পরিবর্তনের ব্যাপারে convince করতে হবে। তারা বর্তমানে যে সমাজ কাঠামোতে অবস্থান করছে তা থেকে ভিন্ন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাতে হবে। যখন জনগণ convinced হবেন ও ঐ কাঙ্ক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় লোক তৈরী হবে এবং জনগণের সমর্থনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, তখন সেটা হবে Philosophical বা দার্শনিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব।

আমরা জানি কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম যখন নিছক একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা হিসেবে ইংল্যান্ডে ভিত্তি লাভ করে তখন একদল চিন্তাবিদ নিজেদেরকে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী বলত। জর্জ বার্নার্ড শ, হ্যারল্ড জে লাস্কি, এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সমর্থন করতেন বটে কিন্তু শক্তি প্রয়োগে পরিবর্তনের বিশ্বাসী ছিলেন না। জনগণকে বুঝানোর পর যদি দেশের মানুষ সে আদর্শ চায় তবেই তা সে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ বা বাস্তবায়িত হতে পারবে। এটাই হচ্ছে দার্শনিক বিপ্লব বা বুদ্ধিবৃত্তিক বা Philosophical revolution। তারা আদর্শগত ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী হলেও লেনিনের পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কাজেই বিপ্লব মানে অস্ত্র ও বল প্রয়োগ এমন ধারণা সঠিক নয়।

বিপ্লবের অর্থ ঃ

বিপ্লব অর্থ, পূর্ণ পরিবর্তন বা আমূল পরিবর্তন। সমাজের জনগণের চিন্তা-চেতনা থেকে আরম্ভ করে তাদের চারিত্রিক এবং সমাজ কাঠামো থেকে আরম্ভ করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পুরাপুরি পরিবর্তনই বিপ্লবের দাবী। অর্থাৎ পূর্ণ বা সামগ্রিক পরিবর্তনই হলো বিপ্লব। সংস্কার এবং বিপ্লব সমার্থবোধক নয়। কোন সমাজের সংস্কার বলতে বুঝায় সমাজের এদিক-সেদিক কিছু পরিবর্তন করে চলতে দেওয়া। সংস্কারে সমাজের কোন নির্দিষ্ট দিকের পূর্ণ পরিবর্তনও হতে পারে–যেমন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিবর্তন কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজের পরিপূর্ণ পরিবর্তন নয়। এ ক্ষেত্রে একটা বাড়ীকে উদাহরণ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। বাড়ীটির সংস্কার বলতে

www.bjilibrary.com

বুঝায়-দেয়াল নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করা, দরজা পুরোনো হলে নতুন দরজা লাগানো ইত্যাদি, কিন্তু কাঠামোগত কোন পরিবর্তন নয়। আর এটাই সংস্কার।

বিপ্লব হলো বাড়ীটির পূর্ণ পরিবর্তন। দেয়াল থেকে আরম্ভ করে তার কাঠামো পর্যন্ত বদলে দেয়া অর্থাৎ একটা নতুন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন। কাজেই কোন বিপ্লব মানেই হল পূর্ণ পরিবর্তন। ইসলামী বিপ্লবও তাই ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের আলোকে একটা সমাজের পূর্ণ পরিবর্তন এবং সে স্থানে ইসলামী বিধান মত নতুন সমাজের গোড়াপত্তন। ব্যক্তি, সমষ্টি এবং পূর্ণ জনসংখ্যাকে নিয়েই সমাজ। তাই সমাজে ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আবশ্যক।

প্রথম করণীয় ঃ

একটি বিপ্লবকে সফল করার জন্য প্রথম যে কাজটি করা প্রয়োজন। তা হলো, ঐ বিপ্লবী আদর্শের ব্যাপক প্রচার করা। ঐ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে আদর্শের আলোকে বিপ্লবের কথা শুনায় সে সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা নাও থাকতে পারে। তাই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ধারণা নিজেরা ধারণ করে, তা জনগণের বিবেচনার জন্য জনসম্মুখে তুলে ধরা অর্থাৎ মানুষকে ঐ আদর্শের দিকে আহ্বান করা।

জনগণের প্রতিক্রিয়া ঃ

এই আহ্বানে সকল মহলের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া নাও যেতে পারে। এই দাওয়াত সমাজে পৌছানোর পর সমাজের লোক স্বভাবতই দু'টো শিবিরে বিভক্ত হবে। একটি শিবিরে থাকবে যারা এই দাওয়াতকে গ্রহণ করতে চায় এবং সমর্থন করে তারা, আর অন্য শিবিরে থাকবে যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে। মূলতঃ সমাজের সক্রিয় অংশের মধ্যে এ বিভক্তি আসবে। যারা আহ্বানে সাড়া দেবে তারা এই আদর্শের জন্য মেহনত করবে এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। আর অন্য দলটি এটা প্রত্যাখ্যান করবে। এই প্রত্যাখ্যানকারীরা কারা?

কায়েমী স্বার্থবাদী ঃ

সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীরাই মূলতঃ এই আদর্শের বিরোধিতা করবে। স্বার্থবাদীরা হচ্ছে সমাজের ঐ সব নেতা যারা সমাজের বর্তমান কাঠামো থেকে ফায়দা হাসিল করছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজের সকল ময়দান থেকে ফায়দা হাসিলকারীরা। এমনকি ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদীরাও থাকতে পারে। যেসব ধর্মীয় নেতা ধর্মকে ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা এই পরিবর্তন কামনা করে না। কাজেই সকল কায়েমী স্বার্থবাদীই একযোগে বিরোধিতা করবে। কারণ তারা সহজেই বুঝতে পারে যে, এ পরিবর্তন মূলতঃ নেতৃত্বের পরিবর্তন। তারা তাদের সংশ্লিষ্ট ময়দানে নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে শংকিত থাকে। এই পরিবর্তনের (বিপ্লব) ফলে অর্থনৈতিক ময়দানও পরিবর্তিত হতে বাধ্য, কিন্তু যারা বর্তমানে অর্থনৈতিক ময়দান থেকে ফায়দা হাসিল করছে তারা এই পরিবর্তন পছন্দ করতেই পারে না।

www.bjilibrary.com

কোন সমাজই সুসংগঠিত জনশক্তি ছাড়া চলতে পারে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা মূলতঃ তারাই চালায় যারা এই System গুলোকে সংরক্ষণ করে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এজন্যই চলছে যে, এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেখানকার সরকারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ময়দানের নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত সজাগ। কারণ তারা বর্তমান ব্যবস্থায় নিজেদের ফায়দা পূর্ণভাবে আদায় করতে সক্ষম। কাজেই তারা যে কোন ধরনের পরিবর্তন প্রতিহত করবে। একটি পুঁজিবাদী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে ইসলামী আন্দোলন যেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও অবাঞ্ছিত। কারণ দুই আন্দোলনেরই টার্গেট পরিবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তন বর্তমান পুঁজিবাদী নেতৃত্বের বিপক্ষে।

সক্রিয় জনগোষ্ঠীর বিভক্তি ঃ

কোন বিদ্যমান সমাজে যখন কোন নতুন আদর্শ প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং জনগণকে সেই আদর্শের দিকে আহ্বান জানানো হয় তখন সমাজের সক্রিয় জনগোষ্ঠী দু'টি ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়। সাধারণ মানুষ নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবস্থান নিলেও পরবর্তীতে শক্তিশালী শিবিরের দিকেই তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। সাধারণতঃ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সক্রিয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য জরুরী।

পরিবর্তী করণীয়ঃ

কোন বিজ্ঞানসম্মত বিপ্লবের জন্য দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হয় তা হলো-সেই আদর্শে সাড়া দানকারীদেরকে সংগঠিত করা। নতুন লোক(সমর্থক) সংগ্রহ করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া। কোন সামাজিক পরিবর্তন এমনিতেই আসবে না, সে আদর্শ যতই বিজ্ঞানসম্মত বা যথার্থ হউক না কেন। আর সে আদর্শ নিজে নিজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জনশক্তি। কাজেই একদল বিপ্লবীকে অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। আর এই বিপ্লবীদেরকে নেতা ও কর্মী এ দু'সেটে তৈরী করতে হবে। কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রয়োজন পড়বে একটি বিশাল নেতৃত্বের। তারপর প্রতি ক্ষেত্রে দরকার হবে অসংখ্য কর্মীর। এই বিশাল নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য লোক সংগ্রহ (recruit) করে সংগঠিত করতে হবে এবং বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে করে পরবর্তীতে তাদের হাতে ক্ষমতা আসলে তারা তাদের সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারে।

সর্বশেষ করণীয় ঃ

তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে ক্ষমতা দখল। ক্ষমতায় যাওয়া ছাড়া কোন আদর্শেরই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, এমনকি সেটা যদি আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ঐশী আদর্শও হয়। ক্ষমতা অবশ্যই দখল করতে হবে এবং তা পূর্ণভাবেই বিপ্লবীদের হাতে নিতে হবে।

www.bjilibrary.com

যারা বিপ্লবী আর যারা বিপ্লবী নয় তাদের কোয়ালিশন কোন পূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ও জিয়াউল হকের কোয়ালিশন সরকার। এটা কোন ইসলামী সরকার ছিল না। ক্ষমতা পূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনের হাতে না আসা পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়। সুদানেও ইসলামী আন্দোলন নিমেরীর কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়েছিল। এ ধরনের কোন কোয়ালিশন সরকার ইসলামী বিপ্লবের অগ্রগতিকে সহায়তা করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। ইসলামী বিপ্লব কেবলমাত্র তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন পূর্ণ নির্বাহী ক্ষমতা কেবলমাত্র তাদের হাতে আসবে, যারা বিগত দিনে নিজেদেরকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করেছে।

বিপ্লবের তিন দফা কর্মসূচী ঃ

বিপ্লবের তিনটি মূল বিষয় হচ্ছে-আদর্শের ব্যাপক প্রচার, যারা এ আদর্শের আহ্বানে সাড়া দেয় তাদেরকে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা এবং আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতা গ্রহণ। বিপ্লবের এই তিনটি সাধারণ দিক-নাৎসীজম, কমিউনিজম, ফ্যাসীজম; ইসলাম সকল আদর্শের জন্যই জরুরী। কিন্তু বিস্তারিত পর্যালোচনায় বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর মধ্যেই অনেক ব্যবধান লক্ষ্য করা যাবে।

আন্দোলনের দু'টো পর্যায় ঃ

একটি বিপ্লবের দুটো অধ্যায় থাকে। প্রস্তুতির অধ্যায় ও বাস্তবায়নের অধ্যায়। শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ১৩ বছর ধরে মক্কায় যে কাজ করেন সে সময়টাকে আমরা প্রস্তুতির অধ্যায় বলতে পারি। যখন তিনি মদীনায় সরকার গঠন করেন এবং ক্ষমতা দখল করেন, সে সময়কে আমরা বাস্তবায়নের অধ্যায় বলতে পারি। এই দুই অধ্যায়কে আমরা ব্যক্তি গঠন এবং সমাজ গঠন এই দুই নামেও আখ্যায়িত করতে পারি। মক্কায় তের বছরে নবী (সাঃ) ইসলামী সমাজের উপযোগী করে ব্যক্তি চরিত্র গঠন করেন, আর মদীনায় সমাজকে ইসলামের আলোকে রঞ্জিত করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী বিপ্লবের বিজয় সম্পর্কে সূরা নূর-এর ৫৫ নং আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা দান করেছেন।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি দান করেছিলেন তাদের পূর্বদিগকে।" (সূরা নূর-৫৫)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, যদি তোমরা একদল মুমিনীন-সালেহীন তৈরী করতে পার তাহলে তিনি তোমাদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা দান করবেন। অর্থাৎ যদি আসলেই একদল মুমিনীন-সালেহীন তৈরী হয়, যদি আল্লাহ মনে করেন যে, এমন একদল লোক প্রস্তুত হয়ে গেছে যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে তখন তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া আল্লাহর নিজের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। "ক্ষমতায় যাওয়া" নিয়ে আমাদের মাথা ঘামান ঠিক নয়। আল্লাহ নিজেই

www.bjilibrary.com

এটাকে তাঁর দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছেন। তাই যারা ইসলামী বিপ্লবের জন্য কাজ করছে তাদের ক্ষমতার মোহ থাকা ঠিক নয়। তাদের যেভাবেই হোক ক্ষমতায় যেতে হবে এজন্যও উদ্বিগ্ন হওয়া ঠিক নয়। একই আয়াতে যারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তাদের দায়িত্ব যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি আল্লাহর দায়িত্ব তিনি (আল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। যারা এ বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী তাদের দায়িত্ব হলো যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরী করা আর আল্লাহর দায়িত্ব হলো তাদের ক্ষমতায় বসানো– এই দায়িত্ব আমরা আল্লাহকে দিইনি বরং তিনি নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ওয়াদা করেছেন যে, যারাই তার দেওয়া শর্তসমূহ পূরণ করবে আল্লাহ তাদেরই ক্ষমতা দান করবেন।

প্রস্তুতিকালে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সহায়তা করবেন। কিন্তু বিপ্লবীদের মূল দায়িত্ব হলো সন্তোষজনকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া। আল্লাহ কিন্তু এ ওয়াদা করেননি যে, তিনি নিজেই একদল মুমিনীন সালেহীন তৈরী করবেন। এটা তাঁর দায়িত্বও নয় এবং তিনি এটা তাঁর দায়িত্ব হিসেবেও নেননি।

আল্লাহ এটাও বলেননি যে, তিনি নিজেই লোকদেরকে এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে বিপ্লব উপযোগী করবেন। বরং আল্লাহর ওয়াদা হলো, তোমরা এ কাজগুলো সন্তোষজনকভাবে যোগ্যতার সাথে কর, তাহলে আমি তোমাদের ক্ষমতা দান করব।

রাসূলের পদ্ধতি ঃ

এ ধারণাকে সামনে রেখে আমরা ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা, মানবতার মুক্তিদূত শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রয়োগকৃত পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করব। আমরা ইসলাম তাঁর কাছ থেকেই জেনেছি। কিন্তু তাঁর পদ্ধতি কি ছিল? আমরা কি অন্য কোন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করতে পারি? আল্লাহই তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবং সেই আল্লাহই তাঁকে ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

কাজেই ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতিও তার জীবনচরিত থেকেই শিখতে হবে। আমাদের নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। অন্যদের কাছ থেকে নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা, ইসলামী বিপ্লবের শাশ্বত নেতা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন থেকেই আমাদেরকে ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি শিখতে হবে

তিনি প্রথমে কি করেন ঃ

তিনি সর্বপ্রথম মানুষকে একটি আদর্শের দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি বিশেষ কোন শ্রেণীর যেমন-রাজনীতিক বা অর্থনৈতিক এলিট ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান করেননি, বরং তাঁর আহ্বান ছিল সার্বজনীন। তিনি এই বলে মানুষকে আহ্বান করেছেন—

"হে আমার কাউম, আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই"। (আল আরাফ-৫৯)

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন রাসূলদের নাম দিয়েই এ আহ্বান শুরু হয়—

"আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কাউমের নিকট এবং সে বলেছিল হে, আমার কাউম, আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই"- সূরা আল-আরাফের ৮ম রুকুর প্রথম আয়াত। পরবর্তী রুকুতে অন্য নবী, তার পরের রুকুতে আর এক নবী। এভাবে সব নবীই একই ভাষায় আহ্বান করেছেন।

"হে আমর লোকেরা আল্লাহকে গ্রহণ কর তোমাদের প্রভু হিসাবে (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) এবং তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

চির গতিশীল আহ্বান ঃ

এই আহ্বান চির গতিশীল। তিনিই একমাত্র প্রভু যাকে ব্যক্তি জীবনে, অর্থনৈতিক ময়দানে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সকল ক্ষেত্রেই মানতে হবে। এটা একটি বিপ্লবী দাওয়াত, আনুগত্য শুধু তাঁরই প্রাপ্য। যারা এই বিপ্লবী আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তারা ঘোষণা করেছিল-

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা বলতে চেয়েছিল—

আমরা এই আদর্শ গ্রহণ করেছি, এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করি না এই আহ্বান বা দাওয়াত কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য ছিল না বরং ধনী-গরীব, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সেক্যুলার সকল স্তর থেকেই আহ্বান সাড়া পেয়েছিল।

দ্বিতীয়ত তিনি যা করেন ঃ

যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তিনি তাদেরকে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সংগঠিত করেছেন। সূরা শুয়ারার ৬ষ্ঠ রুকু থেকে বিভিন্ন রাসূলের দাওয়াতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা মানুষদেরকে আহ্বান করতেন এবং যারা সাড়া দিত তাদেরকে নিজেদের নেতৃত্বের অধীন নিয়ে আসতেন। যেমন তাঁরা একই দাওয়াতের দিকে আহ্বান করতেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তেমনি তাঁরা একইভাবে লোকদের সংগঠিত করতেন। আর তাঁদের ভাষা ছিল—

"আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"

এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে যারা ইসলামে এসেছে তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহ-ভীতির মধ্যে জীবন যাপন করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। এবং অবশ্যই তা রাসূলের নেতৃত্বাধীন হতে হবে এবং তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। আর এটাই সংগঠন।

বিপ্লব গড়ে তোলার পদ্ধতি ঃ

সংগঠনের যাত্রার শুরুর মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ার কাজ শুরু করে দিলেন। কেমন করে তিনি তাদের তৈরী করলেন?

www.bjilibrary.com

কুরআনে এই ইতিবাচক কাজের জন্য চারটি আয়াত আছে। লোকদেরকে বিপ্লবের জন্য তৈরী করা হয়েছিল এবং তারা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ভাবেই প্রশিক্ষিত হয়েছিল।

চার দফা ইতিবাচক কর্মসূচী ঃ

কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারাহ ১২৯ এবং ১৫১ সূরা আলে ইমরান ১৬৪ এবং সূরা আল জুমুআর ২ নং আয়াতে এই চার দফা ইতিবাচক কর্মসূচী পাওয়া যায়।

"তিনি সে সত্তা যিনি উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত অথচ এর পূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।" (জুমুআ)।

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী হিসেবে লোক তৈরীর চারটি ইতিবাচক কর্মসূচী উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম দফা ঃ

পহেলা কাজ হচ্ছে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে যেমনভাবে জিবরাইল (আঃ) শিখিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে। কুরআন তিলাওয়াত কেবল অন্যের জবান থেকে শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে। কোন বই থেকে নয়। মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজে জিবরাইল (আঃ) এবং সাহাবাগণ নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে কুরআন শিখেছিলেন। কাজেই আমরা কুরআন পড়া অন্যের জবান থেকেই কেবল শিখতে পারি, কোন বই থেকে নয়। আপনি কোন বই দেখে 'আলিফ' এবং 'আইন' 'যা' এবং 'খা' এর উচ্চারণ শিখতে পারবেন না। কিন্তু জবানের মাধ্যমে তা সম্ভব। কাজেই জনগণকে তারতিলের সাথে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়াও ছিল চারটি ইতিবাচক কাজের একটি।

দ্বিতীয় দফা ঃ

২য় দফা সব আয়াতগুলোতে একভাবে দেওয়া নেই। সূরা জুমুয়াতে ২য় দফা হিসেবে থাকলেও অন্য আয়াত তিনটিতে এটা চতুর্থ দফা হিসেবে দেখা যায়। চতুর্থ বা ২য় যেটাই হোক না কেন প্রত্যেকটি আয়াতেই তা আছে।

স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমরা এখানে দ্বিতীয় দফা হিসেবে 'ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা'র আলোচনা করব। প্রথম দফা হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত কিন্তু কোরআন তিলাওয়াতই যথেষ্ট নয়। আরবের লোকেরা আরবী ছিল কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করলেই কুরআন বুঝে ফেলত। তাই রাসূলের উপর স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত আর একটি দায়িত্ব এও ছিল যে, জনগণকে বিস্তারিতভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়া। আজকের আধুনিক আরবের লোকেরাও কুরআন তিলওয়াত করে কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তারা কুরআনের অর্থ বুঝে। কুরআনের অর্থ স্বতন্ত্র বিষয় যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং রাসূলের আবশ্যকতা ছিল।

তৃতীয় দফা ঃ

তৃতীয় দফা হচ্ছে তিনি (রাসূল সাঃ) তাঁদেরকে (সাহাবা) 'হিকমাহ' শিক্ষা দিয়েছিলেন। হিকমাত কি? রাসূল (সাঃ) নিজেই হাদীসে হিকমাত শব্দের স্পষ্টতা তুলে ধরেছেন।

www.bjilibrary.com

'দ্বীন সম্পর্কে সঠিক সমঝই হচ্ছে হিকমাত'। জীবনকে ইসলামের আলোকে পরিচালিত করতে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞানকেই হিকমাহ বলে। রাসূল (সাঃ) সাহাবাগণকে শুধু কুরআন শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং কুরআনকে কিভাবে মেনে চলতে হবে তাও শিখিয়েছেন।

চতুর্থ দফা ঃ

এখন চার দফা ইতিবাচক কর্মসূচীর চতুর্থ দফাটি কি? "তিনি তাদের বিশুদ্ধ করেছিলেন।" বিশুদ্ধতার অর্থ কি? যাকাত মানে বিশুদ্ধ করা, যাকাতের আর একটি অর্থ হচ্ছে-উন্নয়ন বা বৃদ্ধি। সাহাবাদের জীবনকে পুংখানুপুংখ রূপে লক্ষ্য করাও রাসূলের দায়িত্ব ছিল আর এটা ছিল ৪র্থ দায়িত্ব। তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং যখনই কোন ত্রুটি লক্ষ্য করতেন সাথে সাথে তা ঠিক করে দিতেন। আমরা কাওলী ও ফে'লী হাদীসের পর তৃতীয় প্রকারের হাদীস অর্থাৎ তাকরীর হাদীসসমূহে এ শিক্ষা দেখতে পাই। তিনি যদি সাহাবা কিরামের বাস্তব চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখতেন তাহলে তাদের ত্রুটিগুলো কিভাবে ধরতেন? আর এটাই হচ্ছে "তাওয়াজ্জুহ' অর্থাৎ তাঁদের (সাহাবা) প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো ধরার পর শোধরানোর এই প্রক্রিয়াকেই 'তাযকিয়া' বলা হয়।

এই চারটি ইতিবাচক কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি তাদের মানসিকতা, চরিত্র এবং বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করে আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে তৈরী করেছিলেন।

নেতিবাচক প্রশিক্ষণ ঃ

নেতিবাচক প্রশিক্ষণ কি? আমরা জানি যে, বিরুদ্ধবাদীরা নবুয়াতের তৃতীয় বছরের শেষে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের উপর নির্যাতন শুরু করেছিল এবং সাথে সাথে তারা রাসূলের বিরুদ্ধে জনগণের মাঝে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়েছিল। নবুওয়াতের ৫ম বছরে তারা রাসূলের সহযোগীদের উপর নির্যাতন শুরু করে। ফলে অনেকে হিজরত করেন। যাঁরা মানসিকভাবে একটু দুর্বল ছিলেন তাঁরা ঘাবড়ে গেলেন। আর যাঁরা কঠিন শপথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করলেন। নবুয়াতের ৫ম বছরে যখন নির্যাতন শুরু হল তখনই নাযিল হয় সূরা আল আনকাবুত।

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।" (সূরা আল আনকাবুত ২-৩)

অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনকে অনৈসলামিক শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুকাবিলা করতে হবে। যারা বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে ভীত, যারা পুলিশের ভয়ে ভীত, যারা শত্রুর যে কোন হামলার আশংকায় আশংকিত তারা এই আন্দোলনের মোটেই উপযোগী নয়। এটা প্রশিক্ষণেরই একটা অংশ। সাহস ও ধৈর্যের সাথে বিরোধিতার মুকাবিলা করার শিক্ষা রাসূল সাহাবী (রাঃ)দেরকে দিয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) রাসূলের

www.bjilibrary.com

কাছে হিজরতের অনুমতি নিয়েছিলেন কিন্তু তারা মুহূর্তের জন্যও ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাননি।

রাসূল নিজে অনেক পরে হিজরত করেছিলেন। হিজরত শুরু হয়েছিল নবুয়াতের পঞ্চম বছরে। আর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে নবুয়াতের ১৩তম বছরে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের এই নির্দেশ ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা। এই পরীক্ষা অবর্ণনীয় দুর্দশা ও যন্ত্রণা-নির্যাতন, আন্দোলন ও প্রশিক্ষণেরই অপরিহার্য অংশ। এ ধরনের বিরোধিতা-পরীক্ষা ও ধৈর্য ছাড়া আন্দোলনের উপযোগী কর্মী নির্বাচন অসম্ভব।

কেমন করে বিপ্লবী (Revolutionaries) পাওয়া যাবে?

ঐ কারণেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যে সমাজে ঐ আদর্শ চালু নেই সে সমাজেই, সে আদর্শের খাঁটি কর্মী পাওয়া সম্ভব। কোন ইসলামী সমাজে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী খাঁটি ব্যক্তি বের করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু একটি অনৈসলামিক সমাজে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী কর্মী বের করা সহজ। নবুয়াতের ২১তম বছরে এবং ৮ম হিজরীতে যখন মক্কা বিজয় হল তখন মক্কায় ইসলামের কোন বিরোধী ছিল না। তখন দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়।

"হে নবী! তুমি দেখবে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে।"

কাজেই সে সময়ে এটা বুঝা বেশ কষ্টকর ছিল যে, কারা ইসলামের কারণেই দলে এসেছিল আর কারা জানমালের নিরাপত্তার জন্য বিজয়ী দলে যোগ দিয়েছিল।

যখন ইসলাম কোন দেশের আইনে পরিণত হয় তখন তার বিরোধিতা করার সাহস কেউ দেখায় না। তাই যারা ইসলামের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত নয় তারাও নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে। অনেকে ইসলামী সমাজ থেকে সুবিধাদি আদায়ের নিমিত্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে সমাজে ইসলাম চালু নেই সেখানে ইসলাম গ্রহণ করা সহজ নয় এবং সেখানে সহজেই পরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশার মাধ্যমে উপযোগী মানুষ বেছে নেয়া যায়। কেবলমাত্র একটি অনৈসলামিক সমাজেই দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও উৎসর্গীকৃত মানসিকতা সম্পন্ন কর্মী বেছে নেওয়া সহজ। আর যারা দুর্বলচিত্ত এবং স্বার্থবাদী তারা সহজেই এবং স্বাভাবিকভাবেই এ আন্দোলন থেকে সরে পড়ে। তারা বিপ্লবের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। ১৩ বছরে কষ্ট ও নির্যাতনের মাধ্যমে মক্কায় যোগ্য লোক তৈরী হয়েছিল। লোক তৈরীর জন্য এই নেতিবাচক কর্মসূচী জরুরী। আর শেষ পরীক্ষাটি ছিল হিজরতের নির্দেশ। কারা হিজরত করেছিল একথা সহজেই অনুমেয়। যারা নিজেদের সহায় সম্পত্তিকে ইসলামের চেয়ে বেশী ভালবেসেছিল তারা হিজরত করতে পারেনি। আর যারা তাদের আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতাকে ইসলাম অপেক্ষা বেশী ভালবেসেছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি এবং এ কারণেই কেউ কেউ হিজরতের চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও অকৃতকার্য হয়েছিল। আর যাঁরা হিজরত করেছিলেন তাঁরা একথা প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁদের কাছে সহায় সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, ভাই, পুত্র,

www.bjilibrary.com

স্ত্রী, কন্যা, মাতা-পিতা এমনকি নিজ জন্মভূমিও গৌণ বরং ইসলামই মুখ্য। আর তাঁরাই প্রকৃত বিপ্লবী সৈনিক। কারণ তাঁরা ইসলামকেই বেশী ভালবেসেছেন এবং ইসলামের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কোন কিছুর জন্য ইসলামকে উৎসর্গ করতে পারেননি। তাঁরা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য ইসলাম ত্যাগ করতে পারেননি বরং ইসলামের জন্য দুনিয়াবী স্বার্থের মোহ ত্যাগ করতে পেরেছেন। আর যখন এ ধরনের মানুষ ক্ষমতায় আসে, তখন তারা আত্মীয় তোষণের দোষে দুষ্ট হবে একথা কি কল্পনায় আসে ? যারা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-সন্তান এমনকি জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করতে পারেন পরবর্তীতে অন্যের হক নষ্ট করে তাদের আত্মীয়-স্বজন, ছেলে সন্তানকে অন্যায়ভাবে তোষণ করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব ?

যারা নিজেদের উপার্জিত সম্পদ, নিজেদের সহায় সম্পত্তি বাড়ী-ঘর উৎসর্গ করে তারা কি কখনও ক্ষমতার জন্য লালায়িত হতে পারেন অথবা সরকারী ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে সম্পদ লাভের জন্য ব্যবহার করতে পারেন? এ ধরনের উৎসর্গীকৃত মানুষ ইসলামী বিপ্লবের জন্য জরুরী। এ ধরনের মানুষ যখন পাওয়া যায় আল্লাহ তখনই তাদের হাতে ক্ষমতা দান করেন। মুহাম্মদ (সাঃ) যখন হিজরত করেন তখন তাঁকে গোপনে যেতে হয়েছিল। তিনি প্রকাশ্যে মক্কা থেকে চলে যেতে পারেননি। রাত্রির শেষভাগে অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি জানতেন না যে, সরকার গঠনের একটা সুযোগ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ইতিহাস একথা বলে না যে, তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন "আবু বকর-চিন্তা কর না আমরা মদীনায় যাচ্ছি এবং সেখানে আমাদের জন্য শাসন ক্ষমতা অপেক্ষা করছে যার নেতৃত্ব আমরাই দেব।"

বস্তুতঃ যখন আত্মোৎসর্গী একদল নেতা ও জীবন উৎসর্গকারী বিশাল কর্মীবাহিনী তৈরী হয় তখন আল্লাহ ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে দেন। আর এটাই হলো ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি। সন্ত্রাসকে কোন নবীই গ্রহণ করেননি এবং এ ব্যাপারে আমরা একটি উদাহরণও পাই না। কুরাইশরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ইসলামী দাওয়াতের এক পর্যায়ে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল। তিনি কি তা নিয়েছিলেন? তারা বলেছিল, "তোমার এই নতুন আদর্শ ত্যাগ কর, এর পরিবর্তে যদি তুমি শাসক হতে চাও আমরা তাও করে দেব। যত খুশী সম্পদ চাও, আমরা দেব। কোন সুন্দরী নারী চাও-আমরা তাও দিতে প্রস্তুত।" অর্থাৎ তারা তাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান সমস্ত জিনিস তাঁকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা নেননি। কেউ হয়তো চিন্তা করতে পারে যে, ক্ষমতায় যেয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যেতো। কিন্তু রাসূলের নিকট এটা স্পষ্ট ছিল যে, এ ধরনের কোন বিপ্লব সাধন করা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অনেক সহযোগী। প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক গণ-মানুষ। তাই এই বিরাট দল তৈরির জন্য প্রয়োজন সময়ের। আর প্রস্তুতি ছাড়া ক্ষমতায় গেলে বিপর্যয় হবে, ফলে পরবর্তীতে নতুন করে আন্দোলন সৃষ্টি করতে আরও অনেক বছর বেশী সময় লেগে যাবে।

www.bjilibrary.com

সফলতার দু'টি শর্ত ঃ

এখন এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) লোক তৈরী করলেন মক্কায়। কিন্তু মক্কায় সরকার গঠন করলেন না কেন? আর কেনই বা মক্কায় ইসলামী সরকার গঠন করা সম্ভব হলো না? কেন তাঁকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে হলো?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ইসলামী সরকারের জন্য লোক তৈরী একমাত্র শর্ত নয়, অন্য শর্তও আছে। যারা ইসলামী শাসন চায় না, আল্লাহ তাদের উপর ইসলামী শাসন জোর করে চাপিয়ে দেন না। ইসলাম আল্লাহর সর্বোত্তম নিয়ামত। আল্লাহ তাঁর নিয়ামত কাউকে জোর করে দেন না। মক্কার কুরাইশ জনগণ ইসলামের চরম বিরোধিতা করত। এমনকি স্বয়ং রাসূলের জীবনও শংকামুক্ত ছিল না। কিন্তু মদীনায় এ পরিস্থিতি ছিল না। হিজরতের এক বছর পূর্বে আওস ও খাজরাজ নামে দুটো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই দুই গোত্রের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সংগোপনে মিনায় হজ্জের সময় তাদের আনুগত্যের শপথ ঘোষণা করেছিল। যদিও মদীনার সবাই ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু মদীনার সাধারণ জনগণ ইসলামের সক্রিয় বিরোধী ছিল না। এটাই হচ্ছে ২য় শর্ত যা ইসলামী বিপ্লবকে সফল করতে প্রয়োজন।

যদি কোন দেশে ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন থাকে তাহলে সেদেশে এই শর্তটি পূরণ করা বেশ সহজ। সব মানুষের সমর্থন জরুরী নয় বরং শর্ত হলো যেন বিরোধিতা প্রবল না হয়। বিরোধিতা তেমন না হলে ২য় শর্তটি পূরণ করা সহজ যদি জনগণ ইসলামী আদর্শ মেনে নেয়, তাহলে সেখানে ২য় শর্তটি পূরণের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক বলে ধরে নেওয়া যায়।

বাংলাদেশের অবস্থা ঃ

আমি আমার বক্তব্য এ আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ করতে চাই যে, বাংলাদেশে ২য় শর্তটি সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। অথচ এই শর্তটিই নবীর নিজ জন্মভূমিতে সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল না। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রথম শর্তটি পূরণ করতে এখনও অনেক বাকী। আমরা এই শর্তটি পূরণের চেষ্টা করছি এবং এটাই আমাদের মূল দায়িত্ব। প্রথম শর্তটি পূরণ করাই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের মূল দায়িত্ব। আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, কতদিনে আমরা এ শর্ত পূরণ করতে পারব বা কখন বুঝব যে, এ শর্ত পূরণ হয়েছে। উত্তরে বলব-"আল্লাহ যখন আমাদের ক্ষমতায় দেওয়ার উপযুক্ত মনে করবেন এবং কেবল তখনই বুঝব যে,শর্ত পূরণ হয়েছে। আর আল্লাহ যতদিন ক্ষমতা দেবেন না ততদিন বুঝে নিতে হবে যে, আমাদের প্রস্তুতি এখনও সম্পন্ন হয়নি।"

আল্লাহ আমাদের ইসলামী বিপ্লবের এই শাশ্বত ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মপদ্ধতিকে বুঝার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার তৌফিক দিন। আমিন।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

আজ দুনিয়া জোড়া ইসলামী জাগরণের সাড়া পড়েছে এবং বিভিন্নভাবে ইসলামের খেদমতও যথেষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশও একেবারে পেছনে পড়ে নেই। এদেশে যারা ইসলামের দরদ রাখেন তারা নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। এসব খেদমত আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে বিজয়ী করার ব্যাপারে সহায়ক হলেও এসব দ্বারা আপনিতেই ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন এমন একটি সুপরিকল্পিত ইসলামী আন্দোলন যা আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও মূলতঃ বিশ্ব নবীকে নিষ্ঠার সাথে অনুকরণ করবে। এর জন্য দুটো কাজ বুনিয়াদীভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ ইসলামকে আসল রূপে পরিবেশন করা এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ ইসলাম মোতাবেক লোক তৈরি করা। এ দু'দিকেই আল্লাহর শেষ নবীর (সঃ) আদর্শই চূড়ান্ত। রাসূলের (সঃ) বাস্তব জীবনই ইসলামের প্রকৃত রূপ। সাহাবায়ে কেরাম সে রূপেরই অনুসরণ করেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে তাদেরকে চূড়ান্ত আদর্শ মেনে না নিয়ে ইসলামের প্রকৃত রূপ কিছুতেই ধারণায় আসতে পারেনা।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ঐ মহান আন্দোলনেরই অনুসারী। তাই জামায়াতের সামনে উপরোক্ত দুটো বুনিয়াদী কাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর কোরআনকে রাসূলের (সঃ) বাস্তব জীবন থেকেই পেশ করে। রাসূলের জীবনকে সামগ্রিকভাবে কোরআনের বাস্তবরূপ হিসেবে পরিবেশন করাই জামায়াতের লক্ষ্য। এ জন্য কোরআন ও সুন্নাহকে সরাসরি অধ্যয়ন করার জন্য জামায়াতের কর্মীদের উপর এত চাপ দেয়া হয়। ইসলামের কোন একাংশের খেদমত বা রাসূলের (সঃ) জীবনের কোন এক দিকের চর্চা করা দ্বারা দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

রাসূলের প্রদর্শিত ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একদল আদর্শবাদী লোক তৈরি করা। এমন এক দল লোক তৈরি হওয়া অপরিহার্য যারা ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবে এবং যাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ জন্যই ইসলামী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র (ইলম ও আমল) সৃষ্টির আন্দোলন। এমন ধরনের একদল লোক তৈরী হলেই আল্লাহ পাক তাদের হাতে ইসলামের বিজয় দান করার ওয়াদা করেছেন। যারা ইসলামকে সঠিকভাবে জানে এবং নিজেদের জীবনে নিষ্ঠার সাথে মানে একমাত্র তাদের দ্বারাই ইসলাম বিজয়ী হতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে যারা জড়িত তারা দেশের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন তাদেরকে বিশেষভাবে নিজেদের জীবনকে অন্যের জন্য অনুকরণযোগ্য বানাবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে প্রধান করণীয় বিষয়গুলোর প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার ঐকান্তিক আশা নিম্ন বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে ঃ

www.bjilibrary.com

১) সর্বপ্রথম তাদেরকে জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রয়োজনীয় রুজী রুজগার করতে হবে। কিন্তু বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি? একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যই এ জীবন। তাই মুমিনের জীবনে ইসলামী আন্দোলন অনেক দায়িত্বের একটি নয়, এমনকি প্রধান দায়িত্বও নয়, বরং একমাত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্বের অঙ্গ হিসেবেই নিজের স্বাস্থ্য ও পারিবারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২) এ মহান দায়িত্ব একা পালন করা সম্ভব নয় বলেই জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামীতে আন্তরিকভাবে শরীক হতে হলে নিজের পূর্ণ সত্তাকে জামায়াতের নিকট সমর্পণ করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) পথ থেকে জামায়াত বিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সিদ্ধান্তকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। নিজের মরযির বিপক্ষে হলে জামায়াতের সিদ্ধান্ত অমান্য করার প্রবৃত্তি যার তিনি প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবাদী মনোভাব নিয়েই জামায়াতে এসেছেন। এমন লোক কখনও জামায়াতে টিকে থাকতে পারে না।

৩) আল্লাহর ওয়াস্তে যদি ইসলামী আন্দোলনে সামিল হয়ে থাকেন তা হলে ব্যক্তি জীবনকে ইসলামের নমুনা বানানোর জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামাজ আদায় করতে এবং সপ্তাহে মাঝে মাঝে শেষ রাতে উঠতে হবে। আর পরিবারের সদস্যসহ সকল মানুষের সাথে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ঘরে বাইরে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকাই নিজকে এ পথে মজবুত করার একমাত্র উপায়। দাওয়াতে দ্বীনের এ কাজই দায়ী ইলাল্লাহকে নিজের জীবনেও সত্যিকার মুসলিম বানায়।

৪) এ পথে যতভাবে যত ধরনের বাধা বিপত্তিই আসুক অধ্যবসায় (ছবর) ও দৃঢ়তার সাথে আন্দোলনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এ পথে কোথাও থেমে থাকার উপায় নেই। থামলেই এ পথ থেকে অপসারিত হবার আশংকা। প্রতিটি বাধাই এ পথের পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে যারা পরীক্ষা মনে করেও বাধাকে জয় করতে চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত পারিবারিক বা অন্যান্য বাধাকে যারা অজুহাত বানিয়ে আন্দোলনের কাজকে কম গুরুত্ব দেয় তারা ক্রমেই পেছনে যেতে থাকে এবং এক সময় আল্লাহ তাদেরকে আন্দোলন থেকে উৎখাত করে দেয়। তারাই পরীক্ষায় ফেল হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫) ইসলামী আন্দোলনে অন্যান্য সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবার পরও শয়তান তাদের পেছনে লেগেই থাকে যাতে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। এ ব্যাপারে মানুষের সবচেয়ে দুর্বল দিক দিয়েই শয়তান হামলা করে। ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত। কোন এক সময় যখন এ মর্যাদাবোধের উপর পরীক্ষা আসে তখন কম লোকই উত্তীর্ণ হতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তি যাদের চরম লক্ষ্য এবং এ বিষয়ে যারা সদাসতর্ক একমাত্র তারাই এ ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

www.bjilibrary.com

হতে পারে। "আমার ঐ মর্যাদা বহাল থাকা উচিত, বা আমাকে উপযুক্ত পজিশন দেয়া হয়নি বা আমাকে অবহেলা করা হয়েছে ইত্যাদি" ধরনের চিন্তা মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে শয়তান অতি সহজেই আন্দোলনের অনেক অগ্রসর লোককেও ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ পাক সবাইকে হেফাজত করুন ও এ পথে মজবুত থাকার তৌফিক দান করুন।

[সংবাদ সাময়িকী নামে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রচারিত ১৯৮০ সনে ২৫শে জানুয়ারির বুলেটিনে প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবেন

ইসলামী আন্দোলনের সহকর্মী ভাইবোনেরা ! আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মানুষ হিসেবে আমাদের উপর আল্লাহপাক যত নেয়ামত বর্ষণ করেছেন তারই শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদেরকে যে মুসলমানের ঘরে পয়দা করেছেন সে নেয়ামতের মূল্য তো আরো বেশী। যদি আমরা মুসলমান পিতামাতার ঘরে পয়দা না হতাম তাহলে কি চেষ্টা করে ইসলাম কবুল করার ভাগ্য আমাদের হতো? আমরা মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছি অথচ আমাদেরকে সত্যিকার মুসলমান বানাবার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এত রকম ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমাদের জীবনকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত হাজির হওয়া এবং বৈঠকে দ্বীনী কাজের সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেয়ার ব্যবস্থা করে জামায়াতে ইসলামী যে মহাসুযোগ দিয়েছে সেটাকে আল্লাহর এক বড় নেয়ামত মনে করা উচিত।

আল্লাহপাক আমাদের মতো কিছু লোককে জামায়াতে ইসলামীর মারফতে দ্বীন ইসলামের যে সঠিক ধারণা দান করেছেন সেটা কি দুনিয়ার সবচাইতে বড় নেয়ামত নয়? কত হাজার হাজার উলামা পর্যন্ত দ্বীন ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করছেন। কোটি কোটি মুসলমান নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাতের মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুয়াতের ২৩ বছরে নামাজের ইমামতি থেকে নিয়ে দেশ শাসন পর্যন্ত যা কিছু তিনি করছেন এর সবটুকুই যে দ্বীন ইসলাম এবং এর কোন একদিক বাদ দিয়ে যে পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা হতে পারে না সে কথা বহু খাটি দ্বীনদার লোকও বুঝে না। জামায়াতে ইসলামী রাসূলের শিখানো ইসলামের সবটুকুই বাস্তবে কায়েম করতে চায়। ইসলামের এ ব্যাপক ধারণা যে কত বড় নেয়ামত এর শোকরিয়া আমরা কি করে আদায় করব? ইসলাম সম্পর্কে ধারণাই যদি সঠিক না হয় তাহলে আমল তো হতেই পারে না। এ জন্যই দ্বীনের ইলম হাসিলের চেষ্টা করা সব ফরজেরই প্রাথমিক ফরজ।

যাদেরকে আল্লাহ পাক জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবার তৌফিক দিয়েছেন তারা যদি এ বিরাট নেয়ামতের কথা স্বীকার করেন তাহলে এ শুকরিয়া স্বরূপ দু'টো কাজ করতে হবেঃ প্রথমতঃ জীবনের সব কাজে দ্বীন ইসলামকে মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের চার পাশে যত মানুষ আছে তাদের নিকট দ্বীনের এ নেয়ামত পৌঁছাতে হবে। আমরা দ্বীনের আলো নিজে নিজেই পাইনি, জামায়াতের কোন ব্যক্তির মারফতেই এ নিয়ামতের সন্ধান পেয়েছি। আমরা সামান্য কতক লোকই এ পথ চিনবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কোটি কোটি লোকই তো অন্ধকারে পড়ে আছে। তাদের কাছে যদি আমরা আলো না পৌঁছাই তাহলে তারা কোথা হতে দ্বীনের এ ব্যাপক ধারণা পাবে?

www.bjilibrary.com

আমরা যদি সত্যিকারভাবে দ্বীন ইসলামের মূল্য বুঝতাম এবং যে জামায়াতের মাধ্যমে ইসলামের এ সঠিক ধারণা পেয়েছি সে জামায়াতের মর্যাদা দিতাম, তাহলে অন্যান্য মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য এবং তাদেরকে জামায়াতে শামিল করার জন্য তেমনি পাগল হতাম যেমনি আল্লার রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পাগল হয়েছিলেন। দুনিয়ার কোন কাজই হালকাভাবে সমাধা করা যায় না। কেউ টাকার পাগল, কেউ জমির পাগল, কেউ ক্ষমতার পাগল। যে যার পাগল নয় সে তা পেতে পারে না। আমরা যদি দ্বীনের পাগল না হই তাহলে কি করে দ্বীন বিজয়ী হবে?

প্রকাশ্য ময়দানে বেশ কয়েক বছর জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপক দাওয়াতী কাজ না হওয়ায় জামায়াতের কিছুসংখ্যক পুরানো লোকের মধ্যেও কেমন যেন একটা জড়তার ভাব রয়ে গেছে। এরই জন্য দাওয়াতী সপ্তাহ ও সাংগঠনিক পক্ষ ইত্যাদি পালন করতে হচ্ছে। আমাদের সবার মধ্যে যে কর্মচাঞ্চল্য থাকা দরকার আমাদের মনমগজে এ কাজের যে নেশা থাকা প্রয়োজন, চোখে মুখে যে বিপ্লবী চেতনা ফুটে উঠা উচিত তা হাসিল করতে হলে আমাদের অন্তরে ঐ পেরেশানী সৃষ্টি হতে হবে যার পরিচয় রাসূল ও সাহাবাদের মধ্যে ছিল।

ইসলামী বিপ্লব মুখের কথায় কামিয়াব হয়ে যাবে না। আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নবীর সাফায়াতের কাঙ্গাল হই তা হলে বর্তমান ঢিলা ঢালা আন্দোলনে তা কখনো পাব না। হাশরের ময়দানের কঠিন দিনে আল্লার রাসূলের সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না। আমাদেরকে তিনি তার উম্মত বলে সুফারিশ যেন করেন সে আশা যদি করি তাহলে তার জীবন থেকে মানব দরদের সবক নিতে হবে। মানুষ কিভাবে আল্লাহর পথে আসবে, সমাজ থেকে অন্যায় কি করে দূর করা যাবে, অশান্তির সব কারণ খতম করে কেমন করে সমাজে শান্তি কায়েম করা সম্ভব হবে এ নিয়ে আজীবন তিনি যে দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন সে দরদের কিছুই যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে কি করে আমরা রাসূলের শাফায়াতের আশা করবো? আজ আমাদের বড় অভাব ঐ দরদ ও পেরেশানীর। মানুষের হেদায়েতের নেশায় পাগল হওয়ার অভাবই আমাদের বড় অভাব।

ঘরসংসার, জমিজমা, ব্যবসা ও চাকরি বাকরির নেশায় রাতদিন আমাদের সময় কম ও টাকা পয়সা খাটিয়ে সামান্য যা বাচে ঐটুকু সময় ইসলামী আন্দোলনকে খয়রাত করে চাঁদা দেওয়ার মত জামায়াতকে সামান্য কিছু ভিক্ষা দিয়ে এবং মাঝে মাঝে অবসর পেলে কিছু শ্রম দান করে আমরা যেভাবে দ্বীনের বিজয় আশা করছি তা বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে রীতিমতো ঠাট্টা করার শামিল। যদি দ্বীনের বিজয় আমরা চাই তাহলে ইসলামী আন্দোলনকে দুনিয়ার জীবনে চরম উদ্দেশ্য বানাতে হবে। তবেই আখেরাতের পরম লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে। আমরা রুজি রোজগার করব ও সংসারধর্ম চালাব বেঁচে থাকার গরজে। কিন্তু বেঁচে থাকব কী উদ্দেশ্যে? আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। দুনিয়ার

www.bjilibrary.com

আর সব কাজ এ উদ্দেশ্যের উপকরণ মাত্র। তাই এ কাজের জন্যই আমাদেরকে বাঁচতে হবে এবং এ পথেই আমাদের মরতে হবে। আমাদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সৃষ্টি করতে হলে আল্লাহর রাসূলকেই আদর্শ হিসেবে সামনে রাখতে হবে। আমাদের মধ্যে যে অগ্রসর কর্মী সেও আসল মানের বহু নীচে। যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামায়াতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও আসল আদর্শ নয়। নেতা ও কর্মী সবার জন্যই রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামই প্রেরণার উৎস ও অনুকরণের আদর্শ নমুনা। তাই আজকে আপনাদের নিকট এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কথা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

আল্লাহ পাক বিশ্বের সবকিছুকেই সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি মানুষকেই বেশী ভালবাসেন। তাই মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখময় ও আখেরাতের জীবনকে শান্তিময় করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী রাসূলগণ কথায় ও কাজে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপনের নমুনা পেশ করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে হাদী বা পথপ্রদর্শক বলা হয়। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। বিশ্বনবী মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য এত কষ্ট কি করে সহ্য করলেন? মা যেমন সন্তানের জন্য হাসিমুখে এত কষ্ট করতে পারে তেমনি আল্লাহর রাসূল মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলেই তাদের মঙ্গলের জন্য এমন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। যে মানুষকে আল্লাহ পাক এত ভালবাসেন সে মানুষ যদি তার পথে চলে তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই খুশী হন। আর যার চেষ্টায় মানুষ সুপথে আসে তার উপর তিনি সবচাইতে বেশী খুশী হন। তাই মানুষকে সুপথে আনার জন্য যে যত বেশী ব্যস্ত আল্লাহ পাক তার উপর তত বেশী সন্তুষ্ট।

আল্লাহর এ সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষের হেদায়াতের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। মানুষের জন্য তার এত দরদ ছিল যে, মানুষ তার কথা মতে আল্লাহকে মনিব বলে স্বীকার না করলে তিনি মনে চরম ব্যথা বোধ করতেন। এমনকি আল্লাহ পাক নিজে রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন "এরা ঈমানদার হচ্ছে না বলে কি তুমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে ফেলবে।" কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে যে, হে নবী! তোমাকে শুধু বুঝাবার দায়িত্বই দিয়েছি। দ্বীন কবুল করাবার কোন দায়দায়িত্ব তোমার উপর নেই। হেদায়াত কবুল করা বা না করা মানুষের দায়িত্ব। এতসব সান্ত্বনা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষের কল্যাণের জন্য এত পেরেশান ছিলেন যে, তায়েফে তার উপর অকথ্য জুলুম করা সত্ত্বেও তিনি জালেমদের জন্য দোয়া করেছেন যে, ইয়া আল্লাহ এরা বুঝে না, এদেরকে মাফ কর। যারা পাথর মেরে তাকে বেহুশ করে ফেলল তাদেরকে শাস্তি দেবার ফেরেস্তা হাযির হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুশমনদের জন্য বদদোয়া করলেন না এবং শাস্তি দেওয়ার অনুমতিও দিলেন না। আমরা যদি এ মহান নবীর উম্মত বলে দাবি করি এবং তারই শেখান ইসলামী আন্দোলন করছি বলে মনে করি, তাহলে দরদী মন নিয়েই মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। যে সব দল বা ব্যক্তি আমাদেরকে গালি দেয় তাদের প্রতিও কোন বিদ্বেষ পোষণ করা আমাদের জন্য

www.bjilibrary.com

সাজে না। তাই আমরা গালি খেতে পারি, কিন্তু দিতে পারি না। যারা আমাদের অমঙ্গল কামনা করে আমরা তাদেরও কল্যাণ চাই। আমরা হিন্দু মুসলমান সব ভাইদেরকেই আল্লাহর দেয়া দ্বীনী নেয়ামতের ভাগী বানাতে চাই। যারা আমাদের সংগ্রামে শরীক হবেন তাদেরকে আন্দোলনের সহকর্মী ভাই হিসেবে মনে করব। আর যারা বিরোধিতা করবেন তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতেই থাকব। আন্দোলনের এমন পর্যায়ও আসবে যখন বিরোধী শক্তির সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হবে। তখনও তাদের জন্য বেদনা অনুভব করাই আমাদের কর্তব্য হবে।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বই-পুস্তক পড়িয়ে জামায়াতে ইসলামী একদল কর্মী বানিয়েছে। এখন সময় এসেছে যে, তাদের মধ্য থেকে কতক কর্মীকে বাছাই করে তাদেরকে জনসাধারণের মধ্যে এ দাওয়াত পৌছাবার কাজে লাগাতে হবে। দেশের শতকরা ৯০ জন লোকই বই পড়তে পারে না। আল্লাহর নবী কি অশিক্ষিতদেরকে আন্দোলনের যোগ্য কর্মী বানাননি? বহু শিক্ষিত লোকও আন্দোলনমুখী নয়। আবার লেখাপড়া না জানা বহু লোকও আন্দোলন বুঝে। আমাদের ঐসব লোককে সাথে পেতে হবে। তাদের সাথে মিলে মিশে আলোচনার মারফতে তাদেরকে এ পথে এগিয়ে আনতে হবে। কেন্দ্র থেকে এ উদ্দেশ্য সাজানো কোনো কর্মসূচীর অপেক্ষায় এ কাজকে অবহেলা করবেন না। সব জায়গায় আপনারা এ কাজের প্রোগ্রাম নিন এবং কাজ শুরু করে দিন। আপনাদের কাজের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা জামায়াতের হবে তার ভিত্তিতে কিছু দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী কর্মসূচী গড়ে উঠবে।

আপনারা জানেন যে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। এদের মধ্যে দ্বীনের এ বিপ্লবী দাওয়াত না পৌছলে এবং তাদের কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট না হলে ইসলামী আন্দোলনের বিজয় অসম্ভব। বর্তমান অনৈসলামী সমাজে তারাই সবচাইতে বেশী নির্যাতিতা ও বঞ্চিতা। তাদের মর্যাদা ও অধিকার যে ইসলামই দিতে পারে সে কথা তারা তখনই বুঝতে পারবে যখন তারা জামায়াতের সাথে মিলে ইসলামী আন্দোলন করবে। কোরআন ও হাদিসের জ্ঞানই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে এ পথে উৎসাহী হতে। তাই মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামী বিপ্লবের আওয়াজ দ্রুত পৌছাতে হবে।

আল্লাহ পাক যাদেরকে জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত দ্বীনী আন্দোলনের সাথে কোন না কোন পর্যায়ে শামিল হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন তাদের কাছে আমরা আরো একটা বিশেষ কথা বলবার আছে। বাংলাদেশের ভিতরে ও বাইরে ইসলাম বিরোধী বেশ কিছু শক্তি অত্যন্ত কর্মতৎপর রয়েছে। আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর সে ধরনের মহাবিপদ নেমে এসেছে যে জাতীয় বিপদ আমাদের প্রিয় জন্মভূমির উপর হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু আপনারা যদি উৎসাহের সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজে অগ্রসর হন তাহলে আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই ঐ ধরনের মুসীবত থেকে এ দেশকে হেফাজত করবেন।

www.bjilibrary.com

ভাইসব,

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইসলামের দুশমনরা আমাদের মতো ঢিলা ঢালা তালে কাজ করছে না। তাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে তাদের চেয়েও বেশী জোরে শোরে কাজ করতে হবে। আপনাদের আসল কাজ হল আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকরূপে নিজেদেরকে গড়ে তোলা। ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যত বেশী সংখ্যায় লোক তৈরি হবে ততই ময়দানে ইসলামের শক্তি বাড়বে। জামায়াতে ইসলামী এ জাতীয় লোক তৈরির একমাত্র কারখানা। যারা সহযোগী সদস্য হয়েছেন তারা অবিলম্বে কর্মী হোন। কর্মী হলেই আপনার মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি হতে থাকবে। কর্মী না হলে লোক তৈরির কাজ এগুতে পারে না। নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির হতে থাকলে ইনশাআল্লাহ দ্বীনের যোগ্য খাদেমের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনারা নিজেদেরকে নিয়মিত কর্মী না বানালে এদেশে ইসলামকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

ইনশাআল্লাহ দ্বীন এদেশে বিজয়ী হবেই। ইসলামী আন্দোলনের এ গাড়ী কারো জন্য অপেক্ষা করবে না। এ গাড়ীতে চড়ার সৌভাগ্য যদি পেতে চান তাহলে এখনই সিদ্ধান্ত নিন। কর্মী হিসেবে নিজেকে পেশ করে জামায়াতের স্থানীয় দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি কর্মী না হলে আন্দোলন অচল হয়ে থাকবে না। কিন্তু আপনিই পেছনে পড়ে থাকবেন দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ পেতে হলে এগিয়ে আসুন। সর্বশেষে আপনাদের সাথে মিলে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করে বিদায় নিচ্ছি।

আল্লাহুমা সাল্লে আলা ইয়া... মাওলা। আমরা তোমার দ্বীনকে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে বিজয়ী দেখতে চাই। এ বিজয়ের জন্য যে ধরনের লোক তৈরি হওয়া দরকার তা আমাদের মধ্য থেকেই তৈরি কর। ইয়া আল্লাহ! এ দেশে তোমার দ্বীনের যত মুখলেস খাদেম আছে তাদের সাথে যেন আমাদের মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেভাবে কাজ করার তৌফিক দাও, আমাদের সম্পর্কে তাদের কোন ভুল ধারণা থাকলে তা দূর করে দাও। ইয়া আল্লাহ! আমাদের দেশবাসীর অন্তরে আমাদের জন্য মহব্বত পয়দা করে দাও।

ইয়া মাবুদ! তোমার যে মেহেরবানী দ্বারা আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক করেছো সে মেহেরবানী দ্বারাই আমাদের মধ্যে ঈমান, এলম ও আমলের ঐ যোগ্যতা দান করো যা তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জরুরী। দয়াময় প্রভু! আমাদেরকে তোমার সাচ্চা গোলাম ও তোমার দ্বীনের যোগ্য খাদেম বানাও। আমাদেরকে অন্যসব মানুষের নিকট অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য বানাও আমীন সুম্মা আমীন।

[১৯৮০ সনে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকী নামক বুলেটিনে "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি অধ্যাপক গোলাম আযম" শিরোনামে এ ভাষণটি প্রকাশিত হয়।]

www.bjilibrary.com

আদর্শ কর্মীর পরিচয়

যে কাজ করে তাকেই কর্মী বলা যায় বটে, কিন্তু নিজের ও পরিবারের দায়িত্বের বাইরে সমাজের কোন খেদমতের কাজে যে সময় ও শ্রম দান করে তাকেই 'কর্মী' বলে গণ্য করা হয়। যেমন সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী ইত্যাদি।

আদর্শিক কর্মী

যে কোন একটি আদর্শকে 'সমাজে চালু করার চেষ্টা করে তাকে আদর্শিক কর্মী বলা যায়। যে আদর্শই সে পছন্দ করে থাকুক মানুষ যদি বুঝতে পারে যে সে নিস্বার্থভাবে তার আদর্শের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাহলে সবাই তাকে আদর্শবাদী কর্মী বলে স্বীকার করে।

ইসলামী কর্মী

যে ব্যক্তি ইসলামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সমাজে সে আদর্শের প্রচার ও বিকাশের চেষ্টা করে তাকে ইসলামী কর্মী বলতে হবে। নিজে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নামাজ রোযা ও অন্যান্য দ্বীনী দায়িত্ব পালন করলে তাকে ইসলামী কর্মী বলে গণ্য করা চলবে না। ইসলামী কর্মী ঐ ব্যক্তি যে অন্য লোকদেরকেও দ্বীনদার বানাবার চেষ্টা করে। যেমন তাবলীগ জামাতের কর্মী। মসজিদের ইমাম যদি মহল্লার বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাবার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই ইসলামী কর্মী বলে গণ্য করতে হবে। সমাজের মানুষ যাতে ইসলামের বিধান মেনে চলে সে জন্য যারা চেষ্টা করে তারাই ইসলামী কর্মী।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী

ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা চেষ্টা সাধনা করে তারাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী। আল্লাহ ও রাসূল যা পছন্দ করেন তা সমাজে চালু করা ও যা তারা অপছন্দ করেন তা সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য যারা সংগ্রাম করে তাদেরকেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বলা হয়।

ইসলামী কর্মী ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনে যে কারণে পার্থক্য ইসলামী কর্মী ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর মধ্যে সে কারণেই পার্থক্য আছে। ইসলামী খেদমতের বিরুদ্ধে বাতিল শক্তি সাধারণতঃ মারমুখী হয় না। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তারা ইসলামী কর্মীদেরকে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য বিপজ্জনক মনে করে না। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে তারা সহ্য করতে পারে না। ইসলামী আন্দোলন বাতিল নেতৃত্বকে অপসারণ করে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করতে চায় বলে আন্দোলনের কর্মীদেরকে তারা দুশমন মনে করে। এ কারণেই কোন যুগেই কোন নবীকে বাতিল নেতারা বরদাশত করেনি।

www.bjilibrary.com

আদর্শ কর্মীর পরিচয়

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, প্রত্যেক কাজের জন্যই বিশেষ ধরনের যোগ্যতা দরকার হয়। যে কোন আন্দোলনের কর্মীর মধ্যেই যোগ্য কর্মী করার জন্য কতক গুণের সমাবেশ দরকার। কর্মী যদি যোগ্য না হয় তাহলে কাজের ক্ষতি না হয়ে পারে না। কাজ না করার দরুন যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতি হয় যদি কাজটা ঠিকমতো করা না হয়। যারা কাজ করে না তারা কাজের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যারা ঠিকমতো কাজ করে না তারা কাজ নষ্ট করার জন্য শাস্তির যোগ্য হয়। তাই কর্মীকে তার অযোগ্যতার ক্ষতি থেকে আন্দোলনকে বাঁচাতে হলে তাকে আদর্শ কর্মীর গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

যে কোন আন্দোলনের কর্মীর জন্যই কতক এমন গুণ থাকা উচিত যা তাকে আদর্শ কর্মীর মর্যাদা দান করবে। এ সব গুণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর মধ্যেও থাকতে হবে। তদুপরি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে আরও এমন কতক বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে যা অন্য কোন আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য নয়। সব ধরনের আন্দোলনের কর্মীর জন্য যে সব গুণ জরুরী সে সম্পর্কে পয়েলা আলোচনা করা যাকঃ

১) আন্দোলনের কর্মীকে দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। যে উদ্দেশ্যে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে সে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তাকে মজবুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দৃঢ় চেতন লোক না হলে আন্দোলনে সে টিকে থাকতেই পারবে না। যে কোন মূল্যেই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় তাকে লেগে থাকতে হবে।

২) তাকে সাহসী ও মনোবলসম্পন্ন হতে হবে। বিরোধী শক্তি দেখে যারা ঘাবড়ায় তারা আন্দোলনের পথে এগুতে পারে না। আদর্শ কর্মীকে অসীম সাহসের অধিকারী হতে হয়। যে কোন পরিস্থিতিতে মজবুতভাবে আপন কর্তব্য করে যাবার মতো হিম্মত না থাকলে এসব লোকদের দ্বারা আন্দোলন সফল হতে পারে না।

৩) আদর্শ কর্মীকে নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে, যে কর্মী আন্দোলনের সুযোগে নিজকে কায়েম করতে চায় সে তার স্বার্থ উদ্ধার করার প্রয়োজনে আন্দোলনকে মূল লক্ষ্য থেকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে পারে। আন্দোলনের সাফল্য ঐ সব কর্মীর উপর নির্ভর করে যারা আন্দোলনের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপর স্থান দেয়। সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানীদের হাতে কোন আন্দোলন বিজয়ী হয় না। যারা নিজকে কায়েম করতে চায় তাদের হাতে কোন আদর্শ কায়েম হয় না। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আদর্শ কর্মীর বিশেষ পরিচয়।

৪) আন্দোলনের কর্মীকে জনদরদী হতে হবে। জনগণের কল্যাণ চিন্তা যাদেরকে আন্দোলনে ঠেলে দেয় তারাই আদর্শ কর্মী হতে পারে। মানুষের কল্যাণ কামনা এমন এক মহৎ গুণ যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করার যোগ্যতা দান করে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মী

উপরোক্ত ৪টি গুণের সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মীর মধ্যে আরও কতক অতিরিক্ত গুণ থাকতে হবে।

১) তার মধ্যে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা থাকতে হবে। ইসলামের বিস্তারিত জ্ঞান তো সারা জীবনেই বাড়াতে হবে। এখানে সে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে না যে সঠিক ধারণা অত্যাবশ্যক তা হলো এই যে, ইসলাম কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম মাত্র নয়, ইসলাম একমাত্র ভারসাম্য-পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে মনিব মেনে এবং রাসূল (সঃ)- কে আদর্শ মানুষ হিসেবে অনুকরণ করে চলাই যে ইসলামের দাবী সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তা না হলে জীবনের একাংশে ইসলামকে মেনে অন্য অংশে ভিন্ন মত ও পথে চলার বদভ্যাস থেকে যাবে।

২) ইসলামী জীবন বিধানের উপর এমন মজবুত ঈমান থাকতে হবে যেন কোন পরিস্থিতিতেই মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। ইসলাম বিরোধীদের কুতর্ক তাদের সৃষ্ট জটিল প্রশ্ন ও সন্দেহ সংশয়ে বিচলিত হওয়া ঈমানের দুর্বলতারই পরিচায়ক। যদি ইসলাম সম্পর্কে কোন দিক দিয়ে জ্ঞানের ও বুঝবার অভাব থাকে তাতে পেরেশান না হয়ে ঐ অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হবে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে ইসলামে কোন রকম ভুলত্রুটি বা অযৌক্তিক বিধান নেই। কারণ ইসলাম মানুষের রচিত নয়। যে আল্লাহ নিখুঁতভাবে বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তার রচিত ইসলামও সব রকম দোষমুক্ত।

৩) ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মীর আমল এমন হতে হবে যে তার কথা ও কাজে যেন বেমিল না থাকে। ইসলামের যতটুকু ইলম তার হাসিল হয়েছে সে অনুযায়ী তার আমল হতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দ ও অপছন্দ যতটুকু জানা আছে এর বিরোধী কিছুই যেন তার চরিত্রে না পাওয়া যায়। যে জেনে শুনে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করে সে তার নিজের বিবেকের কাছেই চোর বলে গণ্য। 'বিবেকের বিরুদ্ধে কিছুতেই কোন কাজ করব না' এমন দৃঢ় মনোভাব যে পোষণ করে সেই আদর্শ কর্মী।

৪) আদর্শ কর্মী হবার যাবতীয় যোগ্যতা ঐ ব্যক্তির মধ্যেই সৃষ্টি হয় যে ইসলামকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। ইসলামকে বিজয়ী করার অদম্য লক্ষ্য নিয়ে তাকে কাজ করে যেতে হবে। দুনিয়ায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যত কিছু করতে হয় তা তাকে বাধ্য হয়ে করতেই হবে। রুজি রুজগার ও ঘর সংসারের দায়িত্ব তাকে বেঁচে থাকতে হলে করতেই হবে। কিন্তু সে বেঁচে থাকবে কী উদ্দেশ্যে? এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইসলামী আন্দোলনের দাবীকে অবহেলা করে দুনিয়ার ধান্দায় সে মেতে থাকবে না। ইকামাতে দ্বীনের প্রয়োজনে দুনিয়ার সব কিছুই সে কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকবে। দ্বীনের দাবীকে কোন অবস্থায়ই অবহেলা করবে না।

www.bjilibrary.com

৫) আদর্শ কর্মী সব সময়ই বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে হিকমাতের সাথে সব কাজ করবে। ধীর মস্তিষ্কে সুবিবেচনার সাথে দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেক কাজ করার আগে এর পরিণাম চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। জোশের ঠেলায় হুশ জ্ঞান ত্যাগ করবে না। হিকমাতের সাথে কাজ করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ, বিপদ সংকেত বুঝে কর্তব্য নির্ধারণ, এক পথ বন্ধ হলে অন্য পথ তালাশ করা, বিরোধীদের প্ররোচনায় অস্থির চিত্তে সিদ্ধান্ত না করা ইত্যাদি সবই হিকমাতের অন্তর্ভুক্ত

৬) আদর্শ কর্মী সর্বাবস্থায় 'সবর' অবলম্বন করে। সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য। এটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া, ইপ্সিত ফল লাভ না হওয়া সত্ত্বেও হিম্মত বহাল রাখা, বাধা বিপত্তি দেখে নিরাশ না হওয়া, বিরোধীদের দাপটে না ঘাবড়ানো, ইত্যাদি আদর্শ কর্মীর জন্য অত্যন্ত জরুরী।

৭) আদর্শ কর্মীর আর একটি গুণ হলো একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে ইকামাতে দ্বীনের কাজে লেগে থাকা। তাওয়াক্কুল শব্দ দ্বারা এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়। এর অর্থ হলো আল্লাহকে একমাত্র শক্তি বিবেচনা করা। ইসলামী আন্দোলনের বিজয় আল্লাহ অবশ্যই চান। কিন্তু তিনি যাদের চেষ্টা সাধন পছন্দ করবেন তাদেরই হাতে দ্বীন বিজয়ী হবে। নিজেদের চেষ্টা তদবীর, বস্তুশক্তি ও জনশক্তির উপর নির্ভর না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা, কোন কঠিন পরীক্ষা এলে আল্লাহর সাহায্যের আশায় দৃঢ় থাকা, কোন অবস্থায়ই হতাশ হয়ে না যাওয়া তাওয়াক্কুলের পরিচয় বহন করে।

৮) ইসলামী সংগঠনের নিকট বাইয়াত হওয়া আদর্শ কর্মীর আরও একটি বিশেষ গুণ। সংগঠনের সদস্যপদের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই বাইয়াত হতে হয়। মুমীন হিসেবে যে জানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দেয়া হয়েছে সে জানমাল নিজের খুশী মতো ব্যবহার না করে সংগঠনের হাতে তুলে দেয়ার নামই বাইয়াত। শয়তানের ধোঁকায় নফসের তাড়নায় ও আত্মীয় বন্ধুদের চাপে ইসলামের দাবী পালনে অনেক সময় বাধা আসে। এসব অবস্থায় সংগঠন ঢাল স্বরূপ কাজ করে এবং পতন থেকে রক্ষা করে। তাই আদর্শ কর্মী হতে হলে বাইয়াত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আদর্শ কর্মীর বিশিষ্ট মনোভাব

কোরআন-হাদীস সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবন ও নবী রাসূল এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আদর্শ কর্মীর যত গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় এর তালিকা দীর্ঘ। উপরে বর্ণিত গুণসমূহ এমন বুনিয়াদী যে যারা একাগ্রতার সাথে এসব গুণ অর্জনের চেষ্টা করে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য গুণও সৃষ্টি হয় এবং যেসব দোষ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া প্রয়োজন সেসব দোষও দূর হতে থাকে। তাই গুণাবলীর তালিকা আর দীর্ঘ করার দরকার নেই।

কিন্তু একটা মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এমন আছে যা ঠিক থাকলে আদর্শ কর্মীর গুণাবলী অর্জনের পথ সহজ হবে। যে আদর্শ কর্মী হতে আগ্রহী তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তার জানমাল আমল আখলাক এমনকি হায়াত মওত সবই একমাত্র আল্লাহর

www.bjilibrary.com

জন্য। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের এটাই পূর্ণাঙ্গ রূপ। সূরা আল আনয়ামের ১৬২ আয়াতে আল্লাহ পাক স্বয়ং ঐ মনোভাবটিকে চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আয়াতটির অনুবাদঃ "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার যাবতীয় ইবাদত আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই রাব্বুল আলামীনের জন্য।" এর সারমর্ম হলোঃ "হে আমার রব আমি আর কিছুই চাই না। তুমি আমাকে দয়া করে কবুল কর। আমি নিজকে কায়েম করার জন্য তোমার দ্বীনী আন্দোলনে শামিল হইনি। আমি যা কিছু করছি একমাত্র তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তুমি যদি আমার সব কাজ কবুল করে নাও তাহলে আমার জীবন ও মৃত্যু স্বার্থক। তোমার সন্তুষ্টি ছাড়া আমার আর কোন কামনা -বাসনা নেই।"

[জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকায় প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়নি তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আন্দোলনে শরীক হয়েও যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে না তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তারা নিশ্চয়ই আন্দোলনকে যথাসাধ্য বুঝেই এতে শরীক হয়েছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সাথে শরীক থাকা অবস্থায় যে সব কারণে নিষ্ক্রিয়তার রোগ দেখা দেয় তা থেকে সংগঠনকে হেফাজত করতে হলে গভীরভাবে এ বিষয়ে পর্যালোচনা হওয়া দরকার। সংগঠনে যারা শামিল হয় তারাই জনগণকে আন্দোলনের দাওয়াত দেয়। তাদের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই আন্দোলন এগিয়ে চলে এবং সংগঠনের জনশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কিছু লোক নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে তারা সংগঠনের জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে এ সব লোকের পেছনে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয় বলে আন্দোলনের গতি মন্থর হতে বাধ্য হয়। তাই নিষ্ক্রিয়তার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযথভাবে অবহিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী ঃ

প্রধানতঃ একটি কারণেই নিষ্ক্রিয়তার সূচনা হয়। আন্দোলনে শরীক হবার পর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথেই কর্মীর জীবনে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা শুরু হয়। এ পরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক দাবী ও চিরন্তন রীতি। আল্লাহ পাক কোরআনের বহু সূরায় এ সব পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। ভয়-ভীতি, অভাব-অনটন, রোগ, শোক, বাধা-বিপত্তি ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ পাক যখন পরীক্ষা করেন তখন যে কর্মী তার খোদায়ী উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না সে-ই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

ইসলামী আন্দোলন ফুলশয্যা নয়। আল্লাহ পাক এ পথকে কণ্টকময় ও দুর্গম করে রেখেছেন। আন্দোলনে বিজয়ী হলে আন্দোলনের কর্মীরা ক্ষমতাসীন হবার পর ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে আন্দোলনের মহান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই আন্দোলনের সংগ্রাম যুগেই এ সব বাধা বিঘ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক কর্মীদের প্রকৃত প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করেছেন। বিশ্ব নবীর আন্দোলনের সহকর্মীগণ ১৩ বছর পর্যন্ত মক্কায় যাবতীয় পরীক্ষায় পাশ করার পরও ফাইনাল পরীক্ষা স্বরূপ হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হল। বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন- জমি-জমা, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে যারা হিজরত করলেন তারা প্রমাণ দিলেন যে দ্বীনের জন্য তারা সবই কোরবানী দিতে সক্ষম। এ সব ত্যাগী ও নিস্বার্থ লোকদের হাতে যখন ক্ষমতা এলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নিজকে কায়েম করার পরিবর্তে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। তারা যদি ধন, লোভ, স্বজন প্রীতি, পার্থিব সুখ-সুবিধা হাসিল করার কামনা পোষণ করতেন তাহলে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে মক্কা থেকে হিজরত করতেন না। পরীক্ষার মাধ্যমে এ সব নিঃস্বার্থ লোককে বাছাই করা না হলে ইসলামের বাস্তবায়ন কখনও সম্ভবপর হতো না।

www.bjilibrary.com

এ কারণেই ইসলামী সমাজ গঠনের যারা আওয়াজ তোলে তাদেরকে আল্লাহ পাক বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে এ কাজের যোগ্য লোকদেরকে বাছাই করে নেন। এ পরীক্ষায় যারা ফেল করে তারা স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনে মর্যাদা হারায় এবং এ ধরনের অযোগ্য লোকদের নেতৃত্ব থেকে আন্দোলন বেঁচে যায়। ইসলামী আন্দোলনের মহান অভিভাবক আল্লাহ পাক এ উদ্দেশ্যেই কর্মীদেরকে পরীক্ষা করেন। বিনা পরীক্ষায় বিজয় দিলে অযোগ্য লোকদের হাতেই নেতৃত্ব আসবার আশংকা।

আন্দোলনের জীবনে পরীক্ষার মহান খোদায়ী উদ্দেশ্য সম্পর্কে যারা সচেতন নয়, তারাই এ সব পরীক্ষাকে কাজ না করার পক্ষে কৈফিয়ৎ হিসেবে পেশ করে এবং নিষ্ক্রিয় হওয়াকে যুক্তিযুক্ত মনে করে। আল্লাহ দিলেন পরীক্ষা। আর তারা এটাকেই বানাল 'ওজর'। যারা এ পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন তারা অসুবিধা ও বাধাকে ওজর মনে করে নিষ্ক্রিয় হয় না। বরং পরীক্ষাকে প্রমোশনের সোপান মনে করে আরও বেশী উৎসাহের সাথে সক্রিয় হয়।

২। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করাকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে না করলেও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। যারা পার্থিব উন্নতি ও সুখ-সুবিধাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়েছে তারা সময় সুযোগ মতো সক্রিয় হয়। দুনিয়ার স্বার্থকে কোরবানী না দিয়ে যতটুকু করা যায় ততটুকুই তারা করে। দ্বীনের দাবী পূরণের জন্য তারা দুনিয়ার ক্ষতি বরদাশত করতে রাজী হয় না। তাই তারা মওসুমীভাবে সক্রিয় থাকে।

৩। আন্দোলনের সাথী, সংগঠনের দায়িত্বশীলদের দোষ-ত্রুটিকে কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় হবার অজুহাত বানায়। তারা নিজের দোষকে কমই দেখে। অপরের ছোট ছোট দোষও তাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেয়। সংশোধনের উদ্দেশ্যে অপরকে দোষমুক্ত করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু দায়িত্বশীলের দোষ-ত্রুটিকে ওজর বানায়ে নিজে কাজ না করা এমন এক মারাত্মক রোগ যা শয়তানের খপ্পরে পড়ারই স্বাভাবিক পরিণতি।

৪। দায়িত্ব থেকে অপসারণের ফলেও কোন কোন লোক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ ধরনের লোকদের আচরণ থেকে মনে হয় যে তারা আল্লার সন্তুষ্টির মহান উদ্দেশ্য ভুলে যায়। যারা প্রকৃত মুসলিম কর্মী তারা সংগঠনে কোন পদ বা মর্যাদার ধার ধারেনা। তারা নীরবে কাজ করে যায়। পদ থেকে অপসারিত হবার পরও যারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায়, আন্দোলনে ও সংগঠনে তাদের মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ন হয় না।

দায়িত্ব থেকে অপসারণের মাধ্যমে যে পরীক্ষা আসে তাতে একমাত্র তারাই পাশ করে যারা ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করতে পেরেছেন। যারা পদ দিলে কাজ করে, আর পদ না পেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তারা আর যাই হোক ইসলামী সংগঠনে কোন পদেরই যোগ্য নয়। নাফসানিয়াত থাকলে আন্দোলনের কোন না কোন স্তরে এ ধরনের পরীক্ষায় তারা পাশ করতে ব্যর্থ হয়েই থাকে।

৫। আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা না দেখলেও কতক লোক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আন্দোলনের বিজয়ের আশা নিয়েই হয়তো তারা সক্রিয় হয়েছিল। কিন্তু কোন বড়

www.bjilibrary.com

ধাক্কা খেয়ে বা বিপর্যয়ে আন্দোলনকে বিপর্যস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখে তারা বিজয়ের আশা ত্যাগ করার ফলে পিছিয়ে যায়। সর্ব অবস্থায় সক্রিয় থাকাটাই যে প্রকৃত সাফল্য সেকথা তাদের বুঝে আসেনা। আন্দোলনের বিজয়ই যে ব্যক্তির সাফল্যের মাপকাঠি নয় সে কথা তারা বুঝতে পারে না। আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকাই ব্যক্তির সাফল্য। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না হওয়ার দরুন যদি বিজয় না আসে তবুও ব্যক্তিগত সাফল্য লাভ হয়। এ কথা বুঝে আসলে কোন অবস্থায়ই নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে না।

উপরোক্ত ৫টি কারণে যে সব কর্মী একসময়ে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও পরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তাদের থেকে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আল্লাহ পাক এক সময়ে তাদেরকে সক্রিয় হবার তৌফিক দিয়েছিলেন। তারা নিজের অবহেলায় সে তৌফিক থেকে বঞ্চিত হলো। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত থেকে তারা নিজদেরকে মাহরূম করল। পরীক্ষায় ফেল করে তারা পূর্বের গোটা সাধনাকে ব্যর্থ করল। তাদের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? আগে একবার সক্রিয় হয়ে কি তারা ভুল করেছিল? যদি ঠিক মনে করেই পূর্বে সক্রিয় হয়ে থাকে তাহলে এখন এ কাজ করা কি বেঠিক হয়ে গেল? যদি এখন এ কাজে মনের কোন তাগিদ না থাকে তাহলে আগের করা কাজের কোন মূল্যই তার নিকট নেই বলে মনে করতে হবে। এ অবস্থায় পূর্বের কৃত কাজের পুরস্কারের আশা কি করে করবে?

আল্লাহর দ্বীন কারো মুখাপেক্ষী নয়। ইসলামী আন্দোলনের পথে যে পেছনে পড়ে রইল তার বদলে আরও বহু কর্মী জুটবে। কিন্তু যে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল তার ভাগ্যে কি ফলবে? আল্লাহ পাক কারো কৃতকর্মের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না। কিন্তু নেক আমল ও তৌবা দ্বারা যেমন পূর্বের কুকর্মের প্রতিফল নষ্ট হয়, তেমনি এক সময়ে নেক আমল করার পরবর্তী সময়ে যদি সে ঐ নেক কাজকে নেকই মনে না করে তাহলে তার পূর্বের কাজের পুরস্কার পাওয়ার অধিকার থাকে না।

অবশ্য মনের অবস্থার সঠিক হিসেব করেই আল্লাহ পাক বিচার করবেন। তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে একবার সক্রিয় থেকে পরে শরয়ী ওজর ছাড়া নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে তার পরিচিত মহলে আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এ ব্যক্তির কারণে অন্য আরও লোক পিছিয়ে পড়লে আরও বেশী ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় অন্যের নিষ্ক্রিয়তার অন্যায়ও তার হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাই সক্রিয় ব্যক্তির নিষ্ক্রিয় হবার মতো দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? আল্লাহ পাক সবাইকে এ মহাবিপদ থেকে হেফাজত করুন - আমীন।

[সংবাদ সাময়িকী নামে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রচারিত বুলেটিন ১৯৮০ সনের মে-জুন সংখ্যায় এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়]

www.bjilibrary.com

জন্মভূমিরূপ আল্লাহর মহাদানের শুকরিয়াই হলো দেশপ্রেম

জন্মভূমি সত্যি প্রিয়। মায়ের সাথে এর তুলনা চলে। তাই জন্মভূমিকে মাতৃভূমিও বলা হয়। কিন্তু দু' কারণে আমি মাতৃভূমি বলি না। এক কারণ হল এ উপমহাদেশে মাতৃভূমিকে দেবী মনে করে পূজা করা হয়। দ্বিতীয় কারণ হল জন্মভূমি শুধু মাতৃভূমিই নয় পিতৃভূমিও। তাই জন্মভূমি বলাই বেশী সঠিক। তা ছাড়া কারো মায়ের জন্ম অন্যদেশে হলে তার নিজের জন্মের দেশটাকে মায়ের দেশ বলা সঠিক হয় না। মাতৃভাষা কথাটি অবশ্যই সঠিক। কারণ শিশু পয়লা মা থেকেই কথা শেখে এবং মায়ের সাথে বেশী সময় থাকার ফলে সে মায়ের মুখের ভাষা ও উচ্চারণই শেখে। এ ব্যাপারে পিতার অবদান কম বলেই পিতৃভাষা কখনও বলা হয় না। জন্মভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করার কারণ কয়েকটি ঃ

১। মায়ের প্রতি ভালবাসা যেমন সহজাত তেমনি জন্মভূমির প্রতি ভালবাসাও মানুষের প্রকৃতিগত। শৈশব থেকেই শিশু যেমন মাকেই সবচেয়ে বেশী কাছে পায় এবং মায়ের স্নেহ মমতায় বড় হতে থাকে, তেমনি জন্মভূমির আলো-বাতাস, গাছপালা, পশু-পাখী, খাল-বিল, পুকুর, মাছ, তরকারী, মাঠের ফসল ইত্যাদির সাথে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, তাতে জন্মভূমির সাথে দেহ মনের এক স্বাভাবিক ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিদেশে যারা যায়নি তারা এটা তেমন অনুভব করে না। মা মারা গেলে যেমন তার অভাবটা বুঝে আসে, তেমনি কিছুদিন বিদেশে থাকলে দেশের প্রতি ভালবাসার সূতায় টান পড়ে।

বিলাতে ৭৩ সাল থেকে ৬ বছর থাকাকালে মনে হতো, সে দেশের আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পালা সবই অপরিচিত। শীতকালে গরম ঘরে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে বরফ পড়া দেখতে এত চমৎকার লাগতো যে, অনেক্ষণ চেয়ে থাকতে বাধ্য হতাম। সেদেশে শীতের মওসুমেই বৃষ্টি বেশী হয়। টিপটিপ বৃষ্টি আর না হয় বরফ পড়া চলতেই থাকে। আমার জন্মভূমির সকালের সুন্দর সূর্য সে দেশে কোথাও নেই। আমার দেশে শীতকালেও চিরসবুজ গাছ-পালার অভাব হয় না। সে দেশে গাছ ভর্তি পার্কে শীতকালে প্রথম যেয়ে আমার মনে হলো যে, গাছগুলো শুধু মরাই নয়, পুড়ে কাল হয়ে গিয়েছে। এসব গাছের আবার পাতা গজাতে পারে বলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

২। ছোট বয়স থেকে যে ধরনের খাবার খেয়ে অভ্যাস হয়, সে খাবারের আকর্ষণ যে এত তীব্র তা দীর্ঘদিন বিদেশে না থাকলে টের পাওয়া যায় না। মাতৃভাষার মতই মায়ের হাতের খাবার মানুষের সত্তার অংশে পরিণত হয়। মাঝেমাঝে যারা অল্পদিনের

www.bjilibrary.com

জন্য বিদেশে যায়, তাদের নিকট ভিন্ন ধরনের খাবার বৈচিত্র্যের স্বাদ দান করে—এ কথা ঠিক। কিন্তু দীর্ঘদিন জন্মভূমির অভ্যস্ত খাবার না পেলে যে কেমন খারাপ লাগে এর কোন অভিজ্ঞতা যাদের হয়নি, তারা এ সমস্যাটা বুঝতে পারে না। পুষ্টিকর, মজাদার ও দামী খাবার পেলে আবার দেশের খাবারের কথা মনে হবে কেন—এমন প্রশ্ন অনভিজ্ঞ লোকই করতে পারে।

আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, বহু রকমের মজাদার খাবারের টেবিলে খাওয়ার সময় চিংড়ি ও পুঁই শাকের চচ্চড়ি, কেসকী মাছের ভুনা, কইমাছ, পালং শাকের চচ্চড়ি, টাকী মাছ ও কচি লাউ-এর সালুন, ভাজা পুটি মাছ ইত্যাদির কথা মনে উঠলে ঐ সব ভাল খাবারও মজা করে খেতে পারতাম না। খাওয়ার পর মনে হতো যে খাবার কর্তব্য পালন করলাম বটে, তৃপ্তি পেলাম না।

৩। মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাদটাও যে কত তৃপ্তিদায়ক সে অভিজ্ঞতাও দেশে থাকাকালে টের পাইনি। বিলাতে বাংলায় কথা বলার লোকের অভাব ছিলনা। আমেরিকায় এক ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে ৭৩ সালের আগস্টে যেতে হল। "মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (M.S.A) নর্থ আমেরিকা" এর উদ্যোগে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ৩ দিনের সম্মেলনের পর নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলস পর্যন্ত এম,এম, এর যত শাখা আছে সেখানে আমাকে এক সপ্তাহ সফর করাল। কোন দিন দু' জায়গায় কোনদিন তিন জায়গায় বক্তৃতা করতে হলো। এ ৭ দিনের মধ্যে বাংলায় কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না। লন্ডন ফিরে এসে আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে চাপলাম। কামরার এক কোণায় বসলাম। দূরে আর এক কোণায় একজন লোক এদেশী মনে হলো। কাছে যেয়ে বসলাম। ভদ্রলোক বই পড়ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম বাংলা বই। নিশ্চিত হলাম যে বাংলায় কথা বলা যাবে। বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম—যাতে কথা বলার সুযোগ পাই। দশ দিনের ভুখা। আমি যে তারদিকে তাকিয়ে আছি তা টের পেয়ে মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। আলাপ শুরু করলাম। তিনি কোন্ স্টেশনে নামবেন, আমি কোথা থেকে এলাম, কার বাড়ী কোথায়,লন্ডনে কে কোন জায়গায় থাকি ইত্যাদি আলাপ চলল। মনে হল,ফাঁপা পেট যেন হালকা হচ্ছে। ভদ্রলোকের বাড়ী কোলকাতা এবং তিনি হিন্দু। খুব আন্তরিকতার সাথে বাংলাদেশ নিয়েও বেশ কথা হলো।

বাংলাদেশের আবহাওয়া, খাবার জিনিস ও মাতৃভাষা নিয়ে এ সব ঘটনা একথার প্রমাণ হিসাবেই পেশ করলাম যে, জন্মভূমির ভালবাসা সত্যিই সহজাত। এ ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কৃত্রিম কর্মসূচী রচনার দরকার হয় না। অবচেতনভাবেই এ ভালবাসা জন্মে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাজনৈতিক ভাষায় যাকে 'দেশপ্রেম' বলে তাও কি সহজাত ব্যাপার? আমার হিসেবে দেশপ্রেমও নিঃসন্দেহে সহজাত। আমার জন্মভূমিতেই রাজনীতি চর্চা করা আমার জন্য স্বাভাবিক। অন্য দেশে আমার রাজনীতি করার সুযোগ কোথায়? বিলাতে বাংলাদেশীরা যেটুকু রাজনীতি করে তা তাদের জন্মভূমিকে কেন্দ্র করেই। তাই এ দেশের প্রধান সব কটি দলেরই শাখা সেখানে আছে।

www.bjilibrary.com

মানুষ প্রধানতঃ নৈতিক জীব। কিন্তু মানুষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবও। আমার রাজনীতি চর্চা নিয়ে লন্ডনে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে আলাপ হয়। আমার রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে সেখানে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ডক্টরেট করতে এসে এখানে সেট্‌ল করে গেছেন। নিজের বাড়িতেই থাকেন। এটা ১৯৭৬ সালের কথা। সাড়ে চার বছর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের পর ৭৬-এর মে মাসে আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে দুটোকে নিয়ে লন্ডন পৌঁছেছে। বড় চার ছেলে আমার ছোট ভাই-এর কাছে মাঞ্চেষ্টারে আশ্রয় নিয়েছে।

ঐ বন্ধুটি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, স্ত্রী-পুত্র সবাই যখন চলে আসতে পেরেছে, তখন এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার পরিকল্পনাই করুন। ওরা আপনার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে। আপনি সহজেই 'এসাইলাম' পেয়ে যাবেন। আমি বললাম, আমি তো আমার জন্মভূমি থেকে হিজরত করে আসিনি। দেশে পৌঁছতে পারলাম না বলে সুযোগের অপেক্ষায় বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে আছি। তিনি বললেন, যারা বাংলাদেশ বানাল তাদের মধ্যে আমার জানা বেশ কিছু লোক দেশের অরাজকতা, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আপনি উল্টা চিন্তা কেন করছেন, বুঝলাম না।

আমি বললাম, এরই নাম দেশপ্রেম। আমার আল্লাহ আমাকে যে দেশে পয়দা করলেন আমি সে দেশের মায়া ত্যাগ করতে পারি না। আমাকে ঐ দেশে পয়দা করে আল্লাহ ভুল করেছেন বলে আমি মনে করি না। আমি আর কোন দেশকে জন্মভূমির চেয়ে বেশী ভালবাসব কেমন করে?

তিনি বললেন, আমি দেশপ্রেমের কথা বলছি না। আপনার ও আপনার পরিবারের কল্যাণ চিন্তা করেই এ পরামর্শ দিয়েছি। আমি বললাম, আমি তো কল্যাণ মনে করতে পারছি না। আমার ছেলেরা বৃটিশ পাসপোর্ট পেয়ে গেলেও এ দেশকে জন্মভূমি বানাতে পারবে না। আমি তাদেরকে জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। আমার পক্ষে যদি দেশে যাবার সুযোগ নাও হয়, তবু ছেলেদেরকে তাদের জন্মভূমিতে পাঠাতে চাই।

বিলাতেও স্থানীয় অস্থানীয় বিতর্ক থেকে কিছু কিছু সংঘর্ষ হচ্ছে। ইংরেজ জাতীয়তাবাদীরা এ দেশের লোক বলে আমার ছেলেদেরকে স্বীকার করবে না। শুধু পাসপোর্ট সে মর্যাদা দিতে সক্ষম নয়। জন্মভূমি আল্লাহর দান। এ মহা দানের শুকরিয়াই হলো দেশপ্রেম।

৭ বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকার পর ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখ আমার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে আসার পর যে কেমন আনন্দ লেগেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গৃহহীন লোক বাড়ী পেলে যেমন খুশী হয়, তার চাইতেও বেশী আনন্দিত হয়েছি। হারানো মহামূল্যবান সম্পদ ফিরে পাওয়ার আনন্দ যে কেমন, তা শুধু তার পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব- যার জীবনে বাস্তবে এমনটা ঘটে। মনে হয়েছে যে, আমি যেন আমার প্রকৃতিকে ফিরে পেলাম। মাছ শুকনায় পড়ে যাবার পর আবার পানিতে ফিরে গেলে সম্ভবতঃ এমনি প্রশান্তি বোধ করে।

www.bjilibrary.com

বিদেশে আটকাপড়ে থাকাকালে প্রতি বছরই হজ্জের মওসুমে মক্কা শরীফ পৌঁছার সৌভাগ্য হতো। বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বাংলাদেশী জনগণের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য এটাই একমাত্র মাধ্যম ছিল।

দোয়া কবুল হবার স্থানসমূহে বিশেষ করে মহান আরাফাতের ময়দানে দয়াময়ের দরবারে কাতরভাবে দোয়া করার সময় আমি ধর্না দিয়ে বলতাম, "হে আমার খালিক ও মালিক তুমি আমার জন্য যে দেশটিকে জন্মভূমি হিসাবে বাছাই করেছ, সেদেশে পৌঁছার পথে যত বাধা আছে তা মেহেরবানী করে দূর করে দাও।" আমার এ দোয়া যে কবুল হয়েছে তা দেশে ফিরে আসতে পারায় বুঝতে পারলাম।

বিদেশে থাকাকালে বহু ইসলামী বিশ্ব সম্মেলনে মেহমান হবার সুযোগ হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিরল সৌভাগ্য হলো। আমার দেশে চলে আসার পর গত ১ বছরে বহু ইসলামী সম্মেলনের দাওয়াত পেয়েও বাংলাদেশী পাসপোর্টের অভাবে বাইরে যেতে অক্ষম বলে জানাতে বাধ্য হয়েছি। আমার নাগরিকত্ব নিয়ে যে অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, সে কথা জানার পর কয়েকটি সম্মেলনে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমার কাছে দাবী জানিয়েছে। এ সুযোগে ইসলামী আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ঐ সব সম্মেলনে মেহমান হিসাবে গিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে কোন কারণে আসলে আমার সাথে দেখা করে পয়লাই প্রশ্ন করেন যে আপনাকে আমাদের দেশে আর দেখতে পাই না কেন? জওয়াবে বলি, "বিদেশে থাকাকালে গিয়েছি। কিন্তু এখন সুযোগ পাচ্ছি না। ৭ বছর আমাকে দেশে আসতে দেয়নি, এখন আর যেতে দেয় না।" নারিকত্বের সমস্যার কথা জেনে এবং আমার ঐ জওয়াব শুনে তারা খুব হাসেন। আমি তাদেরকে বলি যে দোয়া করুন, যাতে বাইরে যাবার বাধা দূর হয়ে যায়। তারা জানতে চান যে, আমার বিদেশে যাবার আগ্রহ আছে কিনা। আমি হেসে বলি, "আল্লাহ পাক আমার জন্মভূমিতে তাঁর দ্বীনের কাজ করার যে সুযোগ দিয়েছেন, এতেই আমি তুষ্ট। বিদেশে যাবার সুযোগ পাচ্ছি না বলে আমার সামান্য আফসোস নেই। তাছাড়া বিদেশে থাকাকালে দেশে আসবার ব্যবস্থা করার জন্যই দোয়া করেছি। মাঝে মাঝে আবার বিদেশে যাবার সুযোগ দেবার জন্য দোয়া করতে ভুলে গিয়েছিলাম।" এসব কথা শুনে সবাই বেশ কৌতুক বোধ করেন।

[এ প্রবন্ধটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকাকালে রচিত এবং সে অবস্থায়ই ১৭-৬-৯২ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম সমাজের খেদমতের যে বিরাট সুযোগ আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন যে বিষয়ে আমার মনের সামান্য জযবা আপনার বিবেচার জন্য পেশ করছি।

ইসলামে মসজিদের যে গুরুত্ব রয়েছে তা আমাদের নেই এবং এ কারণেই ইমামেরও সঠিক মর্যাদা নেই এবং এর যে সব কারণ রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা না করলে মসজিদ ও ইমামকে ইসলাম যে আসন দিয়েছে তা বহাল করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

নবী করীম (সঃ) হিজরতের পর মদীনা শরীফে পৌছে সর্বপ্রথম যে কাজ করেছিলেন তা হলো মসজিদ স্থাপন। কারণ মসজিদকেই তিনি মুসলিম জীবনের সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নামায আদায় করার কাজ ছাড়াও মুসলিম সমাজের বহু কাজ মসজিদে তিনি সমাধা করতেন। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বৈঠক ও পরামর্শ মসজিদেই হতো।

এ কথা মুসলমানদের অজানা নয় যে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মসজিদে নব্বীর ইমাম ছিলেন। তারপর খোলাফায়ে রাশেদার যুগে খলীফাগণ রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে, রাষ্ট্রপ্রধান ও মসজিদে নব্বীর ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। সে যুগে বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত গভর্ণরগণ নিজ নিজ স্থানের প্রধান মসজিদের ইমাম হিসাবেই গণ্য হতেন। এর কারণ অতি স্পষ্ট।

ইসলাম মসজিদের ভেতরে নামাযীদেরকে আল্লাহর দাসত্ব করার অভ্যাস করায় যাতে তারা মসজিদের বাইরেও সব কাজ আল্লাহর দাস হিসাবে করার যোগ্য হতে পারে। তাই মুসলিম জীবনে মসজিদের ভেতরে ও বাইরে একই আল্লাহর গোলামী, বন্দেগী বা দাসত্ব করতে হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব করতে হলে একমাত্র শেষ নবীকে ইখলাসের সাথে অনুসরণ করেই তা করা সম্ভব। তাই সব বিষয়ে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর নেতৃত্বই মুসলিম জীবনের মূলনীতি। কালেমার ফারফতে সে নিতিই স্বীকার করা হয়।

তাহলে দ্বীন ইসলামের মূল কথা হলো আল্লাহ পাককে গোটা জীবনে একমাত্র ইলাহ্ হুকুমকর্তা ও মনিব মানতে হবে এবং তাঁর শেষ নবীকে একমাত্র আদর্শ নেতা ও অনুকরণের যোগ্য মনে করতে হবে। নেতা শব্দের আরবীই হলো ইমাম। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের প্রকৃত ইমাম একমাত্র শেষ নবী। সমস্ত নবীর উপরই ঈমান আনতে হয়।

www.bjilibrary.com

কিন্তু যে নবীর অনুকরণ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন তিনি একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জনাব ইমাম সাহেব,

আপনি একটি মসজিদের ইমাম বা নেতা। মুসল্লীগণ আপনাকে ইমাম হিসাবেই নামাযের সময় মানে। কিন্তু নামাযের মধ্যে কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করার সময় যদি আপনি ভুল করেন, তাহলে মুক্তাদীগণ পেছন থেকে লুকমা দিয়ে আপনাকে সংশোধন করার সুযোগ দেয়। আপনার ভুল ধরিয়ে দেবার এ বিষয় থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আপনি তাঁদের আসল ইমাম নন। তাঁদের আসল ইমাম হলেন রাসূল (সঃ)। তিনি যে নিয়মে নামায আদায় করতেন সে নিয়মই আপনাকে অনুকরণ করতে হবে। কারণ আপনি আসল ইমামের প্রতিনিধি বা খলীফা বা নায়েব। যতক্ষণ আপনি আসল ইমামের অনুকরণ করবেন ততক্ষণ মুসল্লীগণ আপনাকে মেনে চলতে বাধ্য। আপনার সাথে সাথে রুকু, সেজদা ইত্যাদি তাঁদের আদায় করতে হয়। যদি ইমামের অনুসরণ না করে তাহলে মুক্তাদির নামায আদায়ই হয় না। কিন্তু ইমাম ভুল করলে অন্ধভাবে আনুগত্য না করে ইমামকে সংশোধন করার দায়িত্ব মুক্তাদিকে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর রাসূলই একমাত্র আদর্শ নেতা বা ইমাম হওয়ার কারণেই মুসলমানদের কর্তব্য হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মুজতাহিদীন (রাঃ) এবং ফিকার ইমামগণকে উস্তাদ মনে করে তাঁদের মাধ্যমে রাসূল(সঃ)- কে মানার চেষ্টা করা। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)– কে মেনে চলা আসল উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা যেহেতু রাসূল (সঃ)-কে সবচেয়ে বেশি মেনে চলেছেন, সেহেতু তাঁদেরকে মানলেই রাসূলকে ঠিকভাবে মানা সম্ভব হবে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)- কে মানা উদ্দেশ্য নয়। রাসূল (সঃ)-কে মানার উদ্দেশ্যেই হানাফী মাযহাব বা অন্য কোন মাযহাব মানার নিয়ত হতে হবে। কবর থেকে হাশর পর্যন্ত আমাদেরকে যে কথা জিজ্ঞেস করা হবে তা হলোঃ রাসূলকে ঠিকমত মানা হয়েছে কিনা? 'কোন্ ইমামকে মেনেছ" বা "কোন্ মাযহাবকে মেনে চলেছ" এ জাতীয় প্রশ্ন সেখানে হবে না। এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুলসানদের একমাত্র নেতা শেষনবী (সঃ) এবং তাঁর অনসুরণের জন্য যত লোকের সাহায্য নেয়া হয় তাঁরা সবাই আসলে নেতাকে মানা শিক্ষা দেবার উস্তাদ মাত্র।

মুহতারাম ইমাম সাহেব,

আগেই বলেছি, ইমাম হিসাবে আপনি রাসূল(সঃ)– এর খলীফা বা প্রতিনিধি। ইসলামের বিধান মোতাবেক আপনি শুধু মসজিদের ইমাম নন। মসজিদের বাইরেও আপনার ইমামত বা নেতৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ পাক যেমন মসজিদের ভেতরে ও বাইরে আমাদের প্রভূ এবং শেষনবী যেমন মসজিদের ভেতরে ও বাইরে আমাদের আসল নেতা, তেমনি মুসলমানদের নেতা এমন লোকদের হওয়া উচিত যাঁরা মসজিদে ইমামতি করার সাথে সাথে সমাজেও নেতৃত্ব দেবার যোগ্য।

www.bjilibrary.com

আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে সমস্যা হলো এই যে, যাঁরা জনগণের নেতা তাঁরা অনেকেই ঈদের নামায ছাড়া নামাযেই আসেন না। যাঁরা মোটামুটি নামায আদায় করেন, তাঁরা সবাই জুম'আর নামায ছাড়া অন্য সময় মসজিদে যান না। পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায আদায় করেন এমন নেতা ক'জন তা সবারই জানা। নেতাদের সাথে মসজিদের সম্পর্ক যেমন সামান্য, তেমনি ইমামদের সাথেও সমাজের নেতৃত্বেও সম্পর্ক অতি নগণ্য। ইসলামের দাবী অনুযায়ী মসজিদের ইমামকে মসজিদের বাইরেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নেতারা মসজিদের ইমামতি করার যোগ্য হলে এ দাবী পূরণ করা সহজ হতো। ইসলামের উন্নতির যুগে এ অবস্থাই ছিল। রাজধানী থেকে আরম্ভ করে নিম্ন এলাকা পর্যন্ত নেতারাই মসজিদের ইমামতি করতেন।

সমাজের বর্তমান অবস্থায় এটা আশা করা যায় না যে, নেতারা ইমামতির যোগ্য হবেন। তাই এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে মসজিদের ইমামদেরকেই জনগণের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার যোগ্য হতে হবে। এছাড়া সমাজে সৎ নেতৃত্ব কি করে কায়েম হতে পারে? অসৎ নেতৃত্বই যে সমাজের মূল সমস্যা একথা আপনি জানেন। অসৎ লোকেরা নেতা হলে সমাজে নেক পরিবেশ কিছুতেই সৃষ্টি হতে পারে না। নেতাদেরকে সৎ বানাবার চেষ্টা করা এর চেয়ে সহজ সাধারণত জনগণ মসজিদের ইমামকে সৎ লোকই মনে করে। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও ইমামদের মানুষ অসৎ মনে করে না। তাই সমাজে ইমামদের প্রভাব সৃষ্টি করা ছাড়া অসৎ নেতৃত্ব থেকে সমাজকে বাঁচানো সম্ভব নয়। জনগণের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন বহু বিষয় রয়েছে, যেখানে ইমাম তাঁদের খেদমত ও উপকার করতে পারেন এবং এর ফলে তাঁরা জনপ্রিয় নেতার মর্যাদা পেতে পারেন। অবশ্য নেতা হবার খাহেশ বা মর্যাদা পাওয়ার নিয়তে এ কাজ করা উচিত নয়। দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য হিসাবে জনগণের খেদমত করতে হবে। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইমাম হিসাবে আপনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তার সমাধান পেতে হবে।

ইমামদের সমস্যাঃ

১। পয়লা সমস্যাই হলো রুযী– রোযগারে সমস্যা। সাধারণত মসজিদ কমিটির বেতনধারী কর্মচারী হিসাবেই ইমামদেরকে চাকরী করতে হয়। তদুপরি এমন পরিমাণ বেতন দেয়া হয় যদ্দ্বারা চলা কঠিন। তাই চাকরী বহাল রাখার জন্য প্রভাবশালী লোকদের মরযী- মেযাজ বুঝে চলতে হয়। ফলে দ্বীনে সঠিক দাবী পূরণ করা কঠিন হয়।

২। ইমাম সাহেব স্থানীয় লোক না হলে এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্যায় বা বাড়াবাড়ি দেখেও এর প্রতিকার করার সাহস পান না।

৩। ইমামগণ যেসব মাদ্রাসায় পড়েছেন, সেখানে জনগণের সমস্যা বুঝবার এবং জনগণের সেবা করার কোন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাননি। ফলে সমাজের নেতারা যে জনগণকে অন্যায় পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা অনুভব করলেও সমাজকে সঠিক পথে

www.bjilibrary.com

পরিচালিত করার মত অভিজ্ঞতার অভাবে ইমামকে এসব অন্যায় সহ্য করে যেতে হয়। এসবের প্রতিকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

৪। ইমামদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁরা বর্তমান যুগের উপযোগী যুক্তি ও ভাষায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বুঝবার যোগ্যতা রাখেন না। তাঁরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় মাসলা- মাসায়েল জানেন। আধুনিক যুগের প্রচলিত ইসলাম- বিরোধী চিন্তাধারার কুযুক্তি খন্ডন করে ইসলামের সঠিক ধারণা বুঝবার ক্ষমতা রাখেন না। ফলে সমাজে ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের খপ্পর থেকে মুক্তাদীদেরকে হেফাযাত করতে পারেন না।

সমস্যার সমাধানঃ

উপরের চারটি সমস্যার উপরই ইমামদের মর্যাদা নির্ভর করে। মসজিদের সঠিক মর্যাদা তখনই বহাল করা সম্ভব হবে, যখন ঐসব সমস্যার সমাধান করে ইমামকে সঠিক ভূমিকা পালন করার যোগ্য বানান যাবে। অবশ্য এ যোগ্যতা কেউ ইমামকে দিয়ে যাবে না। ইমামকেই মেহনত করতে হবে এ যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য। আসুন, উক্ত চারটি সমস্যার তালাশ করি। আপনি যদি এ সমাধান পছন্দ করেন, তাহলে আল্লাহ পাক আপনাকে যোগ্যতা বাড়াবার সুযোগ দান করবেন আশা করা যায়।

১। আপনি যদি বেতনধারী না হন, তাহলে প্রথম সমস্যাটি আপনার নাই। বেতন নিয়ে ইমামতি করায় মসজিদ কমিটি ও এলাকার প্রভাবশালী লোকদেরকে একটু হিসাব করে চলতে হতে পারে। তাই বেতনধারী ইমামের মর্যাদা বহাল করার জন্য সবার নিকট বলিষ্ঠভাবে বলুনঃ

"মুসল্লী ভাইসব, আপনারা আমার সাথে নামায আদায় করেন। নামাযের জন্য আপনাদেরকে কোন বেতন দেওয়া হয় না। আমাকে বেতন নিতে হয় কেন? আমিও তো একজন মুসল্লী। ইমামতি না করলেও আমাকে জামায়াতে নামায আদায় করতেই হবে। যদি আমি কোন এক মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম না হয়ে অন্য কোন রুযী- রোযগার করি, তাহলেও আমাকে মসজিদেই নামায পড়তে হবে। যখন যে মসজিদে সুযোগ পাব, সেখানেই পড়ব এবং কোথাও কোন সময় ইমামতি করতে বললে তা-ও করব। তখন বেতন নেবার দরকার হবে না। কিন্তু এখন বেতন নিতে হচ্ছে কেন?

"এটা মুসল্লীদের ভাল করে বুঝতে হবে যে, আমি নামাযের বদলায় বেতন নিতে পারি না। নিলে আমার নামাযই হবে না। আমি ইমামেরই যদি নামায না হয় তাহলে মুক্তাদিরও নামায বরবাদ হবে।

আমাকে বাধ্য হয়ে বেতন নিতে হয় একটা মসজিদে আটক থাকার কারণে। নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ইমামতি করার দায়িত্ব আমাকে আটক থাকতে বাধ্য করে। এ আটক থাকার মধ্যে যদি ইমামতির যোগ্য লোক থাকে, তাহলে বেতন দিয়ে ইমাম রাখার দরকার হয় না।

www.bjilibrary.com

" আশা করি একথা আপনাদের নিকট পরিষ্কার হয়েছে যে, আমি পড়াবার বদলে টাকা নিচ্ছি না। ইমামের দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়ে সময় দিতে হচ্ছে বলে আমার খরচপত্রের জন্য আপনারা যা দিচ্ছেন তা নিচ্ছি। যদি না নিয়ে চলতে পারতাম তা হলে আমার জন্য আরও ভাল হতো।"

"আপনাদেরকে এত কথা বলতে হল এ জন্য যে, ইমামকে যদি কর্মচারী মনে করা হয় বা বেতনের চাকর হিসাবে ধরা হয়, তাহলে আল্লাহর ঘর, ইমামতির পদ ও নামাযের মর্যাদা নষ্ট হয়। আপনারা নিশ্চয়ই এ সবের মর্যাদা উচ্চ মনে করেন। ব্যক্তি হিসাবে আমি আপনাদের মতই একজন নামাযী মাত্র। কিন্তু ইমামতির পদটির মর্যাদ অনেক বড়। ইমামমের পদ হচ্ছে রাসূলের (সঃ) প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব। আসল ইমাম হলেন রাসূল (সঃ)।"

"আমাকে তাই ইমাম হিসাবে খেদমতে পেশ করতে হবে এবং আমাদের সবাইকে দ্বীন ইসলামের সবটুকুই পালনের চেষ্টা করতে হবে। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এ বিরাট দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এখন থেকে এ বিষয়ে যা কিছু করণীয় তা আপনাদের সাথে পরামর্শ করেই করতে চাই।"

উপরের এই কথাগুলো আশা করি বেতনধারী ইমামের মর্যাদা বহাল করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুল, নবীর খলীফার দায়িত্ববোধ ও ঈমানী আত্মবিশ্বাস নিয়ে এসব কথা পেশ করলে মানুষ অবশ্যই বুঝবে।

ইমামের রূযী-রোযগারের জন্য মসজিদ থেকে পাওয়া ভাতাটুকুতে চলে না বলে অনেকেই মাদ্রাসা ও স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) নিজকে শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত বলে ঘোষণা করেছেন (বুয়েছতু মুয়াল্লিমা)। শিক্ষকের দায়িত্ব ও ইমামের দায়িত্বে গভীর মিল আছে। যে ইমাম মসজিদে ইসলামের যোগ্য শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন, তিনিই সত্যিকার মর্যাদা পান।

২। ইমাম যদি স্থানীয় নাও হন, তবু ঈমানী মনোবল, যথার্থ ইসলামী জ্ঞান, বলিষ্ঠ চরিত্রবল এবং রিযিকদাতা হিসাবে আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুলের মন্ত্রে যদি তিনি সজ্জিত হন, তাহলে প্রভাবশালী লোকেরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে। দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার ফলে স্থানীয় কোন প্রভাবশালী লোক যদি নারাজ হয়ও তাতে কিছু আসে যায় না। স্থানীয় মুসল্লী ও জনগণ যোগ্য ও নেক ইমামের পক্ষে অবশ্যই দাঁড়াবে। সত্যের শক্তি অদ্ভুত। মিথ্যা সত্যের বিরুদ্ধে টিকতে পারে না।

৩। মসজিদে যারা আসে না, তাদের সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক সাধারণত থাকে না। মুসলিম জনগণের প্রতি ইমামের অনেক দায়িত্ব। ইমামতিকে যিনি চাকরী মনে করেন না, তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের নামাযটুকু পড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করতে পারেন না। যারা মসজিদে আসে না তাদেরকেও মসজিদমুখী করার দায়িত্ব তিনি বুঝেন। জনগণকে কাছে টানতে হলে শুধু ওয়ায করাই যথেষ্ট নয়। ওয়ায যাঁরা শুনতেই

www.bjilibrary.com

আসে না তাঁদের নিটকও পৌছাতে হবে। বিভিন্ন প্রকার এমন সেবামূলক কাজ মসজিদকে ভিত্তি করেই করা যায়, যার ফলে জনগণের মন ইমামের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। জনগণ বাস্তব জীবনে শুধু সামান্য জ্ঞানের অভাবে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভঙ্গি, হাঁস-মুরগি, পশু পালন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, মাছের চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, মুষ্টি তুলে বিধবা, এতিম, পঙ্গু, অন্ধ ও বৃদ্ধদের সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় লোকদেরকে ইমাম সাহেব সহজেই নেতৃত্ব দিতে পারেন। সমাজের খাদেম হিসাবে এমামদেরকে এসব বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার জন্য ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সুযোগ দিচ্ছে তা ইমামগণ যদি উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেন, তাহলে মসজিদের বাইরেও ইমামদের নেতৃত্ব কায়েম হতে পারে। এর ফলে সমাজ বেঈমান নেতাদের খপ্পর থেকে কিছুটা রেহাই পাবে।

৪। আগেই বলেছি যে, সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ইমামের যোগ্যতার উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে ইসলামকে সুন্দর ও সহজভাবে যুক্তি সহকারে বুঝাবার যোগ্যতা যে ইমামের আছে তার প্রভাব ও প্রাধান্য কায়েম হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক যুগের মানুষের মনে যেসব প্রশ্ন বাতিল মতবাদ ও সুবিধাবাদী মহল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব প্রশ্নের জওয়াব কোরআন- হাদীস থেকে যুক্তিসহকারে পেশ করতে হবে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ইমামকে সহজ-সরলভাবে বুঝানোর মত বই- পুস্তকের কোন অভাব নেই। ইমাম সাহেব উদ্যোগ নিয়ে নিজ মসজিদে ঐসব বই- এর একটা পাঠাগার কায়েম করলে ইমাম ও মুকতাদী সবাই দ্বীনের আলো হাসিল করতে পারবেন । মাদ্রাসায় ইমাম ও মুকতাদী সবাই দ্বীনের আলো হাসিল করতে পারবেন। মাদ্রাসায় ইমাম সাহেব কোরআন- হাদীসের যেটুকু শিক্ষা পেয়েছেন এসব সাহিত্যের সাহায্যে তাঁর ঐ ইল্‌ম আরও আকর্ষণী হবে এবং সবাইকে বুঝাবার জন্য তাঁর যোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে।

প্রিয়দ্বীনী ভাই,

আপনি একটি মসজিদের উছিলায় যে মহল্লায় আছেন, সেখানে হয়তো দ্বীন ইসলামের আলো বিতরণের জন্য আপনি ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই। অন্য কোন লোকের কিছু যোগ্যতা থাকলেও ইমাম হিসাবে আপনার যে সুযোগ তা আর কারো নেই।

আমাদের দেশের বড় সমস্যাই "চরিত্রের অভাব"। এ অভাব দূর করার বড় উপায় হলো মসজিদকে সমাজের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। মসজিদের মুসল্লীগণ আপনার "রেডীমেড" কর্মীবাহিনী, তাঁদেরকে যোগ্য ইসলামী কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে বাকী কাজ সহজ হবে। তাদের নামায শুদ্ধ করতে হবে। নামাযের হাকীকত বুঝিয়ে তাঁদের নামাযকে উন্নত করতে হবে যাতে তাদের চরিত্রে নামাযের প্রভাব পড়ে। তাঁদের সাহায্যে নামাযীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এভাবে আপনার কর্মীসংখ্যাও বাড়বে।

www.bjilibrary.com

চরিত্রের উন্নতি শুধু নসীহত দ্বারাই হয় না। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে চরিত্র গঠনের ওয়ায বাস্তবে ফলদায়ক হতে পারে না। তাই বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ইমামদের চরিত্রের ছাপ জনগণের মধ্যে পড়বে। এর ফলে সৎলোকের নের্তৃত্বে সুফল জনগণ সহজেই বুঝতে পারবে। আজকাল অনেক টাউট জাতীয় লোকেরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করে বলে জাতীয় চরিত্র দিন দিনই আরও খারাপ হচ্ছে। ইমামদের নেতৃত্ব কায়েম হলে সমাজ টাউটদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে পারে।

মসজিদ-ভিত্তিক ৭ দফা কর্মসুচী

আপনার মসজিদকে কেন্দ্র করে এত রকম কাজ করা সম্ভব যার ফলে গোটা এলাকার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়তে পারে। এলাকার যুবক ও সমাজ সচেতন লোকদের সহযোগিতায় বহু রকমের কাজ করা যায়। নমুনা স্বরূপ ৭ প্রকার কাজের উল্লেখ করছি। এর মধ্যে কোন কোন কাজ আপনি নিশ্চয়ই করে যাচ্ছেন। বাকী গুলোও চালু করার মাধ্যমে আপনি মহান খাদেম হবার মর্যাদা পেতে পারেন।

১। ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ঃ

এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য সকালে মসজিদে ফুরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করা যেতে পারে। শুধু কোরআন শরীফ পড়া শেখানই যথেষ্ট নয়। ফুরকানিয়া মাদ্রাসাগুলোর জন্য ঢাকাস্থ "ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি" একটি সুন্দর পাঠ্য তালিকা তৈরি করেছে। এবং সে অনুযায়ী বই প্রকাশেরও চেষ্টা চালাচ্ছে। ঐসব বই যোগাড় করে শিশুদের ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ মযবুত করে তুলতে পারেন।

২। বয়স্কদের শিক্ষা ঃ সন্ধ্যায় বয়স্কদের কোরআন পড়া শেখান ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করলে দ্বীনের বিরাট খেদমত হবে। এ সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে আরও ভাল।

৩। মসজিদে ইসলামী পাঠাগার ঃ

মসজিদে কোরআন শরীফ রাখার রেওয়াজ চালু আছে। একটি আলমারিতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাফসীর, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী বই রেখে মুসল্লীদেরকে পড়ার জন্য উৎসাহ দিলে দ্বীনের ইল্‌ম সহজেই ছড়াতে পারে। আনেকেই বই-এর খোঁজ জানে না। আবার অনেকে কিনে পড়ার ক্ষমতা রাখে না। মসজিদ থেকে বই নিয়ে ফেরত দেবার ব্যবস্থা থাকলে সবাই পড়ার সুযোগ পাবে।

৪। জুম'আর খুৎবা বুঝান ঃ

খুৎবার মধ্যে অনেক নসীহত থাকে। শুধু আরবীতে খুৎবাটুকু শুনিয়ে দিলে মুসল্লীরা দ্বীনের অনেক কথা জানা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই জরুরী কথাগুলো বাংলায় বুঝিয়ে দেয়া দরকার।

৫। সাপ্তাহিক দারসে কোরআন ঃ

নিয়মিত সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন একটা সুবিধাজনক সময়ে কোরআন মজীদের তাফসীরের ব্যবস্থা মসজিদে চালু করা অত্যন্ত উপকারী বলে প্রমাণিত। এ দ্বারা ইমাম

www.bjilibrary.com

সাহেবই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন। কোরআন পাককে বুঝাবার চেষ্টা করলে সঠিকভাবে বুঝবার যোগ্যতা হবে। এর চেয়ে বড় লাভ আর কী হতে পারে?

৬। দাওয়াতে দ্বীনঃ

এলাকাবাসীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাবার জন্য মাসিক সভা ও বিভিন্ন উপলক্ষে ওয়ায-মাহফিল দ্বারা ইসলামী জীবন গড়ার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যায়। এলাকার বাইর থেকে বক্তা আনলে জনগণের উৎসাহ বাড়ে। এক মসজিদের ইমামকে অন্য মসজিদে ওয়ায়েয হিসাবে দাওয়াত করে নিলেও এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

৭। প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজঃ আল্লাহর রাসূল যুব বয়সেই "হিলফুল ফুদুল" নাম সেবামূলক সমিতি কায়েম করে যাদেরকে সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই পরবর্তীকালে তাঁকে নবী হিসাবে সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। সেবা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এর মারফত মানুষকে মসজিদমুখী করা সহজ হবে।

ইমাম সাহেব যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট হাসিল করেন, তাহলে গরীবদের সস্তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন।

মুহতারাম ইমাম সাহেব,

আমার আরযটুকু ধৈর্যের সাথে পড়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। সমাজে ইমামগণ জনগণের যোগ্য নেতা হোন এবং ইমামদের সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যমে মসজিদ ইসলামের সত্যিকার মর্যাদা সম্পূর্ণ করুক এটাই এ আবেদনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য আধুনিক এমন সব মতবাদ জাতির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জাহিলিয়াত। এসব আধুনিক জাহিলিয়াতের ধারক ও বাহকরা চায় যে, ইসলাম যেন মসজিদের ভেতরেই আবদ্ধ থাকে; আল্লাহর প্রভুত্ব যেন মসজিদের বাইরে কায়েম না হয়ঃ কোরআনের আইনের কথা যেন কেউ না বলে এবং রাসূলের আদর্শ যেন সমাজে চালু হতে না পারে। আপনার মুসল্লীদের মধ্যেও এসব খেয়ালের কিছু লোক থাকতে পারে। তাঁরা হয়তো ইসলামের সার্বিক জ্ঞানের অভাবেই নামায পড়ার সাথে সাথে ঐসব জাহেলী মতবাদকেও সমর্থন করে।

বর্তমানে তিন প্রকার জাহেলিয়াতই সমাজে সক্রিয় রয়েছে। ইসলামের শিক্ষা ও রাসূলের জীবনাদর্শ এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

১। **ধর্মনিরপেক্ষবাদ**– জাহেলিয়াতের পহেলা ভিত্তিই এটা। আল্লাহকে স্রষ্টা মানতে ফেরাউন– নমরূদেরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে নিতে তারা রাযী ছিল না। সব নবীর সাথেই কর্তাদের এ নিয়ে টক্কর হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিশ্বাসীরা রাষ্ট্র, সমাজ ও গর্ভণমেন্টকে ধর্মের আওতার বাইরে রাখতে চায়। তারা আল্লাহ পাকের উপর ১৪৪ ধারা জারী করে দ্বীনকে মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়। অথচ দ্বীন ইসলামের দাবী হচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

২। **জাতীয়তাবাদ**–বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে দেশের মুসলিম- অমুসলিম সবাই আমরা বাংলাদেশী। বাংলা ভাষা আমার প্রিয় মাতৃভাষা। সে হিসাবে আমরা হিন্দু-মুসলিম নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী বা বাংলাভাষী। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ ও ভাষা জাতীয়তার ভিত্তি নয়। আদর্শের ভিত্তিতে ইসলাম জাতীয়তার সংজ্ঞা দেয়। শেষনবী (সঃ) আপন চাচা আবু লাহাবের সাথে একজাতি হতে পারেননি। ভাষা ও দেশের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও আদর্শ এক না হওয়ায় দু'জন এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হননি। অপরদিকে আফ্রিকার বেলাল (রাঃ) এবং পারস্যের সালমান (রাঃ) একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে আরবের আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সাথে একজাতি বলে গণ্য হলেন। এ কারণেই এক ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের মুসলমানরা অমুসলিম বাংলাদেশীদের সাথে মিলে একজাতি হতে পারে না। মুসলমান এক আদর্শিক জাতি। এক দেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের অমুসলমানগণ আমাদের দেশী ভাই। কিন্তু এক আদর্শের অনুসারী নয় বলে তাঁরা জাতি হিসাবে পৃথক।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে অবশ্যই বাঙ্গালী। বাংলাদেশের বাইরেও অন্যান্য দেশে বাঙ্গালী (বাংলাভাষী) রয়েছে। ইংরেজী ভাষাভাষী সব দেশের লোকই যেমন ইংরেজ জাতি নয়, তেমনি বাংলাভাষী সব দেশের লোকই বাঙ্গালী জাতি নয়। ভাষা কোথাও জাতিত্বের ভিত্তি নয়। সুতরাং আমরা বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে বাঙ্গালী, বাংলাদেশের অধিবাসী হিসাবে বাংলাদেশী এবং ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী হিসাবে মুসলিম জাতি। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী 'নেশন' কথাটি পরিভাষা হিসাবে প্রচলিত হলেও এটা রাজনৈতিক সংজ্ঞা মাত্র। আদর্শের সংজ্ঞায় আমরা মুসলিম জাতি। রাজনৈতিক সংজ্ঞায় এদেশের অধিবাসীদেরকে "বাংলাদেশী জাতি" বলা চলে। কিন্তু 'বাঙ্গালী জাতি" বলতে গেলে দেশের নাম বদলিয়ে শুধু 'বাংলা' বা বেঙ্গল রাখতে হবে। বাংলাদেশ নাম থাকা অবস্থায় "বাঙ্গালী জাতি" পরিভাষা হিসাবে শুদ্ধ হয় না।

৩। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম– এ দুটো শব্দ দ্বারা মূলত একই মতবাদ বুঝায় যা রাশিয়ার নেতৃত্বে বহু দেশে পশুশক্তির দাপটে চালু করা হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে মুসলিম আফগানিস্তানে রাশিয়া সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা করছে। সারা দুনিয়ার মুসলমান এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব রাশিয়ার এ আগ্রাসনকে নিন্দা করেছে। বাংলাদেশে রাশিয়ার পক্ষ থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা মনি সিং ঘোষণা করেছেন যে, "কাবুল স্টাইলে" এদেশেও সমাজতন্ত্র চালু করা হবে। রাশিয়ার আফগানিস্তান দখলের মতো ঘৃণ্য ব্যাপার পর্যন্ত এদেশে যারা সমর্থন করে, তারা সবাই রুশপন্থী সমাজতন্ত্রের

www.bjilibrary.com

বাহক। অবশ্য চীনপন্থীরা এর বিরোধী। যারা এদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চান, তাদের কথা, কাজ ও চরিত্রে ইসলামের কোন পরিচয় নেই। এদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস নেই বলে এদেরকে সাধারণ লোকের পক্ষে ইসলাম বিরোধী মনে করার সুযোগ কম। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ঢাকায় দাউদ হায়দার এবং ১৯৮১ সালে সিলেটে আলাউদ্দিন জাতীয় যে ক'জন ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে গণধিক্কৃত হয়েছে তারা সবাই সমাজতন্ত্রের সমর্থক।

মুহতারাম ভাই,

ইমাম হিসাবে আপনি মুসলিম জনগণের নিকট ইসলামের শিক্ষক। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান হেকমতের সাথে পরিবেশন করা না হলে দ্বীনের দায়িত্ব ঠিক মত পালন হয় না বলে আমার ধারণা। প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করলে সুন্দর যুক্তি দিয়ে মানুষকে এসব জাহিলী মতবাদের কুফল বুঝাতে পারবেন, এটাই আমার বিশ্বাস। যারা ঐসব মতবাদের সমর্থক, তারা অনেকেই হুজুগে মেতেই সেদিকে গিয়েছে। তারা আমাদের মুসলমান ভাই। দরদ দিয়ে তাঁদেরকে বুঝাতে হবে তাই বক্তৃতার সময়ও দরদের পরিচয় দিতে হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করলে রাসূলের নীতির খেলাফ হবে। "হিকমত" ও "মাওয়েযা- এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত তাদের দিলে পৌছাতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতি যে একমাত্র শোষণহীন ব্যবস্থা, তা পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের জানা নেই। পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তির দোহাই দিয়ে সমাজতন্ত্র মানুষকে চরম গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে, একথা দুনিয়ায় বাস্তবে প্রমাণিত। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পর থেকে একমাত্র ইসলামই যে মুক্তি দিতে পারে সেকথা বুঝাবার দায়িত্ব আপনাদেরকেই নিতে হবে। জনসাধারণকে সবরকম গুমরাহী থেকে হেফাযতের চেষ্টা করা না হলে আপনারাও এর কুফল থেকে রক্ষা পাবেন না। আফগানিস্তানের দুর্দশা এখানেও হবার আশংকা রয়েছে।

আপনার দেখমতে যা পেশ করেছি, তা একমাত্র দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণ মনে করেই করেছি। যদি এতে কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে সংশোধন হবার সুযোগ দেবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, "ইসলামী বাংলাদেশ" হিসাবেই এদেশের স্বাধীনতা বজায় থাকতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে আফগানিস্তানের মতো দুভার্গ্য যাতে টেনে আনতে না পারে, সেজন্য আপনাকে মুসলমানদের নেতা হিসাবে সজাগ থাকার আবেদন জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ইসলামে ইমামের যে মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সে মহাসম্মান দান করুন—এ দোয়াই করি- আমীন।

[১৯৮১ ও ৯০ সালে পুস্তিকাকারে ইমামগণের নিকট বিলি করা হয়]

www.bjilibrary.com

ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে বেহেশতের সুখ লাভ করার জন্য যে সহজ-সরল জীবন বিধান পাঠিয়েছেন, তারই নাম দ্বীন ইসলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজে আমল করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, আল্লাহর বিধান মেনে চললে সবচেয়ে মন্দ একটা সমাজও কিভাবে ভাল সমাজে পরিণত হয়। সেকালের সবচেয়ে অসভ্য আরবজাতি দ্বীন ইসলামের অনুসরণের ফলে চিরকালের জন্য মানব জাতির নিকট সভ্যতার আদর্শ কায়েম করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আখিরাতের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার উপায়ই শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ হিসাবে দুনিয়ার যত দায়িত্ব আছে, তা কিভাবে পালন করা উচিত এবং দুনিয়ার বস্তুগত যেসব মজা ভোগ করার জন্য দেয়া হয়েছে, তা কী নিয়মে ও কতটুকু ভোগ করা যায়, তিনি সে বিষয়েও বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করে বৈরাগী হতে বলেননি বরং দুনিয়াদারী করারই সঠিক নিয়ম শিক্ষা দান করেছেন। দ্বীন ইসলামে মানুষকে যা কিছু করতে হুকুম করা হয়েছে, তা এ দুনিয়াতেই পালন করতে হয়। আখিরাতে পালন করার জন্য কোন হুকুম দেয়া হয়নি। আখিরাতে দুনিয়ার কাজের ফলটুকু শুধু পাবে। সেখানে কোন কাজ করা লাগবে না। দুনিয়ায় যে রকম কাজ করা হয়, সে রকম ফলই পরকালে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ইসলাম এ দুনিয়ার জীবনের জন্যই এসেছে। ধর্মের নামে দুনিয়ার দায়িত্ব থেকে পালাবার কোন পথ আল্লাহ ও রাসূল দেখাননি।

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর কায়েম আছে– কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ।" ইসলামকে যদি দালানের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে এ হাদীসটির অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। দালান তৈয়ার করতে হলে প্রথমেই মযবুত ভিত্ বা বুনিয়াদ গাঁথতে হয়। এ ভিতের উপরই দালানের দেয়াল ও ছাদ তৈরী হয়। শুধু ভিত্ গাড়া হলেই তাকে দালান বলা যায় না। এবং যে কাজের জন্য দালান দরকার, তা শুধু ভিতের দ্বারা পুরা হতে পারে না।

ঠিক তেমনি ইসলাম হলো মানব জীবনের সব দিক ও বিভাগ এক বিরাট দালান। এ দালানের ভিত্ হলো ঐ পাঁচটি। এ ভিত ছাড়া ইসলামের দালান হতেই পারে না। আবার শুধু ভিতটুকু হলেই দালান হয়ে যায় না। আমাদের সমাজে ইসলামের দালান তো নেই- ই, এর পাঁচটি ভিত্ও মযবুত নয়।

www.bjilibrary.com

কালেমা তাইয়েবার সঠিক অর্থ না বুঝলে ঈমান কী করে পয়দা হবে? কুরআন ও হাদীসে নামায, রোযা দ্বারা যে রকম চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে,তা কয়জনের মধ্যে পাওয়া যায়? যাকাত ও হজ্জের বেলায়ও একই কথা। তাই মুসলমান হিসাবে আমাদের সবাইকে এসব বিষয়ে জানতে ও বুঝতে হবে।

এ ছোট্ট পুস্তিকায় পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে অতি সংক্ষেপে রোযা ও যাকাত সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী কথা পেশ করা হচ্ছে।

কালেমার সারকথা

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে কালেমা তাইয়েবাই প্রথম ও প্রধান। এ কালেমা কবুল করেই আল্লাহর কাছে মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়া যায়। কালেমা কবুল করার মানে হলো—এর অর্থ বুঝে মনে-প্রাণে সে কথা মানা। যে ব্যক্তি কালেমা তাইয়েবা কবুল করে, সে আসলে তার গোটা জীবনের জন্য বিরাট এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে ফায়সালা করে যে, সব বিষয়ে—চিন্তা ও চেষ্টায় এবং কথা ও কাজে সে একমাত্র আল্লাহর মরযী মতোই চলবে এবং রাসূল (সাঃ) যেভাবে আল্লাহর কথা মতো চলা শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই চলবে। এর বিপরীত কারো মত ও পথই চলবে না। একমাত্র আল্লাহর গোলাম হওয়াই কালেমার দাবী।

কালেমা মানে কথা। অর্থবোধক শব্দকেই কথা বলে। কালেমার অর্থ না বুঝলে কালেমার শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না। একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি বুঝা যায়। যেমন আগুন একটি শব্দ। এ শব্দটির মধ্যে আগুন নেই। আগুন দ্বারা গরম যে জিনিসটা বুঝায়, তারই নাম আগুন । আগুন শব্দের অর্থটাই আগুন—শব্দটাই আগুন নয়। ঠিক তেমনি কালোমা তাইয়েবার শব্দগুলো কালেমা নয়।

কালেমার অর্থের দিক বিবেচনা করলে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কালেমা কবুল করা মানে আল্লাহর নিকট দুটো বিষয়ে ওয়াদা কর

১। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমকর্তা (ইলাহ্) মানব না এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কোন হুকুম পালন করব না।

২। আল্লাহর হুকুম পালন করার সময় একমাত্র রাসূল (সাঃ)- এর শেখানো তরীকা অনুযায়ী পালন করব এবং রাসূল ছাড়া আর কারো কাঁছ থেকে অন্য তরীকা গ্রহণ করব না।

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ঃ

যে ব্যক্তি কালেমা কবুল করল, সে আসলে আল্লাহর সাথে দুটো বিরাট ওয়াদা করল। যে আল্লাহ হায়াত ও মওতের মালিক এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি যাঁর হাতে, সে মহান আল্লাহর সাথে ওয়াদা করা ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। এ ওয়াদা পালন করে চলা অত্যন্ত কঠিন। যারা চেষ্টা করেন মেহেরবান আল্লাহ দয়া করে এ কঠিন কাজ তাদের জন্য সহজ করে দেন।

www.bjilibrary.com

যারা সত্যিই এ ওয়াদা পালন করতে চায়, তাদের সবাইকে নিয়মিত রোজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতে এবং রমযান মাসের রোযা রাখতে হয়। কারণ নামায ও রোযার দ্বারা ঐসব যোগ্যতা ও গুণাবলী পয়দা হয়, যার ফলে কালেমার ওয়াদা পালন করা সহজ হয়। আর যাদেরকে আল্লাহ পাক টাকা-পয়সা বেশী দিয়েছেন, তাদের জন্য নামায, রোযা যথেষ্ট নয়। টাকা-পয়সা বেশী হলে পাপ করার ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়ে যায়। তাই তাদের জন্য যাকাত ও হজ্জের মাধ্যমে আরও কতক গুণ হাসিল করা জরুরী।

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে সবাই ইবাদত মনে করে। রুযী- রোযগার করা, সন্তান লালন-পালন করা এবং দুনিয়ার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করাকে সাধারণত ইবাদত মনে করা হয় না। আসলে ইবাদত মানে মনিবের দাসত্ব করা বা তাঁর হুকুম পালন করে চলা। আবদ মানে দাস। এ থেকেই ইবাদত শব্দ হয়েছে। মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় যত কাজ করতে হয়, তা যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করা হয়, তাহলে সব কাজই ইবাদতে পরিণত হয়।

দুনিয়ার সব কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করার মন-মানসিকতা ও অভ্যাস গড়ে তুলবার জন্যই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ফরয করা হয়েছে। এ কারণেই এ চারটি কাজকে "বুনিয়াদী ইবাদত" বলে মনে করতে হবে। কারণ এ চারটি ইবাদত দুনিয়ার সব কাজকে ইবাদত বানাতে সাহায্য করে।

রোযা ও যাকাতের সম্পর্ক

রোযার সাথে যাকাতের সম্পর্ক অতি গভীর। রমযান মাসে যে কোন নেক কাজ অন্য সময়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী মূল্যবান বলে এ মাসেপ্রায় সবাই যাকাত আদায় করে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, রমযানে একটি নফল কাজ অন্য সময়ে ফরযের সমান এবং একটি ফরয কাজ অন্য সময়ের ৭০টি ফরযের সমান। তাই রমযানের এ বরকত হাসিলের আশায়ই এ মাসে প্রায় সবাই যাকাত দিয়ে থাকে।

রমযানের মর্মকথা

কুরআন মজীদে রোযার মাসের নাম রাখা হয়েছে রামাদান। রামদা (رمض) শব্দের অর্থ হলো পুড়িয়ে দেয়া। রামাদান মানে যা জ্বালিয়ে দেয়। রামাদানকে সাধারণভাবে এদেশে রমযান বলে। রমযানের রোযা গুনাহকে পুড়িয়ে দেয় এবং নাফসের খাহেশকে জ্বালিয়ে দিয়ে আল্লাহর খাঁটি বান্দা বানায়। এটাই এ নামের স্বার্থকতা। মাহে রমযান আল্লাহর গোলামীরই ট্রেনিং।

কুরআন ও হাদীসে রোযাকে সাওম বলা হয়েছে। রোযা ফারসী শব্দ এবং এর অর্থ হলো উপবাস। আরবীতে' 'সাওম' শব্দের অর্থ হলো বিরত রাখা, বারণ করা বা ফিরিয়ে রাখা। রোযা মানুষকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রাখে, নাফসকে বারণ করে এবং শয়তানকে বান্দার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখে বলেই এর নাম হয়েছে সাওম। তাই

www.bjilibrary.com

হাদীসে সাওমকে 'ঢাল' ও বলা হয়েছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে ঢাল যেভাবে রক্ষা করে, রোযাও তেমনি নাফসের তাড়না ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচায়। রোযা তাদেরকেই বাচায়, যারা এ উদ্দেশ্য বুজে রোযা রাখে।

রোযার উদ্দেশ্য

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ *

(সূরা বাকারা , ১৮৩ আয়াত)

আল্লাহ-পাক বলেন, 'হে ঈমানদারগণ। তোমাদর উপর রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের দেয়া হয়েছিল—যাতে তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পার'। যারা তাকওয়ার পথে চলে, তাদেরকেই মুত্তাকী বলা হয়। মন যা চায় তা না করে, যা ভাল তা করা এবং যা খারাপ তা থেকে বেঁচে থাকাকেই তাকওয়া বলে। তাকওয়া মানে বেছে বেছে চলা। আল্লাহ-পাক ও রাসূল (সাঃ) যা পছন্দ করেন, তা করা এবং যা অপছন্দ করেন, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাকেই তাকওয়া বলে। আর যে এ চেষ্টা করে, তাকে মুত্তাকী বা পরহেযগার বলা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই এ নিয়মে চলতে পারে। তাই খোদাভীরু লোককে মুত্তাকী বলা হয়।

সত্যিই রোযা তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে, যে রোযা রাখে সে কখনও গোপনে চুরি করে খায় না। কঠিন পিপাসা লাগলেও রোযাদার লুকিয়ে পানি খেয়ে ফেলে না। লোক দেখানো কাজ অনেকেই আছে, কিন্তু অন্যকে দেখাবার জন্য রোযা রাখা যায় না। কে সত্যিই রোযা রেখেছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সঠিকভাবে জানতে পারে না। তাই রোযার পুরস্কার আল্লাহ নিজে দেবেন। এবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে রোযা এসেছে। এ সময় পৌষ-মাঘের চেয়ে লম্বা দিন। তার উপর আবার গরম। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় যত কষ্টই হোক রোযাদার তা সহ্য করে। ঘরে খাবার আছে, পকেটে পয়সা আছে, যা ইচ্ছা খেতে বাধা দেবার কে আছে? তবু কেন রোযাদার লুকিয়ে খায় না? আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কি কোন বাধা আছে? তাহলে প্রমাণ হলো যে, রোযা আল্লাহকে ভয় করে চলতে অভ্যাস করায়।

রোযার এ মহান উদ্দেশ্য যারা জানে, তারা রেওয়াজ হিসাবে রোযা রাখে না। তারা সচেতনভাবেই রোযা রাখে। তারা একমাত্র আল্লাহর খাতিরেই রোযা রাখে। আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য ও আল্লাহকে খুশী করার জন্যই তারা ইচ্ছা করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে। যারা আল্লাহর খাতিরে রোযায় এত কষ্ট করে, তারা আর সব ব্যাপারেও আল্লাহর হুকুম পালন করার যোগ্যতা লাভ করে। এভাবেই রোযা তাকওয়ার গুণ পয়দা করে।

রোযার শিক্ষা ও উপকারিতা

তাকওয়ার যোগ্য হওয়াই রোযার আসল উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করাই তাকওয়ার মূল লক্ষ্য। রোযার এ মহান উদ্দেশ্য ছাড়াও রোযার মাধ্যমে অনেক

www.bjilibrary.com

মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যায় এবং বহু সামাজিক উপকারিতা হাসিল করা যায়। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের মধ্যেই মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। রোযার মাত্র কয়েকটি বড় বড় শিক্ষা ও উপকারিতা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

(১) রোযা রাখার ফলে ধনীরা গরীবের দুঃখ বুঝবার যোগ্য হয় ক্ষুধার যে কী জ্বালা, তা রোযা ছাড়া ধনীদের পক্ষে বুঝার গরীবের জন্য দরদ ও মমতাবোধ সৃষ্টি করে।

(২) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও রোযা স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত উপকারী বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) রমযানের দিনে রোযা রাখা, রাতে তারাবীহ নামায আদায় করা, শেষ রাতে সেহরীর জন্য ওঠা এবং এসবের সাথে দৈনন্দিন যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ১৪/১৫ ঘন্টা ক্ষুধা ও পিপাসার পর ইফতারের সাথে সাথে শরীর চরম অবসাদে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। কিন্তু তরাবীহ নামাযের কারণে বিশ্রাম নেবারও সময় পাওয়া যায় না। শেষ রাতে খাবার পর ফজরের জামায়াতের আগে শোয়ারও উপায় নেই। রোযা সত্যিই কঠিন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে।

এভাবে একটানা পূর্ণ এক মাস যে সিয়াম সাধনা করা হয়, তাতে আরামপ্রিয় শরীরও বাধ্য হয়ে পরিশ্রমী হয়ে ওঠে এবং বিলাসিতা ত্যাগ করে।

(৪) এক মাসে পুরা কুরআন একবার পড়ার সৌভাগ্য কম লোকেরই হয় তারাবীহতে হাফিয সাহেবদের মুখে অল্প সময়ের মধ্যে গোটা কুরআন শুনে যে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায় এর কোন তুলনা নেই।

(৫) রমযান হলো মুমিনের জন্য সাওয়াব কামাবার খাস মাস। এ সময় একটি ফরয অন্য সময়ের ৭০টির সমান, আর নফলও ফরযের সমান। নেক কাজের এক বিরাট মওসূম। এক পয়সা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করলে ৭০ পয়সা খরচ করার সওয়াব পাওয়া যায়। একজন ভূখা লোককে খাওয়ালে ৭০ জনকে খাওয়াবার সাওয়াব হয়। তাই রমযানে রোযাদারদের বিরাট সুযোগ। যত বেশী নেক কাজ করা যায় ততই লাভ। এ কারণেই রমযানে প্রায় সবাই যাকাত দেবার চেষ্টা করে। এভাবেই রোযার সাথে যাকাতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

(৬) ঈদের দু'একদিন আগে ফিত্‌রা দান করে মুসলিম সমাজের গরীবদেরকেও ঈদের খুশীতে শরীক করা হয়। হাদীসে 'ফিতরা'কে 'গরীবের খাবার' বলা হয়েছে। ফিত্‌রা না দেয়া পর্যন্ত রোযা কবুল হয় না। রোযায় যেসব দোষ-ত্রুটি থেকে যায় ফিত্‌রা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় বলে হাদীসে ফিতরাকে 'যাকাতুস সাওম' বা 'রোযার পবিত্রকারী' নাম দেয়া হয়েছে।

যাকাতের সার কথা ঃ

যাকাত শব্দের অর্থ হলো পাক হওয়া, উন্নত হওয়া, বিকাশ লাভ করা ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলামী পরিভাষায় যাকাত মানে ঐ মাল, যা সচ্ছল মুসলমান ইবাদত মনে করে কুরআনের হুকুম মুতাবিক নির্দিষ্ট হারে দান করে।

www.bjilibrary.com

যাকাত আদায় করলে দাতার বাকী সব মাল পাক হয়। আল্লাহ যাকাতদাতার মালে বরকত দিয়ে বাড়িয়ে দেন এবং আখিরাতের উন্নত জীবন দান করেন। আল্লাহ মানুষকে যত নিয়ামত দান করেছেন, সে সবেরই শুকরিয়া আদায় করা উচিত। নামায ও রোযা দ্বারা স্বাস্থের শুকরিয়া আদায় হয়। কোরবানী দ্বারা পশু-সম্পদের শুকরিয়া, উশর দ্বারা ফসলের শুকরিয়া এবং যাকাত দ্বারা আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদের শুকরিয়ে আদায় করা হয়। যে যাকাত দেয়, সে আসলে এ কথা বিশ্বাস করে যে, "তার কাছে যত টাকা-পয়সা ও মাল-সামান আছে, তা আল্লাহরই মেহেরবানী এবং তার আসল মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহর কথা মতোই সে মাল আমাকে ব্যবহার করতে হবে। শুধু যাকাত দিলেই চলবে না। সমস্ত মালই আল্লাহর পছন্দমত খরচ করতে হবে। হারাম পথে করচ করা যাবে না। "যাকাত যেসব খাতে খরচ করার জন্য কুরআন-পাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই যে কোন কারণে কেউ মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হলে তার যাকাত পাওয়ার হক আছে। যাকাত দেবার ক্ষমতা নেই, সে যাকাত দিতে পারে।

যাকাত কোন্ কোন্ খাতে দিতে হবে?

যাকাত ইচ্ছামত যে কোন খাতেই খরচ করা যায় না। আল্লাহ-পাক নিজে কুরআন মজীদে এর জন্য ৮টি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ *

এ সাদকা শুধু তাদের জন্য—যারা ফকীর, মিসকীন ও যাকাত সংক্রান্ত কাজে যারা নিয়োজিত, যাদের মনকে (ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে) অনুগত করা দরকার তদের জন্য, বন্দী বা দাসদের মুক্তির জন্য এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়েছে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

১। এ আটটি খাতের মধ্যে ফকীরের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। অসহায় বিধবা, ইয়াতীম, পঙ্গু ইত্যাদি যাদের রোযগারের উপায় নেই বলে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, তারাই ফকীর।

২। মিসকীন ঐসব ভদ্রলোকদেরকে বলা হয়, যাদের প্রয়োজন পূরণ হবার মতো ব্যবস্থা নেই—অথচ তারা কারো কাছে চায় না। তারা আয় করার চেষ্টা করে কিন্তু তাতেও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। রাসূল (সাঃ) তাদের পরিচয় দিয়েছেন যে, তারা অভাবী হলেও কারো কাছে হাত পাতে না। এ দু'রকমের লোক যদি নিকট-আত্মীয় হয়, তাহলে তাদের হক পয়লা। দূরের আত্মীয় এর পর এবং অন্য লোক তাদেরও পর যাকাতের হকদার।

www.bjilibrary.com

৩। তৃতীয় খাত এখন নেই বললেই চলে। ইসলামী সরকার যাকাত বিভাগের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে এবং হকদারদের কাছে তা পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। এই বিভাগের কর্মচারীদের বেতন যাকাতের তহবিল থেকে দেয়া জায়েয। ইসলামী রাষ্ট্র এ দেশে নেই বলে এ খাতও নেই। যে সরকার নামায কায়েমের ব্যবস্থা করে না, সে সরকারের হাতে জনগণ যাকাত তুলে দিতে রাযী হয় না। কারণ তাদের হাতে যাকাত ঠিকমত ব্যবহার হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

৪। চতুর্থ খাত হলো. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অমুসলিমদের মনকে অনুগত করা এবং নওমুসলিমদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য।

৫। ৫ম খাত হলো ক্রীতদাস বা বন্দীদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

৬। ৬ষ্ঠ খাত হলো ঋণগ্রস্ত লোককে ধার শোধ করতে সাহায্য করা।

৭। ৭ম খাত হলো ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে দান করা।

৮। ৮ম খাত হলো মুসাফিরকে সাহায্য করা।

এ আটটি খাতে যাকাতের টাকা খরচ করার জন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আটটি উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কাজে যাকাত দেয়া ঠিক নয়।

কোন কোন খাত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঃ

আমাদের দেশের পরিবেশে যাকাতের টাকা খরচ করার ব্যাপারে ৩টি খাতই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ-১ম, ২য় ও ৭ম। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা ফকীর ও মিসকীন, তাদের হক সবচেয়ে প্রথম। আত্মীয়দেরকে পরের দুয়ারে হাত পাতার অপমান থেকে বাঁচাবার গুরুত্ব অনেক। গরীব আত্মীয়দের খবর জানা আত্মীয়ের পক্ষেই সহজ এবং তাদের অভাব দূর করা আত্মীয়দেরই দায়িত্ব।

আত্মীয়-স্বজনের বাইরে এ দেশের গরীবের হিসাব করাই অসম্ভব। বিশেষ করে যারা ঘরে ঘরে যেয়ে হাত পাতে এবং ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে,তাদেরকে বর্তমান পদ্ধতিতে যাকাত দিয়ে সমস্যার কোন সমাধন হবে না। এদের সমস্যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাধান করা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিলে ভিক্ষার অভ্যাস আরো বেড়েই যাবে। এতে যাকাতের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

৬ষ্ঠ ও ৮ম খাতও সরকারী উদ্যোগের বিষয়। অবশ্য ঋণগ্রস্ত আত্মীয় হলে এর গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন মুসাফির বাড়ীতে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে সফরে এসে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেলে তাকেও দিতে হবে। কিন্তু ভিক্ষার জন্য মুসাফির বেশ ধারণ করলে সে এ খাতের মধ্যে গণ্য নয়। যে যাকাত পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকে দিলে যাকাত আদায় হয় না।

১ম ও ২য় খাতের পর এদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতই হলো ৭ম খাত– আল্লাহর পথে দান।

www.bjilibrary.com

৭ম খাতের পরিচিতি

কুরআনের ভাষায় এ খাতটির নাম হয়েছে ফী সাবীলিল্লাহ। এর অর্থ হলো আল্লাহর পথে যে কোন ভালো কাজে খরচ করাকেই যদি আল্লাহর পথে খরচ মনে করা হয়, তাহলে এতগুলো ভাল কাজে খরচের উল্লেখ করে "আল্লাহর পথে" নাম দিয়ে আলাদাভাবে একটা খাতের কথা কেন বলা হলো?

এ কারণেই তাফসীরকারগণ "ফী সাবিলিল্লাহ"কে "জিহাদ ফি সাবীল্লিাহ" অর্থ করেছেন। জিহাদ ঐসব চেষ্টা-সাধনাকেই বলা হয় যার উদ্দেশ্য হলো বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করা। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনই হলো ৭ম খাত। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে যেসব কাজ করা হয়, তা এ খাতের মধ্যে শামিল।

অনেকেই জিহাদ মানে যুদ্ধ মনে করে। জিহাদ মানে চেষ্টা। জিহাদ মানে বিরোধী শক্তির সাথে মুকাবিলা করার চেষ্টা করতে থাকা। আর 'আল্লাহর পথে জিহাদ' মানে বাতিল শক্তির বাধার পরওয়া না করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। "ইসলামী আন্দোলন" পরিভাষাটি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর" সার্থক অনুবাদ। দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা ও বিজয়ী রাখার জন্য যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তা-ও জিহাদ হিসাবে গণ্য। যুদ্ধের জন্য কুরআনে 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিতাল মানে একে অপরকে কতল করা।

ইক্বামতে দ্বীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলনই রাসূল (সাঃ)-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল। রাসূল (সাঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনে ছিলেন, তাঁরাও ঐ দায়িত্ব পালনে রাসূল (সাঃ)-এর সাথী ছিলেন। সুতরাং মুসলিম হিসেবে আমাদেরও প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামকে কায়েম করা। এ কাজে যাকাত ব্যয় করার জন্য আল্লাহই নির্দেশ দিয়েছেন। এদেশে ইসলাম কায়েম নেই বলে এর গুরুত্ব আরো বেশী। তাই এ খাতে যাকাত দেবার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশী।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা ও গরীব-মিসকীনদেরকে যাকাত দেবার রেওয়াজ অতীতকাল থেকে চলে এসেছে। তাই এসব কাজে যাকাত দিতে কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে যাকাত দিলে ঠিক হবে কিনা, সে বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করে। এর কারণ এই যে, সমাজে এ খাতটি পরিচিত ছিল না। ইসলামী আন্দোলনের পরিচয় যতই বাড়ছে, ততই এ খাত সম্বন্ধেও সবার ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে।

যাকাত আদায়ের নিয়ম ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায আদায় করা ফরয। মুসলিম জীবনের জন্য জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের ওপর রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সফরে থাকা অবস্থায়ও আমীর নির্বাচিত করে জামায়াতবদ্ধভাবে চলবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। রোযা ও হজ্জ একই সময় সবাইকে একই সাথে আদায় করার হুকুম করা হয়েছে। যাকাতের বেলায়ও ইসলাম জামায়াতবদ্ধ পদ্ধতি দান করে।

www.bjilibrary.com

নামায কায়েম করা, রোযার হিফাযত করা এবং হজ্জের ব্যবস্থা করা যেমন ইসলামী সরকারের দায়িত্ব, তেমনি সরকারী ব্যবস্থায় যাঁকাতদাতাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা এবং হকদারদের হাতে তা পৌঁছে দেয়াই ইসলামের বিধান। বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী সরকার নেই বলে মানুষ বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগতভাবেই যাকাত দিয়ে থাকে। কিন্তু এটা সঠিক নিয়ম নয়। যাকাতের বহু হকদার লোক ধনীদের কাছে হাত পাতে না। যারা হাত পাতে, তারা ধনীর দয়া মনে করেই যাকাত পেয়ে থাকে। অথচ যাকাত পাওয়া গরীবের পাওনা বা হক এবং দেয়া হলো ধনীর কর্তব্য ও দায়িত্ব। যাকাত ধনীদের দয়া ও গরীবের ভিক্ষা নয়।

যাকাতের এ মর্যাদা বহাল রাখা এবং হকদারদের আত্মসম্মান বজায় রাখার প্রয়োজনে মুসলিম সমাজে জামায়াতবদ্ধভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইসলামী সরকার না থাকা সত্ত্বেও যেমন নামাযী মুসলমানরা মসজিদ ও জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা করে থাকে, তেমনি যাকাতের বেলায়ও ব্যবস্থা করা উচিত। তাই জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত সবাইকে জামায়াত জামায়াতবদ্ধভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের সুযোগ করে দিয়েছে।

যারা ইসলামের সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করতে চান, তারা জামায়াতের মাধ্যমে তাদের যাকাত আদায় করতে পারেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনে বা আল্লাহর পথে যারা যাকাতের কোন অংশ দান করতে আগ্রহী, তারা জামায়াতের মাধ্যমে এ মহান কাজে শরীক হবার মহা সুযোগ নিতে পারেন।

মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি বিশেষ আবেদন ঃ

পবিত্র রমযানে যাতে প্রতিটি মুসলিম রোযা রাখে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ইসলামী আইন অনুযায়ী কোন সক্ষম মুসলিম রোযা না রাখলে ফৌজদারীতে সোপর্দ হবে। কিন্তু এদেশে ইসলামী সরকার নেই বলে মুসলিম সমাজের উপরই এ বিষয়ে কতক দায়িত্ব বর্তায়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় ইসলামী আইন অন্যের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু আল্লাহর কোন বিধান অমান্য হতে দেখলে মানুষকে তা থেকে ফেরাবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব বলে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন।

তাই সকল সচেতন মুসলিমগণের প্রতি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গ্রাম, মহল্লা ও মসজিদ ভিত্তিতে নিম্নরূপ ৫ দফা কাজ করার আবেদন জানানো হচ্ছে ঃ

(১) এলাকাবাসীকে রমযানের রোযা রাখার জন্য আকুল আবেদন জানানো, তাদেরকে রোযার রহমত ও বরকত সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করুন। রোযাদারদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন, যাতে তারাবীহের নামায জামায়াতে আদায় করেন এবং মন্দ কাজ, মিথ্যা কথা ও ঝগড়া-ফাসাদ করে যেন রোযা নষ্ট না করেন।

(২) নিজ নিজ এলাকায় হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও খাবার দোকান ফজর থেকে আসর পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করুন।

www.bjilibrary.com

(৩) প্রত্যেক মসজিদে যেন খতম তারাবীহ-এর ব্যবস্থা হয়, সেজন্য চেষ্টা করুন, কারণ রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। প্রতিদিন কুরআনের ঐটুকু অংশ তিলাওয়াত করুন, যেটুকু পরবর্তী তারাবীহতে শুনবেন। তাহলে শুনে মজা পাওয়া যাবে। তারাবীহ-এর পর বা অন্য কোন সময় রোযার মাসআলা-মাসায়েল, রোযার ফযীলত ও হাক্বীকত সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চা করুন।

(৪) ঈদের আগেই ফিতরা আদায় করে এলাকার গরীব-মিসকীনকে ঈদের খুশীতে পূর্ণরূপ শরীক করার ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়ে বিশেষ করে গরীব আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখুন।

(৫) যাদের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, তারা যাতে যথানিয়মে যাকাত আদায় করেন, সে বিষয়ে তাদেরকে তাকীদ দিন। আপনার যাকাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইক্বামতে দ্বীনের জন্য দান করুন।

যাকাতের সাওয়াব ছাড়াও এ খাতের জন্য দেয় টাকা দিয়ে যেসব কাজ করা হবে, তারও সাওয়াব পাবেন এবং যদ্দিন এসব কাজ চালু থাকবে, তদ্দিন সাদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পেতেই থাকবেন।

[এ প্রবন্ধটি "পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষে বিশেষ আবেদন" নামে ১৯৮৫ ও ১৯৯০ সালে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়।]

www.bjilibrary.com

মুমিনের উপর কুরআনের হক

যারা কুরআন মজীদকে আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী বলে বিশ্বাস করেন তারা স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত পোষণ করেন। তারা কুরআনকে অন্যান্য বই এর মতো যেমনি তেমনি সাধারণ অবস্থায় রাখেন না। তারা গেলাফে মুড়িয়ে কোন উচ্চস্থানে সযত্নে রেখে এর প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করেন। তেলাওয়াত করার সময় কুরআনের সাথে অন্যান্য বই-এর মতো আচরণ করেন না। ওযুর সাথে বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তারা কুরআন পাঠ করেন। কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে মুহাব্বাতের সাথে চুমু খেয়ে এবং বুকে লাগিয়ে যে ভক্তি প্রকাশ করেন তা আর কোন কিতাবের বেলায় করেন না।

যারা এভাবে কুরআনকে ভালবাসেন তারা যদি কুরআনের সত্যিকার মর্যাদা বুঝেন এবং কুরআন তাদের কাছে কি দাবী করে তা উপলব্ধি করেন তবেই ঐ ভক্তি ও মুহাব্বাত সার্থক হবে। কুরআন শুধু ভক্তির সাথে তেলাওয়াত করাই যে মোটেই যথেষ্ট নয় সে বিষয়ে অনেকেই সচেতন নয়। তাই এ বিষয়ে ধীর চিত্তে বিবেচনা করার জন্য একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

যারা কুরআন তেলাওয়াতই করেন না তারা তো কুরআনের প্রাথমিক দাবীই পূরণ করছেনা। কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান কতটুকু তার কোন বাহ্যিক সামান্য প্রকাশই হয় না। কুরআনের দাবী পূরণের প্রশ্নই তাদের বেলায় উঠে না। যারা কুরআন তেলাওয়াত করেন তাদের নিকটই কুরআনের দাবী পূরণের আশা করা যায়। কারণ তারা কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন। কুরআনের দাবী সম্পর্কে সচেতন হলে তারা তা পূরণ করতে চেষ্টা করবেন বলে আশা করা যায়। এ জাতীয় মুমীনদের নিকট কুরআনের দাবী কী তা জানার আগ্রহ তাদের মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক।

কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই কুরআনে যা বলেছেন তা থেকেই এর গুরুত্ব বুঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"রামাদান ঐ মাস যখন কুরআন নাযিল হয়েছে। ইহা মানুষের জন্য হেদায়াত (পথ প্রদর্শক) এবং সঠিক পথ প্রদর্শন ও (ভাল মন্দের মধ্যে) পার্থক্য করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট।" (সূরা বাকারা ১৮৫ আঃ)

এ আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, কুরআনের কারণেই রামাদান মাসের এত মর্যাদা। আসল মর্যাদা হলো কুরআনের। রামাদান মাসে কুরআন নাযিল হওয়ার কারণেই এ মাসের এত মূল্য। রোযা রাখার জন্য অন্য কোন মাসও আল্লাহ বাছাই করতে পারতেন। কিন্তু রোযার জন্য এ মাসটিকে বাছাই করে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা কুরআনের কারণেই হয়েছে। রোযার মাসে রাতের নামাযে কুরআন বেশী পড়ার যে বিধান রয়েছে তার কারণেও রামাদান মাসকে রোযার মাস হিসাবে নির্ধারিত

www.bjilibrary.com

করা সবচেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এ মাসেই যখন কুরআন নাযিল হয়েছে তখন কুরআনের চর্চা এ মাসেই বেশী হওয়া উচিত। তাই এ মাসে রোযা হওয়ায় কুরআনের চর্চা বেশী হবার সুযোগ রয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে কুরআনের কারণেই এ মাসটি রোযার মাস হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। তাই এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, রামাদান মাস কুরআনেরই মাস।

বাংলাদেশে রামাদানের মর্যাদা ঃ

বাংলাদেশের মুলমানদের জন্য এটাও একটা গৌরবের বিষয় যে রামাদান আসলে টের পাওয়া যায় যে কুরআনের মাস এসেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মসজিদে মসজিদে খতমে তারাবীহের যে ব্যবস্থা হয় তার ফলে এশার নামাযে বিপুল সংখ্যায় রোযাদাররা হাজির হয়। অন্য মাসে মসজিদে এশার নামাযে এত মুসল্লি সাধারণতঃ হয় না। হাফিজ সাহেবদের মুখ থেকে কুরআন শুনবার এ আগ্রহের ফলে কুরআনের মাস হিসাবেই রামাদান মাসকে পালন করা হচ্ছে বলে মনে হয়। তাছাড়া এ মাসে রোযাদাররা অন্য মাসের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করে থাকে। ঈমানের বহু বড় বড় দাবী পূরণের ব্যাপারে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে অনেক অভাব থাকা সত্ত্বেও তারাবিহের নামাযে কুরআন খতম করার প্রচলন বহু আরব দেশ থেকেও এখানে অনেক বেশী রয়েছে। এটাও এদেশের মুসলমানদের উপর আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী। খতমে তারাবীর কারণেই এত হাফিয এদেশে তৈরী হচ্ছে। খতমে তারাবীহের এ রেওয়াজ হাফিয সাহেবদের কুরআন মুখস্থ রাখা সহজ করে দিয়েছে।

মানব জাতির জন্য হেদায়াত ঃ

উপরোক্ত আয়াতে কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কুরআন মানুষের জন্য হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক। সৃষ্টি জগতের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, মানুষের জন্যই হেদায়াত প্রয়োজন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় বিধান তৈরী করে আল্লাহ নিজেই তা জারী করে দিয়েছেন। ঐ সব সৃষ্টিকে ঐ বিধান মানা ও না-মানার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দেননি। মানুষের দেহের জন্যও যাবতীয় নিয়ম বিধান এভাবেই তিনি জারী করেছেন।

কিন্তু সৃষ্টি জগতে মানুষ ও জ্বিনই একমাত্র নৈতিক জীব। ভাল ও মন্দের চেতনা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ নৈতিক চেতনা দেবার সাথে সাথে মানুষকে চিন্তা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষের নৈতিক জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে নবীর মাধ্যমে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তা পালন করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়নি। নবীর মাধ্যমে প্রেরিত হেদায়াত মানা ও না মানার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। তাই যারা মানবে তারা পুরস্কার পাবে, আর যারা মানবে না তারা শাস্তি পাবে।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতের সব কিছুকেই নিজেদের খেদমতের জন্য ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন। গোটা বস্তুজগত মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে

www.bjilibrary.com

বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা বাকারা ২৯ আয়াত)। এ বস্তুজগতকে ব্যবহার করার উপযোগী হাতিয়ার হিসাবে মানুষকে যে দেহযন্ত্র দান করা হয়েছে তার মধ্যেও অগণিত শক্তি রয়েছে। যেমন চিন্তাশক্তি, দেখা-শুনা ও কথা বলার শক্তি, বিচার-বিবেচনা করার শক্তি, অনুভূতি শক্তি কাম-ক্রোধ-লোভ-ভালবাসা ইত্যাদি অগণিত শক্তি এতে আছে।

বস্তুজগত ও দেহযন্ত্রকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কোনটা করা তার জন্য মংগলজনক এবং কোনটা ক্ষতিকর এ বিষয়ে সঠিক হেদায়াত প্রয়োজন। সূরা বাকারার ১৮৫ আয়াতে কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে একথাই বলা হয়েছে। তাই মানবজাতি হেদায়াতের বড় কাংগাল। সঠিক হেদায়াত না পেলে অশান্তি ও দুঃখ অনিবার্য তাই মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শক হিসাবেই কুরআন নাযিল হয়েছে।

কুরআনের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর দায়িত্ব ঃ

আল্লাহপাক বই আকারে এ কুরআনকে পাঠাননি। কুরআনকে মানুষের কাছে পৌছাবার দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সাঃ)কে পাঠিয়েছেন।

"আল্লাহপাক মুমিনদের উপর মেহেরবানী করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদের জীবনকে পবিত্র করে দেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।" (আলে ইমরান- ১৬৪ আঃ)

এ আয়াতটিতে রাসূলের চারটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। এ চারটি কাজের কথা সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ আয়াতে এবং সূরা জুমুয়ার ২য় আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। এসব কটি আয়াতেই আল্লাহর আয়াত সমূহকে তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দেবার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলে ইমরান ও জুমুয়াতে যে কাজটিকে ২য় নম্বরে উলেখ করা হয়েছে সে কাজটি বাকারার ১২৯ আয়াতে সব শেষে দেয়া হয়েছে। ঐ চারটি কাজের মধ্যে মুমিনদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেবার কাজটিকে কোথাও ২য় কাজ, আবার কোথাও ৪র্থ কাজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সব কটি আয়াতেই ঐ চারটি কাজের কথা রয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য সূরা বাকারার ১২৯ আয়াতের ক্রম অনুযায়ী ঐ চারটি কাজের ব্যাখ্যা দিচ্ছিঃ

১। পয়লা নম্বর কাজ হলো কুরআনের আয়াতসমূহকে তেলাওয়াত করে মুমিনদেরকে শুনিয়ে দেয়া।

২। দ্বিতীয় কাজ হলো তাদেরকে কুরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেয়া।

৩। তৃতীয় কাজ হলো তাদেরকে হিকমাত শিক্ষা দেয়া অর্থাৎ কুরআনের আলোকে ইসলামকে এতটা বুঝবার যোগ্য বানানো যাতে তারা নিজেদের জীবন কুরআন অনুযায়ী যাপন করতে পারে এবং কুরআনকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

www.bjilibrary.com

৪। চতুর্থ কাজ হলো তাদের জীবনে কুরআন বিরোধী কিছু থাকলে তা থেকে তাদেরকে পাক করে দেয়া।

এ চারটি কাজের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিচরিত্র গঠন করেছিলেন। আমাদের দেশে রামাদান মাসে কুরআনের যেটুকু চর্চা দেখা যায় তা শুধু প্রথম কাজটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা, তারাবীহ নামাযে হাফিয সাহেবদের কাছ থেকে তেলাওয়াত শুনার কাজটিই শুধু চালু আছে। আর বাকি তিনটি কাজের চর্চা কুরআন তেলাওয়াতকারীদের মধ্যেও নেই বললেই চলে। তেলাওয়াতকারীদের শতকরা একজনও সঠিক অর্থে ঐ তিনটি কাজে সক্রিয় কিনা সন্দেহ।

মুমীনের উপর কুরআনের হক ঃ

সূরা বাকারার ১২৯ আয়াতে রাসূল (সাঃ)-এর উপর কুরআনের ব্যাপারে যে চারটি দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে সে দায়িত্ব তাদের উপরও প্রযোজ্য যারা এ কুরআন ও রাসূলের উপর ঈমান আনে। রাসূল (সাঃ) এর উপর যে সব দায়িত্ব ছিল তা সাহাবায়ে কেরামকেও পালন করতে হয়েছে। সাহাবী মানে সাথী। সাহাবায়ে কেরাম শুধু নামাযের বেলায়ই রাসূলের সাথী ছিলেন না। সব দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেই তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর সাথী ছিলেন। সুতরাং কুরআনের ব্যাপারে যে চারটি কাজ রাসূলকে দেয়া হয়েছিল তা মুমিনদের উপরও অবশ্য কর্তব্য।

কুরআন শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা ও অন্যদেরকে শুনানো, কুরআন নিজে বুঝা ও অন্যদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা, কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপনের চেষ্টা করা ও অন্যদেরকে তা শিক্ষা দেয়া এবং নিজের জীবনকে কুরআন বিরোধী চিন্তা ও কর্ম থেকে পাক করা ও অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা সত্যিকার মুমিনদের দায়িত্ব। এসবই মুমিনদের উপর কুরআনের হক। শুধু তেলাওয়াতের দ্বারা চারটি হকের প্রাথমিক হক মাত্র আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল হক কিছুতেই আদায় হবে না। কুরআন পাকের প্রতি কর্তব্য পালনের সাধনা ছাড়া মুমিনের জীবন গড়ে উঠা কিছুতেই সম্ভব নয়।

রাসূলের আসল দায়িত্ব কি ছিল?

রাসূল (সাঃ) এর নবুয়াত লাভের পর ১৩ বছরের মাক্কী জীবনে উপরোক্ত চারটি কাজের ভেতর দিয়ে একদল এমন লোক তৈরী হলেন যারা নিজেদের মন-মগজ চরিত্র কুরআনের ছাঁচে গঠন করতে সক্ষম হলেন। এভাবে আরবের অসভ্য সমাজের মধ্যে থেকে এমন কতক চরিত্রবান মানুষ তৈরী হলেন যাদেরকে অত্যন্ত ভাল মানুষ বলে তারাও স্বীকার করতে বাধ্য ছিল যারা রাসূল (সাঃ) এর চরম বিরোধিতা করছিলো।

এখন প্রশ্ন হলো যে, একদল নেক ও ভাল মানুষ গঠন করাই কি রাসূল (সাঃ) এর আসল দায়িত্ব ছিল? এ বিষয়ে কুরআনের তিনটি সূরায় বলিষ্ঠ ঘোষণা রয়েছে।

www.bjilibrary.com

"তিনিই সে সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে (রাসূল সাঃ) ঐ দ্বীনকে (মানব রচিত) সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা তাওবা ৩৩, ফাতহ ২৮, সাফ ৯ আয়াত) কুরআন যে দ্বীন বা জীবন বিধান নিয়ে এসেছে তা অন্য কোন সমাজ বিধানের অধীনে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কুরআনের বিধানকে বিজয়ী করাই রাসূলের আসল দায়িত্ব ছিল।

এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যই কুরআনের ভিত্তিতে একদল লোক তৈরী করা প্রয়োজন ছিল। মাক্কী জীবনের ১৩ বছরে সে কাজটি সমাধা হবার পর তাদেরই দ্বারা কুরআন মদীনায় বিজয়ী হয়েছিল। যদি কুরআনের ভিত্তিতে একদল লোক তৈরী না হতো তাহলে এ বিজয়ের কোন বিকল্প পথ ছিল না। যাদের মন-মগজ-চরিত্রে কুরআন কায়েম হয় তাদেরই হাতে রাষ্ট্র ও সমাজে কুরআন কায়েম হতে পারে। যাদের ব্যক্তি-জীবনেই কুরআন কায়েমের প্রচেষ্টা নেই তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কেমন করে কুরআনকে বিজয়ী করবে?

যে নবীদের জীবনে এভাবে একদল সাথী যোগাড় হয়েছে তাদের হাতেই দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। আর যাদের সময় তা সম্ভব হয়নি তাদের কাওমকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে দ্বীন বিজয়ী হতে পারেনি।

দ্বীনের বিজয়ের জন্য দুটো শর্ত ঃ

আল্লাহর দ্বীন তখনই বিজয়ী হয় যখন কোথাও দুটো শর্ত পূরণ হয়। প্রথম শর্তই হলো এমন একদল লোক তৈরী হওয়া যাদের মন-মগজ-চরিত্র দ্বীনের ভিত্তিতে গঠিত। এমন একদল লোক যোগাড় হওয়া সত্ত্বেও দ্বীন বিজয়ী হবে না যদি দেশের অধিকাংশ লোক দ্বীনের বিরোধী হয়। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) এর সময় প্রথম শর্তটি মক্কায় পূরণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় শর্তটি না থাকায় সেখানে দ্বীন বিজয়ী হয়নি। মদীনার অধিকাংশ জনগণ বিরোধী ছিল না বলে সেখানে বিজয় সম্ভব হয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন দেশের অধিকাংশ লোক যদি দ্বীনের বিরোধী না হয় এবং যদি সেখানে দ্বীনের ভিত্তিতে গঠিত চরিত্রবান লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা আসে তাহলেই দ্বীনের বিজয় সম্ভব।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে উপরোক্ত দুটো শর্তের দ্বিতীয়টি পাওয়া গেলেও প্রথম শর্তটির অভাব রয়েছে। এটা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয় যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর জন্মভূমি মক্কায় যে শর্তটি পাওয়া যায়নি তা আমাদের জন্মভূমিতে উপস্থিত রয়েছে। এ অবস্থায় যদি প্রথম শর্তটির অভাবে এ দেশে কুরআনের দ্বীন বিজয়ী না হয় তা হলে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে?

এ শর্তটি পূরণ হলে আল্লাহ এ জাতীয় লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেবার সুস্পষ্ট ওয়াদা করেছেন সূরা নূরের ৫৫ আয়াতে। আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যদি একদল ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোক পাওয়া যায় তাহলে তাদের হাতে আমি খেলাফতের দায়িত্ব তুলে দেব।"

www.bjilibrary.com

এমন একদল মানুষ গড়ে তোলাই জামায়াতে ইসলামীর সাধনা। এ কারণেই জামায়াতের প্রাথমিক কর্মীদেরকেও কুরআন শুদ্ধ করে পড়া, কুরআনের অর্থ বুঝা, কুরআন অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং কুরআন বিরোধী মত, পথ, চিন্তা ও কর্ম থেকে নিজেদেরকে পাক করার জন্য ব্যক্তিগত কর্মসূচী দেয়া হয়। এ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মীকে সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয় না।

রামাদান ও কুরআন ঃ

রামাদান মাসে আমাদের দেশে যারা তেলাওয়াতে কুরআনের গুরুত্ব অনুভব করেন তারাই খতমে তারাবীহ নিয়মিত আদায় করেন। যারা নামায, রোযা ও তারাবীহের ধার ধারে না তাদের সম্পর্কে এখানে আমি কিছুই বলতে চাই না। যারা রামাদান এলেই উৎসাহের সাথে কুরাআন তেলাওয়াত করেন ও খতমে তারাবীহ আদায় করেন তাদের নিকট এ আবেদনই জানাই যে কুরআনের প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে সাহাবায়ে কেরামের সংগঠন থেকে ব্যক্তি গঠনের যে বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী জামায়াতে ইসলামী গ্রহণ করেছে সে পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই

রামাদান মাস আমাদেরকে কুরআনের প্রতি আমাদের এ বিরাট দায়িত্বের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। রামাদানে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা ও খতমে তারাবীহ আদায় করা তাদের জীবনেই সার্থক হবে যারা কুরআনের প্রতি বাকী তিনটি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

www.bjilibrary.com

শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য

শাহাদাত শব্দের অর্থ ঃ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষ্য সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। "আশ শাহিদ" মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মজীদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে প্রকৃতপক্ষে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে ইসলামকে সে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত দু'ধরনের অর্থ বুঝাবার জন্য কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত আছে। وكفى بالله شهيدا অর্থাৎ যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সাক্ষী অর্থে নিম্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ .

(البقرة ١٤٣)

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার। (সূরা বাকারা ১৪৩)

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ .

(الحج ٧٨)

"যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার।" (সূরা হাজ্জ ৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৪০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে-

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ .

এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার,আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশী আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে

www.bjilibrary.com

يَقْتُلُوْنَ فَيُقْتَلُوْنَ .

"যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে" এভাবে বহু জায়গাতে শহীদদের কথা বলা হয়েছে।

وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهٗ . (ال عمران ١٣٩)

এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছ। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।

وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ .

এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন। কেন জয় পরাজয় দেয়া হয় এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ (ال عمران ١٤٠)

আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয়ও দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কার কার মজবুত ঈমান তা দেখার জন্যে, আর তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্যে। এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত শহীদ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়। সাক্ষ্য দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষ্য। আল্লাহর পথে নিহত যে, সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে।

মুমিন জীবনের কাম্য ঃ

মুমিন জীবনের কাম্য কি হতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষিভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়ীতে ভোগ করে তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবী মুমিন জীবনের লক্ষ্য তাকে এক কথায় বলা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসূল (সঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন 'এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো। হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবী বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই

www.bjilibrary.com

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আর মুমিন বেঁচে থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য।

দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মতো। ব্যক্তির জীবনে খেলাধূলারও প্রয়োজন আছে কিন্তু সারাটা জীবনই খেলা নয়, খেলা হলো সামান্য কিছু সময়ের জন্য। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার। আমরা যেমন লেখা-পড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময় খেলাধূলা করে থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাতে কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিতে হবে অথবা এটাকেই একমাত্র দ্বীন বানিয়ে নিতে হবে। মুমিন জীবনে এটাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহলে শাহাদাত তার জীবনের স্বাভাবিক কাম্য বিষয় হবার কথা। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে যে জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদূদী মরহুমের ফাঁসীর হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মওতের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়। এসময়, এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও?" এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নযীর সৃষ্টি করে গেছেন। এখওয়ানুল মোসলেমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে শাহাদাত বরণ করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। এতে এটিই প্রমাণিত হলো ইসলামের প্রতি তার আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এযুগেও তা বাস্তব। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা মানুষকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম ঃ

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভালো ছাত্র যেমন ভালো ফলাফলের প্রমাণ দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপোসহীনভাবে লড়াই করে যাবে। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা নিজের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে প্রমাণ পেতে পারে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে

www.bjilibrary.com

হয় না। আন্দোলনের কর্মকান্ডে, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ (نساء ٧٤)

আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহর পথে যে লড়াই করে ও নিহত হয়, কিংবা বিজয়ী হয়, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। (সূরা নেছা -৭৪)

বস্তুতঃ যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় তারাই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পারে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়–যুদ্ধে মারা ও মরা অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করার কাজই কিতাল। যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহর বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না যারা কাফের বেঈমান তারাও কিতাল করে। মুমিনরা কেতাল করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা কেতাল করে তগুতের পথে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ (النساء ٧٦)

আল্লাহর নাফরমানীর কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানীরও সীমা লংঘনকারী। তাগুত নিজেতো আল্লাহর হুকুম পালন করে না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানীর এ সীমা লংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে বলে অপরাধী, আর কেউ যদি রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাহলে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিসকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতী শক্তিগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। যে কলেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাতে আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এর পরই আসে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে পূর্ণভাবে ঈমানকে

www.bjilibrary.com

উপলব্ধি করতে পারবে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমে আগাছাসমূহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে ধান পাবার আশা অর্থহীন। অনুরূপভাবে মনে ঈমানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। আর তাগুত কি তা না জানলে উৎপটন করবে কি করে? বস্তুতঃ তাগুত ও ঈমান এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না হয় তাগুতের পথে। কেননা, আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, খেলাফতের মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মর্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিসের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষ কিতাল করছে হয় ফী সাবিলিল্লাহ না হয় ফী সাবিলিত্ তাগুত, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে ।

শহীদের কামনা ঃ

জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় যারা জীবন দান করে তাদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন। সূরা বাকারার ১৫৪ আয়াতে বলা হচ্ছে

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ـ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।" সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াতে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ، وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ، اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্ক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো তথায় পৌছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।"

উল্লেখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে যারা শহীদ হয়েছে তারা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যেসব সাথী দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এপথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। হাদীস শরীফে আছে সারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে তারা কামনা করে যে, তাদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও

www.bjilibrary.com

যেন এ মর্যাদা পায়। এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভায়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশী হবে। অপর এক হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সঃ) বলেন 'জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নেয়ামতগুলো পেয়ে এতো তৃপ্ত হবে যে, তাদের কেউ এ নেয়ামত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম।' বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন 'জান্নাতে যারা যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবেনা যে, সে দুনিয়ায় আবার ফিরে আসুক কিন্তু শহীদগণ কামনা করবেন যে আল্লাহ দুনিয়ায় তাদেরকে আবার ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তারা করবে।

শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কুরআন থেকে দুটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

সূরায়ে আল হাজ্ব এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে;

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْآ اَوْ مَاتُوْا يَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

"যারা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিযকদাতা।"

সূরায়ে মুহাম্মদের ৪-৬ নং আয়াতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে;

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ وقف ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۔ سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ج وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٥

"অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হল গলা কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন খুব ভালভাবে তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ-অস্ত্র সংবরণ করে। এই-ই হল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই

www.bjilibrary.com

সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন কিন্তু তিনি এ পন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।" তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তাদেরকে সে জান্নাতে দাখিল করবেন যার বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করিয়াছেন।

এখানে যে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে —

১। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের আমল কোন ক্রমেই নষ্ট হবে না।

২। আল্লাহ তাদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়ি পাল্লার ব্যাপার নেই।

৩। তাদের অবস্থা সব দিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।

৪। তাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার পরিচয় আগে থেকেই দেয়া থাকবে। দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোশখবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, এমন নয় যে বলা হয়েছে একটায় আর প্রবেশ করান হবে অন্যটায়।

হাদীসটি হচ্ছে -

নবী করীম (সঃ) বলেন 'জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়া তলে।'

তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যে আসলনা তার আবার জান্নাত কিসের? কত জোর দিয়ে বলা হচ্ছে জেনে রাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে।

শেষ পর্যায়ে এসে কতগুলো হাদীস উল্লেখ না করলে উপরের কথাগুলো পরিষ্কার হয় না। শাহাদাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখপূর্বক এখানে ৬টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত রাবীয়াতুল কায়াব (রাঃ), তিনি বলেছেন আমি নবী করীম (সঃ) এর খেদমত করতাম দিনের বেলা, রাতে চলে যেতাম। একরাত্রি আমি রসূল (সঃ) এর খেদমতে রয়ে গেলাম। আমি শুনলাম যে রসূল (সঃ) কেবল ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে দেখ ছুবহানাল্লাহ পড়লে 'মিজান' পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হল। এ রকম প্রায়ই হত। একদিন রসূল (সঃ) বললেন হে রাবিয়া, আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দেব। আমি বললাম দুনিয়াটাতো নষ্ট হয়ে যাবে, এটি চেয়ে কি লাভ। আমি বললাম আমি একটু চিন্তা করে নিই যে, আমি কি চাইব। আমি ভাবলাম আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রসূল (সঃ) বললেন—এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবং বললেন কে তোমাকে এ কথাটি শিখালো? আমি বললাম কেউ আমাকে

www.bjilibrary.com

শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সংগে সংগে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এজন্য এ দোয়া করবেন। রসূল (সঃ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য এ দোয়া করব। আমাকে তুমি সাহায্য কর বেশী বেশী সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব তোমার জন্য এ দোয়া কবুল হবে বেশী বেশী সিজদা করলে বা নামায আদায় করলে।

আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদিন আমি রসূল (সঃ) এর কাছে বললাম ইয়া-রাসূলাল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যে আমল করলে আমি বেহেশতে যাব। মানে বেহেশতই তাদের ধান্ধা, দুনিয়ার কোন ধান্ধা নেই।

২। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওহোদের দিনে যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রসূল (সঃ) বললেন হে জাবির, তোমার বাবাকে আল্লাহ কি বললেন তাকি তোমাকে আমি বলব? আল্লাহ তায়ালা কারো সংগে সরাসরি কথা বলেন না কিন্তু তোমার বাবার সংগে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন হে আব্দুল্লাহ তুমি আমার কাছে কি চাও। তিনি বললেন হে আল্লাহ তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ! বললেন, যে এ নিয়ম তো নেই, আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন হে আল্লাহ তাহলে অন্ততঃ এটা কর, আমি এই যে আকাঙক্ষাটা করলাম এটি আমার পেছনে যে ভায়েরা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দাও। এরপর এ আয়াত নাজিল করে আল্লাহ এ কথাটা পৌঁছে দিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াত এ উদ্যেশ্যেই নাজিল হয়েছে।

৩। আনাস (রাঃ) বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নাজার বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রসূলকে (সঃ) বললেন হে আল্লাহর রসূল, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পয়লা যে যুদ্ধ করলেন, সে যুদ্ধে আমি তো হাজির ছিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা কোন যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবে আমি কি করি। যখন ওহোদের দিন আসলো তখন মুসলমানদের কিছু লোক ভুল করলো এবং দুরবস্থা দেখে কিছু লোক ভেগে গেল, তখন তিনি আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হে আল্লাহ! আমার ভায়েরা তোমার সাথে যে আচরণ করলো এজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর মুশরিকরা যে আমাদের সাথে এ আচরণ করলো, এ ব্যাপারে আমি দোষী নই। এরপর তিনি আগে বেড়ে গেলেন এবং সাঈদ বিন মায়াজ (রাঃ) এর সাথে তার দেখা হলো। বললেন হে মায়াজ! জান্নাত, জান্নাত, আমি সাহায্যকারী রবের কছম করে বলছি আমি ওহোদের দিক থেকে জান্নাতের গন্ধ পাচ্ছি।

অতঃপর সাদ বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ,ইনি যুদ্ধে যা দেখালেন আমি তা পারতাম না। আনাস বললেন আমার চাচার গায়ে আমি আশিটি যখম দেখলাম। প্রায় সবই তলোয়ারের, বল্লমের ও তীরের আঘাত। দেখলাম মুশরিকরা তাকে নিহত করেই ক্ষান্ত

www.bjilibrary.com

হয়নি, একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি, একমাত্র তার বোন তার আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন—আমরা সকলেই ধারণা করি এ আয়াতটি এ জাতীয় ঘটনার পর নাজিল হয়েছে (সূরায়ে আহযাবের ২৩ নং আয়াত)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عٰهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ وَ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۔ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً ۔

"মুমিনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের আচরণ বদলায়নি।

৪। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত কতক লোক রসূলের (সঃ) কাছে এসে বললো হে রাসূল, আমাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য কিছু লোকদিন। আল্লাহর রসূল আনসারদের মধ্যে থেকে সত্তর জন লোক তাদের সাথে দিয়ে দিলেন, তাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য। তারা সব কারী ছিলেন, এদের মধ্যে আমার মামা হারাম শরীফ ছিলেন। তারা রাতের বেলা কোরআন শিখাতেন, আর দিনের বেলা পানি উঠাতেন। পানি এনে মসজিদে রাখতেন, তারা দিনের বেলা আরো একটি কাজ করতেন। তারা লাকড়ি কুড়াতেন, বাজারে বিক্রি করে তা দ্বারা আহলে ছুফফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাবার কিনে আনতেন। ঐ লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদেরকে কতল করে ফেলল, সত্তর জনকেই কতল করল। যখন তাদেরকে কতল করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমাদের নবীর কাছে খবরটা তুমি পৌছিয়ে দাও, যে আমরা আমাদের রবের সংগে সাক্ষাত করেছি, আমরা আমাদের রবের উপর খুশী হয়ে গেছি আর রবও আমাদের উপর খুশী হয়ে গেছেন। আমাদের মামা হারামের কাছে একজন লোক আসলো এবং পিছন থেকে বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করল। বর্শা শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে গেল। তিনি বললেন—কাবার রবের কসম আমি কামিয়াব হয়েছি। অহীর মাধ্যমে এ খবর রসূল (সঃ) জানতে পেরে, লোকদেরকে বললেন—দেখো তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়ে গেছে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করল—"হে আল্লাহ আমাদের নবীকে এ কথা পৌছায়ে দিন যে আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, আমাদের কুরবানীতে আমাদের রব খুশী হয়েছেন এবং আমরা আমাদের রবের পুরস্কার পেয়ে খুশী হয়েছি।

৫। আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশায়ারী (রাঃ) বললেন—তারা দুজইে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন— রসূল বললেন —নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে। একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়-চোপড় তেমন ছিলনা, বললো হে আবী মুসা রসূল কি বললেন শুনলেন তো। তিনি বললেন হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবোনা। তারপর

www.bjilibrary.com

তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙ্গে ফেলে দিলেন, এরপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি নিহত হলেন।

৬। হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রাম্য আরব রসূল (সঃ) এর কাছে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সংগী হয়ে গেল। সে বলল "আমি বাড়ী ঘর ছেড়ে আপনার সাথে মদীনায়ই থাকব।"

এ লোক সম্পর্কে রসূল (সঃ) কতক সাহাবাকে কিছু হেদায়াত দিলেন। যখনি জিহাদ হতো তাতে যে গনীমতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি ঐ লোকের জন্যও অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোক আসলে তাকে তা দেয়া হয়। ঐ লোক উপস্থিত ছিল না। সে মুজাহিদদের উট চড়াবার জন্য গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তাঁর হিস্যা তাকে দেয়া হলো।

সে বলল 'এটা কী? লোকেরা বলল যে রসূল (সঃ) আপনাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রসূল (সঃ) এর কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল যে এসব কী? রাসূল (সঃ) বললেন যে এটা তোমার হিস্যা যা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এ মালের জন্য আপনার সংগী হইনি। আমি তো এ জন্য আপনার অনুগত হয়েছি যে আমার গলায় দুশমনের কোন তীর এসে লাগবে আর আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব।

রাসূল (সঃ) বললেন, যদি তোমার নিয়ত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমার সাথে এরূপই করবেন।

কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে শরীক হলো। যখন তার লাশ রাসূল (সঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুশমনের তীর লেগেছে।

রাসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই লোক যে শাহাদাত কামনা করেছিল? সবাই বলল হ্যাঁ। রাসূল (সঃ) বললেন, সে আল্লাহর নিকট খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ তা পূরণ করলেন।

তারপর রাসূল (সঃ) নিজের জামা খুলে তা দিয়ে ঐ লোকের কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়লেন এবং তার জন্য এ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ এ লোক আপনার বান্দাহ যে আপনার পথে হিজরত করেছে এবং আপনার পথেই সে শাহাদাত পেল। এ বিষয় আমিই তার সাক্ষী।"

এ সব হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া মুমিনের জীবনে কিরূপ কাম্য হওয়া উচিত এর খাঁটি নমুনা এ হাদীসগুলোতে পাওয়া গেল।

আল্লাহ পাক কার মওত কিভাবে কোথায় দেবেন একথা কারো জানার উপায় নেই। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা

www.bjilibrary.com

বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরীক থাকা সত্ত্বেও প্রথম চারজন সত্যপন্থী খলিফাগণ কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাত কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিলেন।

শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রসূল (সঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা বিছনায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন। তাই আমাদের সবারই ইখলাসের সাথে আকাঙক্ষা করা দরকার যেন আমাদের জীবনে শাহাদাত নসীব হয়। আল্লাহ পাক আমাদের এ আকাঙক্ষা কবুল করুন। আমীন।

[ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাসিক "ছাত্রসংবাদে" প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

কুরআনের মাস ও আমাদের কর্তব্য

রমযান মাসকে আমরা কুরআনের মাস বলে থাকি। সত্যিই বিভিন্ন দিক দিয়ে রমযান মাস কুরআনেরই মাস। প্রথমতঃ কুরআন নাযিলের মাস হলো রমযান মাস। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- 'ইন্না আন্যাল্নাহু ফী লাইলাতুল ক্বাদর।' লাইলাতিল ক্বদর শুধু রমযান মাসেই হয়। কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে রযমান মাসে। তাই রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস।

রমযান মাসের যে মর্যাদা তা কুরআনের কারণেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'শাহ্রু রামাযানাল্লাযি উন্যিলা ফিহেল কুরআন'। রমযান ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। কথাটা এমনভাবে বলা হয়েছে যে, রমযানের মর্যাদা কুরআনের দ্বারাই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এটা যেমন তেমন মাস নয়। এটা ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ মাসে কুরআন নাযিল হওয়াই রমযান মাসের মর্যাদার জন্য বড় প্রমাণ। মানব জাতির হেদায়াত হওয়ার কারণে রমযানের চেয়েও কুরআন অনেক বড়। আর এই রমযান মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কুরআনের কারণেই। তাই রমযান মাস কুরআনের মাস। আর কুরআনের কারণেই রমযানের মর্যাদা আল্লাহর নিকট এত বেশী।

আরও একটি কারণে রমযান মাস কুরআনের মাস। রমযান শুধু কুরআন নাযিলের মাসই নয়। কুরআনের বিজয়েরও মাস রমযান। নবী করীম (সঃ) তেরটি বছর তাঁর সংগ্রাম যুগে মক্কাকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী আন্দোলন করলেন, এই সময় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য একদল লোক তৈরী করলেন। তিনি হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী গভর্ণমেন্ট কায়েম হলোঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। এই রাষ্ট্রটিকে খতম করার জন্য মক্কার কোরাইশ নেতৃত্ব সারা আরবদেরকে সংগঠিত করে আক্রমণ করতে গেল এবং পয়লা যুদ্ধ হলো বদরের ময়দানে। এই যুদ্ধ রমযান মাসেই হয়েছিল। এ যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা বিজয়দান করলেন নবী করীমকে (সঃ)। গোটা আরবশক্তি সংগঠিত হয়ে এসেছিল। তারা পরাজিত হলো। এই প্রাথমিক বিজয় যেমন রমযানের হয়েছে, চূড়ান্ত বিজয়ও তেমনি এই রমযানেই হয়েছে। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। বদরের যুদ্ধের সাত বছর পর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় চূড়ান্ত বিজয় ছিল। এ বিজয়ও রমযান মাসেই হয়েছে। এই চূড়ান্ত বিজয়ের পরেই গোটা আরবে ইসলাম বিরোধী শক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে গেল এবং ইসলামের শক্তিকে প্রতিহত করার মত কোন শক্তি গোটা আরবদেশে আর থাকলো না। তাই আমরা দেখতে পাই, রমযান শুধু কুরআন নাযিলের মাস নয়। কুরআন বিজয়েরও মাস।

www.bjilibrary.com

এর প্রাথমিক বিজয়ও রমযানে হয়েছে। চূড়ান্ত বিজয়ও রমযানে হয়েছে। এইভাবে কুরআনের এই বিজয়ের মাধ্যমে কুরআনের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং সাথে সাথে রমযানের মর্যাদাও বেড়ে গেল।

বর্তমানেও সারা বিশ্বে মুসলিম সমাজে রমযান মাস সত্যি কুরআনের মাস হিসাবেই পালন করা হয়। এ মাসে কুরআনের চর্চা যত বেশী হয় অন্য সময় এতো হয় না। এই রমযান মাসে বেশী করে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। তারাবীহর মাধ্যমে খতমে কুরআন হয়। লক্ষ লক্ষ লোক যারা তারাবীহর মাধ্যমে পূর্ণ কুরআন শোনে এদের শতকরা নিরানব্বই জন হয়তো এক মাসে কুরআন তেলাওয়াত খতম করতে পারে না। অথচ এক মাসে গোটা কুরআন তাদের শোনা হয়ে যায় এই তারাবীহর মাধ্যমে। কুরআনের এতো বড় চর্চা মুসলমানদের মধ্যে প্রথম যুগ থেকে চলে এসেছে। এটা রমযানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই মাসে শুধু কুরআন তেলাওয়াতের চর্চাই নয়, কুরআন এমন ব্যাপকভাবে শোনাবার যে অভ্যাস ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে তা কুরআনের প্রতি মুসলিম জাতির মহব্বত বৃদ্ধিরই সহায়ক।

মুসলিম সমাজে রমযান মাসে কুরআনের চর্চা বেশী হওয়া দ্বারাও রমযান মাস কুরআনের মাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুরআন যে উদ্দেশ্যে এসেছিল সে উদ্দেশ্যের চর্চা অনেক কম। যে উদ্দেশ্যে কুরআন এসেছে সেই উদ্দেশ্যের চর্চা ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনার প্রয়োজন।

রাসূল (সঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই দায়িত্বের কথা কুরআন মজিদের তিনটি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সূরায়ে'আত্-তাওবা'র ৩৩ নং আয়াত সূরায়ে আল ফাতহ-এর ২৮ নং আয়াত এবং সূরায়ে 'সফফার' ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিল্ হুদা ওয়াদ্বীনিল হাক্ব, লি ইয়ায হিরাহুআ'লা দ্বীনি কুল্লিহ'। আল্লাহ বলছেন যে, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং একমাত্র হক্ব দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে রাসূল (সঃ) এ হক্ব দ্বীনকে আর সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।

মানুষ যত পথ, যত মত ও যত বিধানই তৈরী করুক, সে সবের উপরে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করাই হচ্ছে নবীর আসল দায়িত্ব। এই দায়িত্বের কথাটা কুরআনের তিনটি সূরায় ঘোষণা করে এ কথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে রাসূলকে (সাঃ) প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে। আর যা কিছু কাজ তিনি করেছেন সেসব এই প্রধান কাজটির পরিপূরক ও আনুষঙ্গিক কাজ। মূল কাজ ছিল এটাই যে, কুরআনের বিধানকে মানব সমাজে বিজয়ী ও চালু করতে হবে আর মানব রচিত যত বিধান হতে পারে তা কুরআনের অধীনে ততটুকুই বেঁচে থাকবে কুরআন যতটুকু অনুমতি দেয়। কুরআনের বিপরীত কোন বিধান মানব সমাজে চালু থাকতে পারবে না।

নবী করীম (সঃ) এই কাজই করে গেছেন। এই কাজ করতে তাঁর শুরু থেকে নিয়ে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত ২৩ বছর সময় লেগেছে। এই ২৩ বছরের দীর্ঘ ইসলামী

www.bjilibrary.com

আন্দোলনকে যখন যে পরিমাণ দরকার কুরআন ততটুকুই নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলকে দুনিয়ায় যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা পালন করার জন্যই কুরআন এসেছে। এই দায়িত্বের যখন যে পর্যায় এসেছে, যখন যে স্তর এসেছে, যখন যে অবস্থা এসেছে, সেই অবস্থায় যেটুকু গাইডেন্স রসূল (সঃ) এর প্রয়োজন সেই গাইডেন্সটুকু নিয়েই কুরআন হাযির হয়েছে। এ থেকেই আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, কুরআনের সঙ্গে রসূলের ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের সম্পর্ক কী? কুরআন একটি আন্দোলনের কিতাব, এই আন্দোলনের জন্যই কুরআন এসেছে। এই আন্দোলনকে 'গাইড' করে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। কুরআন এসেছে আন্দোলনের জন্যই। আন্দোলনের সূচনা হতে সমাপ্তি পর্যন্ত যখন যতটুকু প্রয়োজন তা নাযিল করে কুরআনকে পূর্ণ করা হয়েছে।

কুরআন ত্রিশ পারার দীর্ঘ ও বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। রসূলের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কেউ কুরআন বুঝতে চায় তা হলে সে কিছুতেই কুরআনের মর্ম বুঝতে পারবে না। সে বহু আয়াতের কোন অর্থই উদ্ধার করতে পারবে না।

নবী করীম (সঃ)-এর এই ২৩ বছরের দীর্ঘ ইসলামী আন্দোলনের জীবনের সাথে কুরআন এমনভাবে গ্রথিত যে কুরআনকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কি করে বুঝা সম্ভব। তাই কুরআন হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের গাইড। তাই এই কুরআন পাক শুধু তেলাওয়াতের জন্য আসেনি। কুরআন এসেছে এই কুরআনকে বিজয়ী করার আন্দোলন করার জন্য এবং কুরআনের বিধানকে বাস্তবে চালু করার জন্য। এ কারণে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, নবী করীম (সঃ)-এর এই সংগ্রামী জীবনের ২৩টি বছরের বৃহত্তর অংশই মক্কার জীবনে কেটেছে। এই মক্কার তেরটি বছর তিনি ইসলামী আন্দোলনের যে অংশটা কাটালেন এটাকে আমরা বলতে পারি ব্যক্তি গঠনের যুগ বা সংগ্রাম যুগ বা লোক তৈরীর যুগ। এই যুগে কিন্তু সমাজ গঠনের যত আইন-কানুনের দরকার তা নাযিল হয়নি। এমনকি পারিবারিক বিধানের জন্যও যে আইন তা-ও এ সময়ে নাযিল হয়নি। বিবাহের আইন, পর্দার আইন, ফরায়েজের আইন ইত্যাদি কোনটাই এই তের বছরের মধ্যে নাযিল হয়নি। রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অর্থনৈতিক জীবনের জন্য, সামাজিক জীবনের জন্য সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য যত নিয়ম, আইন-কানুন সেগুলো তো দূরের কথা পারিবারিক আইনগুলোও মক্কীযুগে নাযিল হয়নি। মদিনী যুগের সূরাগুলোতেই সে সমস্ত বিধান রয়েছে।

এর দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, এই বিধানগুলো শুধু তেলাওয়াতের জন্য আসেনি। যদি মক্কী যুগে এসব নাযিল হতো তাহলে তখন তেলাওয়াত করা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু করা যেত না। যখন ইসলামী গভর্ণমেন্ট কায়েম হলো, ইসলামের রাষ্ট্র চালু হলো, তখন একেকটি বিধান নাযিল হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে বিধানকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ইসলামী গভর্ণমেন্ট থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

www.bjilibrary.com

কুরআনের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে বিধান রয়েছে তা গভর্নমেন্ট না হলে চালু হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য সেই সংক্রান্ত বিধানগুলো রাষ্ট্র কায়েমের আগে নাযিল হয়নি।আজ আমরা সে সমস্ত আয়াত শুধু তেলাওয়াত করি মাত্র। যদি তেলাওয়াতই শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে মক্কায়ও তিনি তা নাযিল করতে পারতেন। এতে তেলাওয়াতের সওয়াব অবশ্যই হতো। তেলাওয়াত বুঝবার জন্যই করা উচিত। এতে তেলাওয়াতের সওয়াব অবশ্যই প্রতি অক্ষরে দশটি করে হবে। কিন্তু তেলাওয়াত যদি প্রধান উদ্দেশ্য হতো তাহলে এই মাদানী যুগের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না।

এই যুগটাকে আমরা বলি বিজয়ী যুগ, ইসলামী সমাজ গঠনের যুগ, ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনার যুগ, ইসলামী গভর্ণমেন্টের যুগ। আর মক্কী যুগ ছিল সংগ্রামের যুগ বা ব্যক্তি গঠনের যুগ। সমাজ গঠনের সুযোগ সেখানে ছিল না। সমাজ গঠনের কাজটা হলো মদীনায় এবং তখন এই সমাজ গঠনমূলক আইন-কানুন নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, কুরআন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কিতাব। আর এ সমাজ ব্যবস্থা চালু করার জন্যই কুরআন পথ নির্দেশ করতে এসেছে। তাই রমযান মাস শুধু কুরআন নাযিলের মাসই নয়, রসূলের যুগে কুরআন বিজয়ের মাসই নয়, আজকের যুগেরও শুধু কুরআন তেলাওয়াত আর শোনার মাসই নয়। কুরআন পাককে আমাদের অন্তরে এভাবে গ্রহণ করতে হবে, যে কুরআন হচ্ছে- মুসলমানদের সমাজ গঠনের পথ নির্দেশক কিতাব।

তাই যদি আমরা সত্যি কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখি, তাহলে আমাদের বড় ধান্দা হওয়া উচিত যে কি করে সমাজে কুরআনকে বিজয়ী করব? কি করে কুরআনের বিধানকে আমাদের সমাজে চালু করব? তার মানে ইসলামী আন্দোলন করাই হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াতের বড় উদ্দেশ্য। আমরা কুরআন বুঝব ইসলামী আন্দোলন করার জন্য, কুরআন বুঝব ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে আর এই বিজয়ী করার কাজটা রসূল যেমন একটা দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে করতে পেরেছেন, তেমনি আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। এত বড় কাজ নিজে নিজেই হয়ে যাবে না। তাই এই রমযান মাসে কুরআনের চর্চার সত্যিকারে উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, আমরা এ রমযানে এ কুরআনকে সমাজ গঠনের কিতাব হিসাবে গ্রহণ করব। কুরআন অনুযায়ী মানব সমাজকে গড়ার দায়িত্ব বোধ করব এবং সেই হিসাবে কুরআনকে জানবার এবং বুঝবার চেষ্টা করব। যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করব। আর সেই উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে, 'জেহাদুন ফি ছাবিলিল্লাহে'। আর এ জেহাদ ফি ছাবিলিল্লাহকেই আমরা বলি ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন মানে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। এই প্রচেষ্টা যারা চালাবে কুরআনের মর্ম তারা ভালভাবে বুঝবার যোগ্য হবে।

www.bjilibrary.com

যেহেতু এই আন্দোলনের জন্যই কুরআন এসেছে, সেহেতু যারা এই আন্দোলনের জন্য কাজ করবে তারা আন্দোলনের প্রতি স্তরে স্তরে অনুভব করবে যে, কুরআন যেন তাদের জন্যই এসেছে। তাদেরকে এ সময়ে গাইড করার জন্যই যেন কুরআন এসেছে। রসূলের (সঃ) আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে, রসূলের (সঃ) আন্দোলনের কোন স্তরে কোন সূরা এসেছিল এবং বর্তমানে আমরা আন্দোলনের কোন্ স্তরে আছি। বিশেষ করে রসূলের (সাঃ) আন্দোলনের কোন স্তরে কোন সূরা নাযিল হয়েছিল, সেই সূরাগুলো আমরা যখন আমাদের আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ব তখন দেখতে পাব যে কুরআন আমাদের জন্য যেন নতুনভাবে এসেছে।

কিন্তু যদি আন্দোলন করা না হয়, তাহলে রসূলের আন্দোলনের ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, তা থেকে এটুকুই বুঝব যে রসূলের (সঃ) ঐ সময়ের আন্দোলনের জন্যই কুরআন এসেছে। আমরা শুধু ইতিহাস থেকে এটুকু জানলাম। কিন্তু আমাদের জন্য যে কুরআন নাযিল হয়েছে সে উপলব্ধিটা সৃষ্টি হবে না। এই রমযান মাস ইসলামী আন্দোলনের মাসও হওয়া উচিত। রমযান মাস ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই কুরআনকে বুঝবার মাস। রমযান মাস ইসলামী আন্দোলনের সাহায্যকারী যে কুরআন, ইসলামী আন্দোলনের পথ প্রদর্শক যে কুরআন, সেই কুরআনের মাস। তাই তারাবীহতে কুরআন শোনার মাধ্যমে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যদি আমাদের এই প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, আমরা ইসলামী আন্দোলন করব, ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করব, এই কুরআনের বিধানকে বিজয়ের জন্য জান-মাল কোরবান করব, তবেই এই রমযান মাসে তেলাওয়াত করা এবং তারাবীহতে কুরআন শোনা সার্থক হবে। তবেই রমযান মাস কুরআনের মাস বলে আমাদের যে ধারণা তা উপলব্ধিতে পরিণত হবে এবং আমাদের অনুভূতিতে প্রাণ আসবে।

[১৯৮৯ সনে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়]

www.bjilibrary.com

মুমীনের চার রকম মর্যাদা

কুরআন মজীদে ঈমানদারদের জন্য চারটি মর্যাদা উল্লেখ রয়েছে। সত্যিকার মুমীন তারাই যারা ঐ সব কয়টি মর্যাদা হাসিল করার জন্য চেষ্টা সাধনা করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ঐ মর্যাদাগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। এমনকি যারা আলেম, পীর ও বুযর্গ হিসাবে সমাজে পরিচিত তাদের মধ্যেও অনেকেই ঐ বিষয়ে সঠিক ধারণা রাখেন না। তাই আল্লাহ পাক মুমীনদেরকে যে চারটি মর্যাদা দিতে চান তা হাসিল করতে হলে ঐ বিষয়ে আমাদেরকে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই মুমীনের পূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

কুরআন পাকে ঐ চারটি মর্যাদার জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা সাধাণত বহুবচনেই দেখা যায়। এটাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ পাক বহু লোককে সম্বোধন করেই কথা বলেছেন। ঐ চারটি পরিভাষা নিয়েই এখানে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি।

(১) ইবাদুল্লাহ (عباد الله) (২) আওলিয়াউল্লাহ (اولياءُ الله)(৩) আনসারুল্লাহ (انصارالله) (৪) খুলাফাউল্লাহ (خلفاء الله)

এ চারটি মর্যাদা কুরআনে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে এ সব কয়টি মর্যাদাই মুমীনের জন্য জরুরী। এর কোন একটি মর্যাদাকে অপরটি থেকে আলাদা করে নেবার উপায় নেই। কুরআনের আলোকে এ কয়টি মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনার পরই এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব।

ইবাদুল্লাহ ঃ

'ইবাদ' শব্দটি আরবী 'আবদ' শব্দেরই বহুবচন। 'আবদ' মানে দাস। এ থেকেই 'ইবাদত' শব্দের উৎপত্তি। ইবাদত মানে দাসত্ব বা দাসের কাজ। দাসের কাজ হলো মনিবের হুকুম মতো কাজ করা। মনিবের জন্য আরবী শব্দ হলো মাবুদ। এ শব্দটিও আবদ থেকেই এসেছে। মাবুদ মানে হুকুমকর্তা বা যার দাসত্ব করা হয়। আর যে ঐ হুকুমকর্তাকে মেনে চলে সেই আবদ বা দাস।

আল্লাহর নিকট ঐ লোকেরই মর্যাদা রয়েছে যে তার দাস হিসেবে আন্তরিকতার সাথে মনিবের হুকুম পালন করে। যে যত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে আল্লাহর নিকট সে তত বেশী প্রিয়। রাসূল (সঃ) এ জন্যই আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন যে তিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দাস। আমরা নামাজে তাশাহুদের শেষ দিকে পড়ি 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।" রাসূল নিজেই এভাবে তাশাহুদ

www.bjilibrary.com

পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি এখানে তার পরিচয় দিতে গিয়ে পয়লা নিজকে আল্লাহর দাস হিসেবে পরিচয় দেবার পর আল্লাহর রাসূল বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী তা আল্লাহ্ পাক কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّالِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমি জিন ও মানুষকে পয়দা করিনি। (সূরা আয যারিয়াত-৫৬ আয়াত) এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে মানুষের কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। আগেই আমরা প্রমাণ করেছি যে ইবাদত মানে দাসত্ব বা মনিবের হুকুম পালন করা। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর আবদ বা দাস হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে হলে তার সব হুকুমই পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা যেমন নামাজ রোজা হজ্জ যাকাতের আদেশ দিয়াছেন, তেমনি তিনি সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, জিনা, ঘুষ, জুয়া, মদ , মুনাফাখুরী, মওজুদদারী ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এ সবের জন্য নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা করার নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি বিয়ে, তালাক, ফারায়েজের আইন যেমন দিয়েছেন তেমনি মানুষের উপর মানুষের সব রকম যুলম বন্ধ করার তাকীদও দিয়েছেন। হালাল ও হারামের সীমারেখা নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর, এ কথাও কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদত শুধু নামায রোজা তাসবীহ তেলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম পালন করাকে ইবাদত বলে। এ অর্থ বিবেচনা করলে ইবাদুল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই মুমীনের আসল মর্যাদা।

আওলিয়াউল্লাহ ঃ

ওয়ালী (ولى) শব্দেরই বহুবচন হলো আওলিয়া। ওয়ালী শব্দের অর্থ অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সমর্থক ও সাহায্যকারী। এর আর এক অর্থ হলো বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ সাথী। এ শব্দটি আল্লাহর জন্যও ব্যবহার করা হয় এবং আল্লাহর দাস বা বান্দার জন্যও ব্যবহার করা হয়। সূরা বাকারার ২৫৭ আয়াত اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ নিজকে মুমীনদের ওয়ালী বলে উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতে ওয়ালী মানে আভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষক। ওয়ালী শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় বন্ধু।

لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين

অর্থাৎ মুমীনরা যেন মুমীনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ অন্যত্র বলা হয়েছে– জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়ালীদের কোন ভয় নেই। এবং তারা হতাশ

www.bjilibrary.com

হবে না। (সূরা ইউনুস-৬২ আয়াত) এ আয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কথাই বলা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর ওয়ালী বা স্নেহভাজন, প্রিয়জন ও বন্ধু বলা হয়েছে এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে আখিরাতে তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই, হতাশ হবারও আশংকা নেই। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আল্লাহর দাস ও ওয়ালীর মধ্যে পার্থক্য কি? আসলে আল্লাহর সত্যিকার নিষ্ঠাবান দাসই তার ওয়ালী বা বন্ধু। হাদীসে কুদসীতে এ কথাটি বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ বলেন যে, যখন আমার বান্দাহ সবসময় সব অবস্থায় সচেতনভাবে আমার হুকুম মেনে চলে বা নিষ্ঠার সাথে আমার দাসত্বের দায়িত্ব সব সময় পালন করতে থাকে তখন সে আমার বন্ধুতে পরিণত হয় বা আমার ওয়ালীর মর্যাদা পায়। তখন তার হাত আমার হাত হয়ে যায়, তার মুখ আমার মুখ হয়ে যায়, তার চোখ আমার চোখ হয়ে যায়।

এ কথার অর্থ কী? এ হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর ওয়ালী যে তার হাত-পা-চোখ-মুখ মন-মগজ দিয়ে শুধু তাই করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কিছুই সে করে না। এমন লোক নিশ্চয়ই আল্লাহর খাটি দাস। তাহলে দাস হিসাবে পূর্ণতা লাভ করলেই ওয়ালী হবার মর্যাদা পাওয়া যায়। আল্লাহর পাক মানুষকে যত রকম আদেশ দিয়াছেন এবং দুনিয়ায় মানুষ হিসেবে যত রকম দায়িত্ব দিয়াছেন সে সব ঠিকমত পালন না করে যারা শুধু নামাজ রোজা তাসবীহ তেলাওয়াত যিকর নিয়াই জীবন কাটায় তাদেরকে আল্লাহ কতটা স্নেহ করেন সে কথা একটি হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

ঐ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আঃ)-কে আল্লার নাফরমানদের একটা বস্তিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। জিবরাইল (আঃ) সে বস্তিতে যেয়ে এমন এক লোককে দেখতে পেলেন যিনি সব সময় আল্লাহর যিকরে মশগুল রয়েছেন। আল্লাহর এমন ওয়ালীসহ বস্তিটা ধ্বংস করবেন কিনা সে কথা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো। আল্লাহ জওয়াবে বললেন যে ঐ লোকসহই বস্তিটা ধ্বংস করে দাও। কারণ সে যতই আমার যিকর করুক ঐ বস্তির সব লোক যে আমার নাফরমানী করছে তার প্রতিবাদ করা দূরে থাক, আমার হুকুম অমান্য হতে দেখে তার মনে কোন দুঃখবোধ হয় না। আমার এমন ব্যাপক নাফরমানী হতে দেখে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হবার কোন লক্ষণও তার চেহারায় দেখা যায় না।

এ হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে মানব সমাজে আল্লাহর বিধান চালু করার দায়িত্ববোধ না থাকলে শুধু আল্লাহর যিকর ও তাসবীহ করেই আল্লাহর ওয়ালী হিসাবে গণ্য হওয়া যায় না। যিকরের আসল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর দাসত্ব করার দায়িত্ব অনুভব করা। সে দায়িত্ব বোধ ছাড়া যিকর অর্থহীন। যিকর মানে আল্লাহকে মনে রাখা। সব সময় আল্লাহকে মনে রাখার উদ্দেশ্যই যিকর। কিন্তু মনে রাখার আসল লক্ষ্য হলো আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব ও নির্দেশ পালনে সচেতনভাবে তৎপর হওয়া। যিকর এ তাকীদই দেয় যে আল্লাহর মরযি মত সব সময় কাজ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

আনসারুল্লাহ ঃ

আনসার শব্দটিও বহুবচন। এর অর্থ হলো সাহায্যকারী। একবচনে নাসির। হযরত ঈসা (আঃ) যখন মানুষকে ডেকে বললেন, مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ "কে আল্লাহর পথে আমার সহায়ক আছ?" তখন কতক লোক জওয়াবে বললেন ("আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী") نَحْنُ اَنْصَارُاللّٰهِ (সূরা আস্-সাফ-১৪ আয়াত)।

এ আয়াতে তারা "আল্লাহর সাহায্যকারী" বলে নিজেদের খেদমত পেশ করলেন। সূরা মুহাম্মাদের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَاَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

অর্থাৎ "হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থানকে মজবুত করে দেবেন। এ আয়াতে দেখা গেল যে আল্লাহ নিজেই তাকে সাহায্য করার জন্য মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, আল্লাহ কি মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী? আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান এবং সকল সৃষ্টি থেকে তিনি অভাবমুক্ত। "আল্লাহ গোটা বিশ্ব والله غنى العالمين থেকে অভাবমুক্ত।"

আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ কী?

আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যে রকম বিধান প্রয়োজন ও উপযোগী সে রকম নিয়ম কানুনই তৈয়ার করেছেন। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আগুন-পানি, বাতাস-পক্ষী, কীট-পঙ্গত ইত্যাদি প্রতিটি সৃষ্টির উপযোগী বিধান রচনা করে আল্লাহ নিজেই সে সব বিধান জারি ও চালু করে দিয়েছেন। এ সব বিধি বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। আল্লাহ ঐ সব সৃষ্টিকে এ ইখতিয়ারও দেননি যে তারা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে আর ইচ্ছা না হলে অমান্য করবে। বরং আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে তার রচিত বিধান মেনে চলতে বাধ্য করেছেন।

কিন্তু আল্লাহ মানুষের জন্য যে বিধান তৈরি করেছেন তা তিনি নিজে মানব জাতির উপর সরাসরি জারি করেন না। এমনকি এ আইন সরাসরি সব মানুষকে জানিয়ে দেন না। তিনি নবীর মাধ্যমে এ বিধান মানব জাতির জন্য পাঠান এবং এ আইন মানা না মানার ইখতিয়ার তাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মানব সমাজে আল্লাহর এ আইন চালু করার জন্য মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। তিনিই এ নিয়মের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ এ কাজ করতে অক্ষম নন। কিন্তু মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেই অন্যান্য সৃষ্টির মতো মানুষকে আল্লাহর বিধান মানতে বাধ্য করে দেননি। এ কারণেই অন্যান্য সৃষ্টি আখিরাতে শাস্তিও পাবে না পুরস্কারও পাবে না, আর মানুষকে স্বাধীনতা দেবার কারণেই তাদের জন্য দোযখ ও বেহশতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল্লাহর এ ব্যবস্থার কারণেই ইসলামী জীবন বিধানকে আল্লাহ নিজে মানব সমাজে চালু করেন না। মানুষের মধ্যে যারা ইসলামকে মানব সমাজে কায়েমের চেষ্টা করে তাদেরকে আল্লাহ তার সাহায্যকারী বা আনসারুল্লাহ বলে মর্যাদা দান করেছেন।

www.bjilibrary.com

যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর হুকুম পালন করে কিন্তু সমাজে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করে না সে "আনসারুল্লাহ" বলে গণ্য হতে পারে না। এমনকি কোন লোক যদি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ ওয়ালা বলে বিখ্যাতও হয়ে যান তবু আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে চালু করার চেষ্টা না করলে তিনি "আনসারুল্লাহ" হবার মর্যাদা পেতে পারেন না। ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া এ মর্যাদা হাসিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আল্লাহ পাক তার রাসুলকে ইকামাতে দ্বীনের এ গুরু দায়িত্ব অর্পণের কথা সূরা আত তাওবার ৩৩ আয়াতে, আল ফাতহ এর ২৮ আয়াত ও আসসাফ-এর ৯ আয়াতে বলেছেন :

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অর্থাৎ তিনিই সে যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন যেন (রাসূল) তাকে (ঐ বিধানকে) আর সব রকমের বিধানের উপর বিজয়ী করেন।

কুরআন-হাদীসে ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর আচরণ একথাই প্রমাণ করে যে এ দায়িত্ব শুধু রাসূলের নয়। যারা রাসূলের উপর ঈমান আনে তাদের উপরও এ দায়িত্ব রয়েছে। তাই রাসুলের উপর ঈমান আনার দাবীদারদের মধ্যে যারা এ কাজে রাসূলের সাথে সহযোগিতা করেনি তারা নামায রোজা করা সত্ত্বেও মুনাফিক বলে গণ্য হয়েছে।

খুলাফাউল্লাহ ঃ

খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। যে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের পক্ষ থেকে কোন দায়িত্ব পালন করে তাকেই ঐ লোকের প্রতিনিধি বলা হয়। প্রতিনিধি নিজের মরযি মতো কাজ করার অধিকার রাখে না। যার প্রতিনিধি তারই ইচ্ছা, নির্দেশ ও হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করা প্রতিনিধির দায়িত্ব।

আল্লাহর দ্বীনকে যেহেতু আল্লাহ নিজে সরাসরি মানব সমাজে কায়েম করেন না সেহেতু যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করেন আল্লাহ পাক তাদেরকে তার নিজের প্রতিনিধি বলে গণ্য করেন। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্য যে বিধান রচনা করেছেন তা যারা কায়েম করার চেষ্টা করেন তারা এ কাজটা আল্লাহর পক্ষ থেকে করছেন বলেই তিনি গণ্য করেন।

আগে বলেছি যে যারা ইকামাতে দ্বীনের জন্য চেষ্টা করেন তারা আল্লাহর নিকট আনসারুল্লাহ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু যারা আনসারুল্লাহ তাদের হাতে দ্বীন বিজয়ী হতেও পারে নাও হতে পারে। ইসলামের বিজয়ের জন্য যে শর্ত রয়েছে তা পূরণ না হলে নবীর হাতেও বিজয় আসে না।

কিন্তু যারা আনসারুল্লাহ এর দায়িত্ব পালন করেন যদি তাদের হাতে ইসলাম বিজয়ী হয় তাহলেই তারা "খুলাফাউল্লাহ" এর মর্যাদা পান। আল্লাহর আইন বিধান চালু

www.bjilibrary.com

হলেই আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পূর্ণ হয়। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের দায়িত্ব যারা পালন করতে সক্ষম হন তারাই খুলাফাউল্লাহ-এর মর্যাদার অধিকারী হন।

আল্লাহ পাক মানব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত যখন ফেরেস্তাদের কাছে প্রকাশ করেন তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "আমি দুনিয়ায় আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই" (সূরা আল বাকারাহ-৩০) এ থেকে বুঝা গেল যে এটাই মানুষের আসল পজিশন। এ মর্যাদার অধিকারী হবার উদ্দেশ্যে মানুষ দুনিয়ায় কাজ করুক এটাই আল্লাহর পছন্দ। সুতরাং এ মহান মর্যাদা হাসিলের জন্য যারা চেষ্টা করে না তাদের মানব জীবন ব্যর্থ। তাদের জীবনই সার্থক যারা আনসারুল্লাহ এর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন যাতে আল্লাহর খলিফার মর্যাদা পাওয়ার সুযোগ হয়।

কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারা এ কথা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে আনসারুল্লাহ এর মহান দায়িত্ব পালন না করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ (আবদ) ও বন্ধু (ওয়ালী) হিসাবে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ মুমীনদেরকে যে চারটি মর্যাদা দিয়েছেন তার কোন একটা বাদ দিয়ে অন্যটা হাসিল করার উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে মুমীনের আসল মর্যাদা একটাই সেটা হলো আল্লাহর প্রিয় হওয়া ও তার সন্তুষ্টি লাভ করা। এ সন্তুষ্টি তারাই লাভ করে যারা ইবাদুল্লাহ, ওয়ালীউল্লাহ ও আনসারুলাহ হিসাবে গণ্য হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর খলিফা হওয়ার মর্যাদা পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সত্যিকার মুমীন হিসাবে এসব মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সুযোগ ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

[আগস্ট ১৯৮৪, মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

তিন তাসবীহ্‌র হাকীকত

তিন তাসবীহ্ মানে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। বহু সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ তিনটি তাসবীহ পড়ার বিভিন্ন রকম ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কোন হাদীসে এক একটি তাসবীহ্ ৩৩ বার করে পড়ার পর (৩X৩৩)= ৯৯ সংখ্যার সাথে একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর পড়ে ১০০ সংখ্যা পূরণ করতে বলা হয়েছে। আবার অন্য হাদীসে প্রথম ও দ্বিতীয় তাসবীহ ৩৩ বার করে ও শেষটি ৩৪ বার পড়তে আদেশ করা হয়েছে। শোবার সময় ৩৩+৩৩+৩৪ বার এ তিন তাসবীহ পড়ার কথা হাদীসে আছে।

মুসল্লীদের সবাই এ তিন তাসবীহ্‌র কথা জানেন এবং অনেকেই নিয়মিত পড়েন। কিন্তু এ তিনটি তাসবীহ্ মুখে পড়ার সময় মনে মনে এর মর্মকথা কিভাবে খেয়াল করতে হবে—এ বিষয়ে চর্চার বড়ই অভাব। শুধু ফযীলত ও সওয়ারেব চর্চাই প্রচলিত। হাক্বীকতের চর্চা নেই বললেই চলে। নামাযেরও একই দশা। মুখে নামাযে যা পড়া হয়, ক্বলবে তখন কোন খেয়াল করতে হবে কিনা, সে শিক্ষা সাধারণতঃ নামায শিক্ষার বইতে নেই। নামায শেখাবার সময় তা শেখানো হয় না। তাই জীবন্ত নামায থেকে আমরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছি।

একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ না বুঝে শুধু শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই ঈমান পয়দা হয় না। 'ইক্বরার বিল-লিসানের' সাথে সাথে 'তাসদীক বিল-জিনান' ছাড়া ঈমান হয় না। অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং মনে একথার সত্যতা স্বীকার করতে হবে। তবেই ঈমান আনা হলো বলে স্বীকার করা হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে, মনে সত্যতা স্বীকার করতে হলে কালেমার অর্থ বুঝতে হবে কিনা? কালেমা মানেই কথা। আর যা বোঝা যায় না, তা আওয়াজ হতে পারে, কথা হতে পারে না।

তাই যখন কেউ মুখে কালেমা উচ্চারণ করে এবং অন্তরে এর অর্থ বুঝে কবুল করে, তখন সে মুমিন বলে গণ্য হয়। ময়না পাখিও কালেমা উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু তার অর্থ বোঝার সাধ্য নেই বলে সে মুমিন হতে পারে না।

হাদীসে আছে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শ্রেষ্ঠ যিক্‌র। কিন্তু এর অর্থ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলে যিক্‌র বলে গণ্য হতে পারে না। যিক্‌র মানে স্মরণ করা। স্মরণ করার কাজটা তো মনের। সুতরাং মনে এর অর্থের খবর না থাকলে শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই তা যিক্‌রের দাবী পূরণ করে না।

তিন তাসবীহ্-এর ব্যাপারেও একথা সত্য। মুখে এ তাসবীহ্‌গুলো উচ্চারণ করার সময় মনে খেয়াল করতে হবে যে, আমি মুখে কী বলছি। সুবহানাল্লাহ শব্দটির দিকে

www.bjilibrary.com

নয়। এর মর্মকথার দিকেই খেয়াল রেখে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। এখন এক একটি তাসবীহ্ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

মানুষ ৪ রকমের শির্ক করে থাকে ঃ

(১) শির্ক বিয-যাত (আল্লাহ্র সত্তার সাথে শরীক করা)ঃ যেমন—কাউকে আল্লাহ্র স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা সাব্যস্ত করা। মরিয়ম (আঃ)-কে স্ত্রী, ঈশা (আঃ)-কে পুত্র এবং ফেরেশতাদেরকে কন্যা বলে বিশ্বাস করা।

(২) শির্ক বিস্-সিফাত (আল্লাহ্র গুণাবলীর সাথে শরীক করা)ঃ যেসব গুণ শুধু আল্লাহ্রই আছে, ওসব গুণ অন্যের মধ্যেও আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন—গায়েবের ইলম রাখা, সর্বত্র হাযির থাকা, সবকিছু শোনা, সবাইকে দেখতে পাওয়া।

(৩) শির্ক বিল-হুকুক (আল্লাহ্র অধিকারে শরীক করা)ঃ যেমন—নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, ভক্তিসহকারে উপাসনা করা, নত হওয়া, সিজদা করা, দোয়া করা ইত্যাদি। বান্দার পক্ষ থেকে এ সবই পাওয়ার হক একমাত্র আল্লাহ্র। এসব হকের মধ্যে অন্য কোন সত্তাকে শরীক করাই হলো শিরক বিল-হুকুক।

(৪) শির্ক বিল-ইখতিয়ারাত (যেসব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে তা অন্যের হাতেও আছে বলে বিশ্বাস করা)ঃ যেমন- হায়াত ও মউত দেয়া, রোগ ভাল করা, অলৌকিকভাবে সাহায্য বা ক্ষতি করা, সন্তান দান করা, রিয্কের ব্যবস্থা করা, আইন দেয়া, হালাল ও হারামের ফায়সালা করা ইত্যাদি।

এসব ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা হলো শিরক বিল-ইখতিয়ারাত।

তাওহীদ

শির্কমুক্ত ঈমানই হলো তাওহীদ। আল্লাহ পাক শির্কের গুনাহ কিছুতেই মাফ করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। এর মানে হলো যে, শির্কে লিপ্ত থাকলে ইবাদত ও নেক আমলের কোন মূল্য হবে না। ঈমানের আসল বুনিয়াদই হলো তাওহীদ।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানদের মধ্যে শিরক বিয-যাত ছাড়া সব রকম শির্কই ব্যাপক আকারে রয়েছে। রাসূল (সাঃ)-কে সর্বত্র হাযির-নাযির মনে করা, পীর সাহেবের গায়েবী ইলম আছে বিশ্বাস করা, খাজা বাবা বা বড় পীরের মাযারে গিয়ে তাদের কাছে সন্তানের দরখাস্ত করা, মিলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) হাযির হন মনে করে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো, রোগ-শোক বা বিপদ-আপদথেকে বাঁচার নিয়তে মাযারে শিরনী ও মোমবাতি দেয়া, ওয়ালী-দরবেশদের কবরে গিয়ে দুনিয়ার কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করা ইত্যাদি অগণিত শিরকী কারবার মুসলমানদের মধ্যে চালু রয়েছে। এসব থেকে ঈমান-আক্বীদাকে পাক করাই তাওহীদের দাবী।

সুবহানাল্লাহ

এর শাব্দিক অর্থ হলো আল্লাহ পবিত্র। এখানে পবিত্র কথাটির মর্ম কী? কী অর্থে আল্লাহকে পবিত্র বলা যায়। কুরআন মজীদে বহু জায়াগায় 'সুবহানাল্লাহ' বা 'সুবহানাহু

www.bjilibrary.com

তায়ালা' উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে বা পরে এমন কথা আছে, যা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শির্কের বিরুদ্ধে তাওহীদের ঘোষণা হিসেবেই সুবহানাল্লাহ বলা হয়েছে। অল্প কয়টি নমুনা থেকেই একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ঃ

১. সূরা আল-বাকারা (আয়াত-১১৬)ঃ وَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحَانَهٗ

২. সূরা আল-আ'নয়াম (আয়াত-১০০)ঃ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

৩. সূরা ইউনুস (আয়াত-১৮)ঃ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

৪. সূরা ইউসুফ (আয়াত-১০৮)ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

৫. সূরা আল-আম্বিয়া (আয়াত-২২)ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

৬. সূরা আস-সাফফাত (আয়াত- ১৮০)ঃ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

৭. সূরা আত্-তুর (আয়াত- ৪৩)ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

৮. সূরা আন্-নাহ্ল (আয়াত- ৫৭)ঃ وَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهٗ

এ আটটি আয়াতের তরজমা ঃ

১. এরা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান ধারণ করেন। তিনি তা থেকে পবিত্র।

২. এরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যে বিবরণ দেয়, তা থেকে মহান আল্লাহ পবিত্র।

৩. এরা যেসবকে (আল্লাহ্র সাথে) শরীক করে মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

৪. আল্লাহ পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের কেউ নই।

৫. এরা যে বিবরণ দেয়, তা থেকে আরশের প্রভূ আল্লাহ পবিত্র।

৬. এরা যে বিবরণ দেয়, তা থেকে (হে রাসূল!) ইয্যতের মালিক আপনার রব পবিত্র।

৭. এরা যেসবকে শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

৮. এরা বলে যে, আল্লাহ্র মেয়ে আছে। তিনি তা থেকে পবিত্র।

এ সবক'টি আয়াতের মর্মকথা একই। এর সারকথা হলোঃ আল্লাহ পাক বলেন, (এখানে পাক মানে পবিত্র) আমার সাথে মানুষ যেসবকে শরীক করে বা আমার গুণাবলী সম্পর্কে তারা যে বিবরণ দেয়, তা থেকে আমি পবিত্র।

একথার মর্ম বুঝতে হলে শির্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। শির্ক মানে শরীক করা। আল্লাহ্কে স্বীকার করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র যাত(সত্তা), তাঁর সিফাত (গুণাবলী), তাঁর হুকুক (অধিকার) ও তাঁর ইখতিয়ারে(ক্ষমতা) অন্য কোন মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, ওয়ালী, দরবেশ, নবী, পীর, দেব-দেবী, মূর্তি, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য-তারকা ইত্যাদিকে শরীক করাকেই শির্ক বলে।

www.bjilibrary.com

সুবহানাল্লাহ্‌র হাক্বীকত

'সুবহানাল্লাহ্' আসলেই তাওহীদ বিশ্বাসের স্পষ্ট ঘোষণা এবং শিরককে অস্বীকার করার দৃঢ় শপথ। অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ মুখে উচ্চারণ করার সময় মনে মনে এ খেয়ালই করতে হবে যে, আমার আল্লাহ সব রকম শির্‌ক থেকে পাক। আর আমি ঐ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এ পবিত্রতা ঘোষণার আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। যখন কোন বস্তু বা সত্তাকে কোন দিক দিয়ে (ঐ ৪ রকমের কোন এক বা একাধিক দিক দিয়ে) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র মধ্যে দুর্বলতা, কমতি ও ত্রুটি আছে বলে স্বীকার করা হয়। আল্লাহ্‌র স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে মনে করলে আল্লাহ্‌কে মানুষের মতই দুর্বল মনে করা হয়। মানুষ যেমন স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দুর্বল আল্লাহও তেমনি। মানুষ যেমন নিজের সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, তেমনি আল্লাহ্‌রও দরকার হয়। নাউযুবিল্লাহ।

গায়েবী ইলম, সর্বত্র হাযির-নাযির ইত্যাদি গুণ আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে আছে মনে করলে তাকে আল্লাহ্‌র সমান বা সমকক্ষ করা হয়। এভাবে আল্লাহ্‌কে তার সৃষ্টির সমান মর্যাদা দেবার ফলে আল্লাহ্‌কে হেয় করা হয়।

তেমনি আল্লাহ্‌র হক অন্যকে দিলে এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অন্যের মধ্যে আছে মনে করলে আল্লাহ্‌র মর্যাদাহানি করা হয়।

সুবহানাল্লাহ বলে একথাই ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ সব রকম দুর্বলতা, ত্রুটি ও কমতি থেকে পবিত্র। আর কেউ কোনদিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ হওয়া থেকেও তিনি পবিত্র।

(নোটঃ একজন হাক্কানী পীর, যার মতো নিঃস্বার্থ ও উদার আলেম আমি কমই দেখেছি, তার মুরীদদের জন্য লিখিত হেদায়াতে আমি পড়েছিলাম যে, সুবহানাল্লাহ্‌র যিক্‌র করার সময় মনে মনে যেন খেয়াল করা হয় যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র পবিত্র, আমি পায়খানার কীট থেকেও বেশী অপবিত্র। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে ঘোষণা করার পর এ জাতীয় শিক্ষা দেয়া কি ঠিক? সুবহানাল্লাহ যে তাওহীদের ঘোষণা, সেকথা জানা থাকলে এমন অদ্ভুত শিক্ষা দেয়া হতো না।)

কুরআনে 'সুবহানাল্লাহ' ব্যবহার

কুরআন পাকে 'সুবহান' শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে শিরকের প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি, সেখানে যে অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে, তার মর্মও একই দাঁড়ায়। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে রাসূল (সঃ)-কে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় এক রাত ভ্রমণ করাবার কথা শুরু করা হয়েছে 'সুবহান' শব্দ দিয়ে– سبحان الذى اسرى এখানে যে অর্থে 'সুবহান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতাই বোঝায়। অর্থাৎ এ কাজটি এমন এক সত্তার পক্ষেই সম্ভব, যার কোনদিক দিয়েই কোন দুর্বলতা,

www.bjilibrary.com

অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নেই। এ অর্থে কুরআন পাকে 'সুবহান' শব্দটি বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এতেও তাওহীদের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ একাই ক্ষমতার অধিকারী। আর কেউ শরীক নেই। سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا 'পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি এটা আমাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছেন' (সূরা আয্-যুখরুফ, আয়াত- ১৩)। سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا 'পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট সবকিছুই পয়দা করেছেন' (সূরা ইয়াসীন, আয়াত- ৩৬)।

এ দু'টো আয়াতে তাওহীদেরই ঘোষণা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, এ সবই একমাত্র আল্লাহ্র কাজ। এককভাবে আল্লাহ্ই এসব করেছেন। এর মধ্যে আর কোন সত্তা শরীক নেই।

আল-হামদুলিল্লাহর হাক্বীকত

'আল-হামদুলিল্লাহ্'র শাব্দিক অর্থ হলো সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। 'হামদ' মানে প্রশংসা। 'আল-হামদ' মানে সবটুকু প্রশংসা। অর্থাৎ প্রশংসা শুধু আল্লাহ্রই জন্য। সৃষ্টি জগতে যেখানে যত গুণ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ দেখা যায়, এসবের যিনি স্রষ্টা, আসল প্রশংসা তাঁরই। গাছটি বা পাখিটি খুব সুন্দর। মানুষটি খুবই সৎ ও ভাল। ফলটি খুবই সুস্বাদু। ফুলটি বড়ই সুগন্ধি। এসব গুণের অধিকারীদের কি কোন বাহাদুরী আছে? এসব গুণ সৃষ্টি যিনি করেছেন, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার আসল উদ্দেশ্য তাঁর প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করা। তিনি যত নেয়ামত দান করেছেন, এর শুকরিয়া আদায় করার এ ভাষাও তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন। যখন 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে শুকরিয়ার জয্বা-ই প্রকাশ পায়। কুরআনের যে সূরাটি পূর্ণ সূরা হিসেবে পয়লা নাযিল হয়েছে, তা 'আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' দিয়েই শুরু হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ যিক্র লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দোয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ'।

তাই তিন তাসবীহ পড়তে গিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' পড়ার সময় মনে খেয়াল করতে হবে যে, তাওহীদকে বুঝে ঈমান আনার তাওফীক যিনি দিলেন, তাঁর প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি। আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত গুণে শেষ করার ক্ষমতা যে মানুষের নেই, সেকথা কুরআনে কয়েকবার ঘোষণা করা হয়েছে। এসব নেয়ামতের মধ্যে দ্বীন ও ঈমান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ দান করে। তাই এর জন্য শুকরিয়া সবচেয়ে বেশী হতে হবে।

সূরা আল-আ'রাফের ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বেহেশতবাসীরা সেখানকার অফুরন্ত ও অগণিত নেয়ামত পেয়ে নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশের পরিবর্তে দ্বীনের পথে হেদায়াত দান করার জন্য এ ভাষায় আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া জানাবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ -

'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়েত করেছেন। তিনি যদি হেদায়াত না করতেন, তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না'। সূরা

www.bjilibrary.com

ইউনুসের ১০ আয়াতে বেহেশতবাসীদের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ তাদের প্রতি কথাই শেষ হবে 'আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' দিয়ে।

আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ভোগ করার পর এবং তাঁর কোন অনুগ্রহ পেলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলেই শুকরিয়া আদায় করার শিক্ষা রাসূল (সাঃ) দিয়েছেন। যেমনঃ

খাওয়ার পর الحمد لله الذى اطعمنى و سقنى و جعلنى من المسلمين,

ঘুম থেকে ওঠার পর الحمد لله الذى احيانا بعد ما امتنا و اليه النشور ।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আল-হামদুলিল্লাহ' কথাটির আসল উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করা। রাসুল (সাঃ) বলেন,

الحمد رأس الشر - ما شكر الله عبد لا يحمده (ابن عمر)

অর্থাৎ 'আল-হামদু হলো বড় শুকরিয়া। যে বান্দাহ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলো না, সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়াও আদায় করলো না।

আল্লাহু আকবারের হাকীকত ঃ

তিন তাসবীহ্-এর তৃতীয়টি হলো 'আল্লাহু আকবার'। এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে বড়'। সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে সূরা আল-মুদ্দাস্‌সিরে যেসব হেদায়াত দিয়েছেন, তার পয়লা কাজেই হলো, وربك فكبر 'আপনার রবের বড়ত্ব প্রচার করুন'। 'হে রাসূল! আপনি উঠুন ও কর্মতৎপর হোন এবং জনগণকে সতর্ক করুন'– এ ক'টি কথা বলার পরই যে কাজটি করার নির্দেশ দিলেন, তা-ই হলো 'আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বর্ণনা করুন'। এ কাজটির মাধ্যমেই মানুষকে সাবধান করুন যে, আল্লাহ্‌কে অবহেলা করে মানুষ কিছুতেই জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ্‌কে ভুলে মনগড়া জীবন যাপন করার পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করুন।

এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহ্‌র বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা। এ কারণেই চিরকাল আল্লাহ্‌র গোলামদের প্রথম ও প্রধান শ্লোগানই হলো 'আল্লাহু আকবার'। প্রতিদিন পাঁচবার আযান দেবার সময়ও পয়লা ডাক-ই হলো 'আল্লাহু আকবার'।

আল্লাহ্‌র দরবারে নামাযের উদ্দেশ্যে হাযির হয়ে 'আল্লাহু আকবার' দিয়েই প্রথম মনিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং রুকু ও সিজদায় যাবার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে একথাই স্বীকার করা হয় যে, হে আল্লাহ! তোমাকেই শুধু বড় মনে করি বলেই তোমার নিকট নত হচ্ছি ও আত্মসমর্পণ করছি। এভাবে মুমিনের জীবনের চালিকা শক্তি ও প্রেরণার উৎসই হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার'।

www.bjilibrary.com

মুমিনের 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করার সময় মনে যে কথা খেয়াল করতে হবে, এর দু'টো দিক রয়েছে– একটি তার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের দিক, আর একটি হচ্ছে সমাজে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব কায়েম করার দিক। ব্যক্তিগত দিক দিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, 'দুনিয়ার সব সম্পর্ক আল্লাহ্‌র খাতিরে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কোন কিছুকেই আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ভালবাসবো না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করবো না।' এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে মুমিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক।

আর সমাজে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করার দিক হলো ইক্বামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন। সমাজ ও রাষ্ট্রে যদি আল্লাহ্‌র আইন কায়েম না হয়, তাহলে বাস্তবে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বহাল থাকতে পারে না। মানুষের মনগড়া আইনের অধীনে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করার মানে হলো, আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা। বাতিল জীবন ব্যবস্থার অধীনে বাতিল শক্তি আল্লাহ্‌কে মানতে যতটুকু অনুমতি দেয়, ততটুকু মেনে চলার দ্বারা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব স্বীকার করা হয় না। বাতিল সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান কায়েমের চেষ্টা না করে আযানে ও নামাযে যত জোরেই 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করা হোক, তাতে আসলে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব প্রকাশ পায় না।

তাই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এবং সমাজে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব কায়েমের জয্‌বা নিয়েই 'আল্লাহু আকবার' তাসবীহ্ জপতে হবে।

তিন তাসবীহ্ পড়ার সময়

প্রতি নামাযের পর এবং শোবার সময় এ তিনটি তাসবীহ জপবার তাকীদ দেয়ার উদ্দেশ্যেই এর এত রকম ফযীলত রাসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। এ তাসবীহ্‌গুলোর হাক্বীকতের দিকে খেয়াল রেখে পড়া হলে মুমিনের জীবনে তার ঈমান কখনো দুর্বল হবে না এবং বাতিলের মুকাবিলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সে দ্বিধা করবে না।

তিন তাসবীহ্ জপবার সময় যে খেয়াল মনে রাখতে হবে, তা একসাথে সাজিয়ে বলছিঃ

"সব রকম শির্‌ক থেকে আমার মনকে পাক-সাফ করে 'সুবহানাল্লাহ' বলে আমার মাবুদের পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাওহীদকে বুঝে-শুনে কবুল করছি।"

"যে মহান মনিব আমাকে শির্‌কমুক্ত খালেস তাওহীদের ওপর ঈমান আনার তাওফীক দিলেন, 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে তাঁর প্রতি আন্তরিক গভীর শুকরিয়া জানাচ্ছি।"

"আল্লাহু আকবার' বলে আমি এ সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমার জীবনে ও আল্লাহ্‌র যমীনে আমার আল্লাহ্‌র বড়ত্ব কায়েমের জন্য আমি আজীবন জিহাদ করতে থাকবো।"

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এবং শোবার সময় ঐ কথাগুলো খেয়াল রেখে তিন তাসবীহ্ পড়বে, সে কখনো তাওহীদের চেতনা, ঈমানের মূল্য ও ইক্বামাতে দ্বীনের দায়িত্বের কথা ভুলবে না।

[১৯৯২ সালের অক্টোবরে মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

[১৯৬২ সালে "সাপ্তাহিক জাহানে নও"য়ের আযাদী বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়।]

অর্থনীতি কাহাকে বলে?

মানুষ মূলতঃ যদিও নৈতিক জীব, তবুও এই বস্তুজগতে শরীর বিশিষ্ট অবস্থায়ই তাহাকে অবস্থান করিতে হয়। মানুষের শরীর তাহারই বস্তুসত্তা। ইহার অস্তিত্ব ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট বস্তুর ব্যবহারের উপরই নির্ভরশীল। অন্যান্য জীব জন্তুরও বস্তুগত অভাব রহিয়াছে। উহাদের অভাব পূরণের উপযোগী বস্তু প্রকৃতির রাজ্যে তৈয়ারই (Readymade) থাকে। কিন্তু মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন বা অভাব আপনা আপনিই পূরণ হয় না। তাহাকে প্রাকৃতিক উপাদানের সহিত বুদ্ধি ও শ্রম ব্যবহার করিয়া এই অভাব পূরণ করিতে হয়। মানুষের এই বস্তুগত অভাব পূরণের সমস্যা লইয়াই অর্থনীতি বিজ্ঞানের কারবার।

ইসলামের অর্থনীতি কি?

জীবজন্তু সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিলেও উহাদিগকে ইচ্ছাকৃতভাবে যাচাই বাছাই করিয়া নিজেদের জন্য আইন কানুন রচনা করিতে হয় না। কিন্তু মানুষের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যেমন বিধান তৈয়ার করা দরকার তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আইন রচনার প্রয়োজন। মানুষের বস্তুগত অভাবের সমস্যা সমাধান করিবার জন্যই অর্থনৈতিক আইন রচিত হয়। মানব জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য ইসলাম যেসব বিধান দিয়াছে সমষ্টিগতভাবে উহাকেই ইসলামী অর্থনীতি বলিতে হইবে।

অর্থনীতির চারিটি দিক ঃ

মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন বহু রকমের। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যতই বেশী পরিমাণ বস্তুশক্তিকে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইতেছে, ততই তাহার প্রয়োজনও বাড়িয়া চালিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন বর্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল। তবুও অন্যান্য জীবের তুলনায় তাহার প্রয়োজন এত বেশী ব্যাপক যে এই সব যোগাড় করিবার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ পূর্ণরূপে তৈয়ার (Readymade) থাকে না বলিয়া মানুষকে প্রথমতঃ উৎপাদন করিতে হয়। প্রাকৃতিক উপাদানের উপর বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়াই মানুষ উৎপাদন করিয়া থাকে। উৎপাদন (Production) অর্থনীতির প্রথম দিক।

বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যেই বন্টন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই এই বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। যাহারা কাপড় উৎপাদন করে, তাহাদের যেমন খাদ্যের

www.bjilibrary.com

আবশ্যক তেমনি খাদ্য উৎপাদনকারীদেরও কাপড় প্রয়োজন। পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বিভিন্ন উৎপাদকগণকেও অর্থের বিনিময়ে আদান প্রদান করিতে হয় বলিয়া এই বন্টন ব্যবস্থাকে বিনিময়ও বলা হয়। (ইংরেজীতে ইহাকে (Distribution বা Exchange বলে)। বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট যেসব বস্তু পৌঁছে সে সবকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুপাতে সকলেই ব্যবহার করে। ইহাকেই ব্যয় (Consumption) নামে অভিহিত করা হয়।

উৎপাদিত দ্রব্য বন্টিত ও ব্যয়িত হওয়ার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা কিরূপে ব্যবহার করা যাইবে সে বিষয়ও অর্থনীতির আওতাভুক্ত।

এইরূপ উৎপাদন বন্টন ব্যয় ও উদ্বৃত্তের ব্যবহার (Use of Surplus) মিলিয়া অর্থনীতির চারিটি দিক রহিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার অর্থনীতি ঃ

অর্থনীতির উপরোক্ত চারিটি দিককে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু এই চারিটি দিক কোন ধরনের বিধান-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই মৌলিক প্রশ্ন। অতীতে ও বর্তমানে যত প্রকার অর্থনীতি দুনিয়ায় জন্মলাভ করিয়াছে, উহাদের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে বিভিন্ন অর্থনীতিতে উৎপাদন, বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার বিধি রহিয়াছে। উৎপাদন, বন্টন, ব্যয় ও উদ্বৃত্তের ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানই সকল প্রকার অর্থনীতির উদ্দেশ্য। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এই সকল সমস্যার এক ধরনের সমাধান পেশ করিয়াছে। কমিউনিজম আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অর্থনীতির প্রচলন করিয়াছে। এই সব সমস্যার সমাধানে ইসলাম যে সমাধান দান করিয়াছে তাহাই ইসলামের অর্থনীতি।

উৎপাদন, বন্টন, ব্যয় ও উদ্বৃত্তের ব্যবহার সম্পর্কে পুঁজিবাদ, কমিউনিজম ও ইসলামের সমাধানে কি কি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এই সব বিষয়ে ইসলামের সমাধান সম্বন্ধেও পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এখানে ইসলামে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে অনুধাবন করার প্রয়োজনে যেটুকু আলোচনা অত্যাবশ্যক তাহাই উল্লেখ করা হইবে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম ও অর্থনীতি

অর্থনীতি মানব জীবনের একটি বিরাট বিভাগ। জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণকে সঠিকরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে মানব জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কেননা ইসলামের অর্থনীতি ইসলামী জীবন দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন কোন মতবাদ নয়। বস্তুতঃ মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ইসলামী অর্থনীতিও উহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

মানব জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

কমিউনিজম মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক জীব হিসেবে বিচার করে 'স্বাধীন বিশ্ব' নামে পরিচিত দেশসমূহ মানুষকে প্রধানত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখে এবং ফ্রয়েড সম্পূর্ণ মানুষটিকে যৌন জীব বলিয়া মনে করে। এইরূপে মানব রচিত প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই মানুষকে কোন একটি বিশেষ দিক হইতে দেখিতে গিয়া সাত অন্ধের হাতী দেখার ন্যায় চরম ভুল করা হইয়াছে। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনেক দিক রহিয়াছে সত্য। কিন্তু গোটা মানুষটি কোন একটি বিশেষ দিক দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মূলতঃ নৈতিক জীব। এই নৈতিক সত্তাটিই প্রকৃত মানুষ। ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা ও সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষকে যে চেতনা দান করা হইয়াছে, তাহাই মানুষের মূল সত্তা। ইসলাম এই মনুষ্য সত্তাটিকে বিশেষ কতক মূল্যমান ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত করিবার বিধান দান করে।

সকল জীবন বিধানেরই কতক মূল্যমান থাকে। কমিউনিজমের সমস্ত মূল্যমান অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর তথাকথিত স্বাধীন দুনিয়ার মূল্যবোধ রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু ইসলাম মানুষের জন্য যে মূল্যমান নির্ধারণ করিয়াছে, তাহা কোন বিশেষ পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ইসলাম এই সমগ্র মূল্যমান দ্বারাই গোটা মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। অর্থাৎ ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করে।

ইসলামের মূল্যবোধ ঃ

ইসলাম মানুষের জীবনকে যে ধরনের মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়, তাহা অর্থনীতি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ঐ মূল্যবোধকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাহার নিকট (আখেরাতে) প্রতিটি কাজের জন্য জওয়াবদিহির অনুভূতিই ইসলামী মূল্যবোধের প্রধান ভিত্তি। ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস ও অনুভূতিকে ব্যাপ্ত করিতে চায়। কেননা ইসলাম নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসের পক্ষপাতী নয়। তাছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে কোন

www.bjilibrary.com

কর্মই বিশ্বাসহীন হইতে পারে না বলিয়া ইসলাম অর্থনৈতিক জীবনকেও আল্লাহ এবং আখেরাতের বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কর্মই উহার অনুরূপ বিশ্বাসের ফল এবং প্রত্যেক বিশ্বাসই উহার অনুরূপ কর্মের মূল। আল্লাহর বিধান ও পরকালের কর্মফলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় তাহাই ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে গঠন করে।

মূল্যবোধের ট্রেনিং ঃ

বাস্তব জীবনে ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাতের মাধ্যমে ইসলাম যে ব্যাপক ট্রেনিং দান করে তাহাতে নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বহুবিধ ট্রেনিং-এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ট্রেনিংও দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সুবিচার ও সাম্য প্রয়োজন তাহার জন্য নামাজ ও রোজায় সামাজিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। জাকাত ও হজ্জের মধ্যে অর্থনৈতিক ট্রেনিং আরও স্পষ্ট। নামাজ-রোজা ও হজ্জ-জাকাতকে ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইসলাম মানুষের বাস্তব জীবনের উপযোগী ট্রেনিংকে যে পবিত্র মর্যাদা দিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলাম এ কথা বিশ্বাস করে না যে, মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন হইতে অর্থনৈতিক জীবনকে পৃথক করিতে হইবে। ইসলাম জাকাতকে অন্যতম বুনিয়াদী ইবাদত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। ইহা দ্বারা এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে যে ইসলামের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিধিসমূহ জাকাতের ন্যায় শুধু অর্থনৈতিক মর্যাদাই বহন করে না বরং উহারা ধর্মীয় পবিত্রতারই অধিকারী। তাই ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান অমান্য করা শুধু বেআইনীই নয়, গুনাহও বটে।

বৈরাগ্যবাদ বনাম ভোগবাদ ঃ

ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে একমাত্র সামঞ্জস্যশীল সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ইসলাম মানুষকে বৈরাগী হইতে নিষেধ করে। বস্তুগত প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা বা দেহের দাবীকে একেবারে উপেক্ষা করা ইসলামের শিক্ষা নয়। তাই বলিয়া ইসলাম মানুষকে একটি অর্থনৈতিক জীব বা দেহ সর্বস্ব জন্তুও মনে করে না। অর্থাৎ সবই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

কুরআন পাকের এই জাতীয় বহু আয়াতে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে যে, এই বস্তু জগতকে মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক মানুষকে বস্তুগত প্রয়োজন দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বৈরাগী হওয়ার চেষ্টা করিলে মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করা হইবে। আবার অন্যদিকে মানুষ নৈতিকতার সকল বাধন ছিড়িয়া বস্তুকে ভোগ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে মানব স্বভাবের বিরোধী হইবে। এই উভয় অবস্থায়ই মানুষ তাহার প্রকৃত মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হয়। আসলে মানুষ এই দুইটির সমন্বয়ে এক তৃতীয় শক্তিসম্পন্ন জীব।

www.bjilibrary.com

ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মূলনীতি ঃ

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী অর্থনীতিকে সংগঠন করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি পেশ করিয়াছে। এইসব মূলনীতি অনুযায়ী বিস্তারিত আইন রচনা করা ইসলামী হুকুমাতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

(ক) শ্রম ও মূলধনের গুরুত্ব ঃ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিককে শুধু বাঁচিয়া থাকার উপযোগী শ্রমমূল্য দিয়া মূলধন প্রয়োগকারী বা ব্যবস্থাপকগণ সমাজে পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে। ইসলাম শ্রমের যে মর্যাদা দিয়াছে তাহাতে উৎপাদনে শ্রমিকদের স্থান ক্রীতদাসের পর্যায়ে নয়। ক্রীতদাসদের সম্পর্কেও মালিকগণকে ইসলাম নির্দেশ দিয়াছে যে তোমরা যাহা খাও তাহাদিগকে তাহাই খাইতে দাও, তোমরা যা পরিধান কর তাহাদিগকে তাহাই পরিতে দাও। শ্রমিক হালের বলদের ন্যায় শুধু চাষ আবাদের কাজ চালাইবার উপযোগী ভরণ পোষণ লাভের যোগ্যই নয়, আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষের মর্যাদা লইয়া জীবন যাপন করার যোগ্য সুযোগও তাহার প্রাপ্য।

(খ) জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার ঃ

ইসলাম মানুষে মানুষে গুণের ভিত্তিতে স্বাভাবিক পার্থক্যকেই স্বীকার করে। কিন্তু বংশ, ভাষা দেশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দোহাই দিয়া মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। এই হিসাবে জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে কোন বিশেষ গোত্র বংশ বা এলাকার লোকের কোন ইজরাদারী থাকা ইসলামসম্মত নয়। ধনীর সন্তান বলিয়াই একজন জীবিকার সকল পথ দখল করিয়া থাকিবে আর একজন দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই জীবিকার সকল দ্বার তাহার মুখের উপর রুদ্ধ থাকিবে এমন পরিস্থিতি ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের ইতিহাসই একথার সাক্ষী।

(গ) নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত মালিকানা ঃ

পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-মালিকানা ও কমিউনিজমের রাষ্ট্রীয় মালিকানার কোনটাকেই ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের মতে ব্যক্তি-মালিকানা কোন গুনাহ নয় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাও কোন সওয়াব নয়। ইসলাম অনেক নিয়ম কানুন দ্বারা ব্যক্তি-মালিকানাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ব্যক্তি-মালিকানা ব্যক্তি স্বাধীনতার এক অপরিহার্য অঙ্গ।

(ঘ) উপার্জন ও ব্যয়ের ব্যাপারে বিধিনিষেধ ঃ

ইসলাম উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমন হালাল হারামের সীমা বাধিয়া দিয়াছে তেমনি ব্যয়ের ব্যাপারেও অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে। ইসলাম জুয়া, সুদ, ঘুষ এবং সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রতারণামূলক উপার্জনকে হারাম করিয়া দিয়াছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপব্যয়, অশ্লীল কার্যে ব্যয় ও অনাবশ্যক বিলাসে ব্যয়কে নিষেধ করিয়াছে। একা একা ভোগ করাও ইসলামে নিষেধ। প্রতিটি সক্ষম মানুষকে বিবাহ করিতে হইবে।

www.bjilibrary.com

বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণ করিতে হইবে। সন্তান সন্ততির লালন পালন করিতে হইবে। প্রতিবেশী দরিদ্র ও আত্মীয়কে সাহায্য করিতে হইবে। জাতীয় প্রয়োজনে ব্যয় করিতে হইবে। এই রূপে ব্যয় করার বিরাট ফিরিস্তি লইয়া ইসলাম প্রত্যেকটি সক্ষম ব্যক্তির নিকট হাজির হয়। কৃপণতাকে ইসলাম অত্যন্ত ঘৃণা করে। মোদ্দা কথা প্রয়োজনীয় ব্যয় না করা ইসলামের মতে যেমন ঘৃণ্য, অপব্যয় করাও তেমনি জঘন্য।

(ঙ) সংঘর্ষ নয় সহযোগিতা ঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থে (Interest) পরস্পর দ্বন্দ্ব লাগিবার সম্ভাবনা স্বাভাবিক। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ইসলামের মূল শিক্ষার বিরোধী। যে মূল কারণে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জন্য সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করাই ইসলামের সামাজিক দাবী। কমিউনিষ্টদের কর্মপদ্ধতির প্রধান অংশই হইল শ্রেণী বিদ্বেষকে মূলধন করিয়া শ্রেণী সংগ্রামের সৃষ্টি করা। কিন্তু এইরূপ শ্রেণী বিদ্বেষ ইসলামের মূল শিক্ষার চরম পরিপন্থী।

(চ) ব্যক্তি ও সমাজে সামঞ্জস্য ঃ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়া বিপুলসংখ্যক মানুষকে অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করা হয়। মানুষকে এতটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয় যে, সমাজ সেখানে অনেকখানি অবহেলিত হয়। অর্থশালীদের ব্যক্তিস্বার্থ সমাজ স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে। ব্যক্তিস্বাধীনতার শ্লোগান এত তীব্র যে, সেখানে একদিকে যেমন জাতির সম্পদকে গুটিকয়েক লোক দখল করিবার স্বাধীনতা লাভ করে অপর দিকে তেমনি অগণিত অভাবগ্রস্ত মানুষকে জঠর জ্বালায় ও বিনা চিকিৎসায় ফুটপাতে পড়িয়া মরিয়া থাকার স্বাধীনতাও (?) থাকে।

আবার কমিউনিজমকে সমাজের প্রতি সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত নয়। সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের নামে সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। উৎপাদন ও বন্টনের যাবতীয় উপায় উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিবার ফলে দেশের সকল নাগরিকই সরকারী গোলামে পরিণত হয় এবং তাহাদের পক্ষে সরকারের কোন প্রকার সমালোচনা করাই জায়েয নয়। তাই পুঁজিবাদ ও তথাকথিত সাম্যবাদের কোনটাতেই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য কায়েম হয় না। ইসলাম এক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা গ্রহণ করে। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করার এবং সমাজের দিকে প্রতিটি ব্যক্তিকে অত্যন্ত মনোযোগী হাওয়ার তাগিদ দেয়। ব্যয় সম্পর্কিত আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে ইসলাম সামাজিক দায়িত্বের প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামের মতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই নিজ নিজ স্থানে গুরুত্বপূর্ণ কোনটাই উপেক্ষিত হওয়ার যোগ্য নয়। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে যেমন সমাজ গড়িয়া উঠে তেমনি সমাজই ব্যক্তিকে সঠিকরূপে গঠন করিতে সাহায্য করে।

www.bjilibrary.com

(ছ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঃ

সমাজে সাধারণভাবে তিন প্রকারের উপার্জনকারী থাকে। কতক লোক এত উপার্জন করিতে সক্ষম যে নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করিবার পরও তাহাদের নিকট অনেক সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে। আর অনেক এরূপও পাওয়া যায়, যাহারা নিজেদের প্রয়োজন কোন প্রকারে পূরণ করিতে সক্ষম। আবার কতক লোক এরূপও থাকিয়া যায় যাহারা নিজেদের বাঁচিবার উপযোগী সম্পদ উপার্জন করিতেও অক্ষম। ইহা ছাড়া রুগ্ন, এতিম, বিধবা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ইত্যাদি নানা প্রকারের উপার্জনক্ষম মানুষ সমাজে যথেষ্ট থাকে। কোন সমাজ ব্যবস্থাই এই দাবী করিতে পারে না যে, অর্থ নৈতিক দিক দিয়া এইরূপ অক্ষম ও দুর্বল লোক সমাজে থাকিবে না। যে সমাজে ইহাদের জন্য কোন স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকেনা সে সমাজকে কিছুতেই সভ্য সমাজ বলা চলে না।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে বিকৃত ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কায়েম আছে তাহাতে সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নাই। এই পুঁজিবাদী অর্থটির ব্যবস্থায় নিরাপত্তার নামে বহু প্রকার বীমা প্রচলিত আছে। কিন্তু যারা বীমার প্রিমিয়ার দিতে অক্ষম তাহাদের নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই।

ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এমন চমৎকার ব্যবস্থা রহিয়াছে যে আজ পর্যন্ত কোন সমাজ ব্যবস্থাই ইহার তুল্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা দিতে পারে নাই। ইসলাম উৎপাদনের সকল উপায় উপকরণ ও জমা সম্পদের উপর নিদিষ্ট হারে জাকাত ধার্য করে। ইহা কোন সরকারী কর নয়। আল্লাহ পাক ইহাকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভের মর্যাদা দিয়াছেন। ইহা একটি অনুপম সামাজিক ব্যবস্থা। বিশেষ পরিমাণ উদ্বৃত্ত টাকা, অলংকার, ব্যবসায়ের মূলধন, জমির ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদির উপর বিভিন্ন জাকাত নির্ধারিত রহিয়াছে। এইরূপে অর্জিত বিপুল সম্পদ প্রধানত সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই ব্যয়িত হইতে পারে। সাধারণ সরকারী খরচায় ইহা ব্যবহার করিলে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(জ) নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঃ

ইসলাম নারীর উপর উপার্জনের দায়িত্ব অর্পণ করে নাই। সন্তান উৎপাদন, শিশু পালন এবং স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনার পরও নিজের বা সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য উপার্জন করিতে ইসলাম নারীকে বাধ্য করে না। বিবাহের সময় তাহাকে স্বামীর নিকট হইতে মোহর লইবার অধিকার দিয়াছে। স্ত্রী দাবী করিলে অর্ধেক মোহর না পাওয়া পর্যন্ত স্বামী তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। নারী পিতা মাতা ও আত্মীয়দের সম্পত্তি হইতে যেমন উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশ পাওয়ার অধিকারী তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পরও উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তি পায়। স্ত্রী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হইলে ইদ্দতের সময়কার খোরপোষও স্বামীর নিকট হইতে পাওয়ার অধিকারী।

যাহারা নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সর্বপ্রকারে বঞ্চিতা ও আত্মনির্ভরশীলা হইতে বাধ্য করিতেছে, তাহারা নারীর জন্য প্রবঞ্চনার বহু আকর্ষণীয় পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে

www.bjilibrary.com

বটে, কিন্তু ইসলাম নারীকে যে অর্থনৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা আর কোন সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় না।

স্ত্রী যদি নিজের সম্পদ (এমনকি স্বামী হইতে মোহর বাবদ প্রাপ্ত হইলেও) বৃদ্ধির জন্য আরও উপার্জনের ব্যবস্থা করে এবং স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালনের পর যদি অতিরিক্ত রোজগার করিতেও সক্ষম হয় তাহা হইলে স্ত্রীর এই উপার্জিত সম্পদের উপর স্বামীর বা সন্তানাদির কোন দাবি ইসলাম স্বীকার করে না। যদি স্ত্রী খুশী হইয়া তাহাদের জন্য খরচ করে তাহা হইলে ইহা দান বলিয়া মনে করিতে হইবে।

(ঝ) ইসলামে পুঁজিবাদ অসম্ভব ঃ

ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানে পুঁজিবাদের জন্ম হওয়া দূরের কথা পুঁজিবাদ টিকিয়াই থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ উপার্জনে ও উৎপাদনে বহুবিধ হালাল-হারামের সীমা চতুর্দিকে ঘেরাও করিয়া থাকে। ব্যয়ের ব্যাপারে এত দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত যে, সাধারণভাবে বেশী পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকাই অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ জমা টাকা অনর্থক ফেলিয়া রাখিলে জাকাতের মাধ্যমে খতম হইয়া যাইবে বলিয়া ব্যবসায় খাটাইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু সুদে লগ্নি করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ যদি কেহ সম্পদকে স্ত্রীর অলংকার ও স্বর্ণরৌপ্যের আসবাব পত্রের ন্যায় ঘরে জমা করিতে চায়, তাহা হইলেও জাকাতের দাপটে তাহা লাভজনক হইবে না। চতুর্থঃ উৎপাদনের সকল উপায় উপাদানের উপরই জাকাত আদায় করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ মৃত্যুর পূর্বে দরিদ্র আত্মীয়ের জন্য হেবা করার উপদেশ এবং মৃত্যুর সময় অছিয়তের তাগিদ রহিয়াছে। এত সবের পরও যদি কাহারো নিকট যথেষ্ট সম্পদ জমা হয় তবে তাহা হালালই হইবে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর এই সম্পদের উপর ফরায়েজে যে শেষ আঘাত আসিবে, তাহার ফলে আত্মীয়দের মধ্যে এই সম্পদ বিভক্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের পুষ্টিলাভের কোন উপায়ই নাই।

(ঞ) ইসলামী হুকুমাতের গুরুত্ব ঃ

বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত একশ্রেণীর সুধী ব্যক্তি ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা শুনিলেই কিছুটা বিরক্তির সুরে মন্তব্য করেন যে ব্যবস্থাটা তো ভালই মনে হয়, কিন্তু সমাজের কোথাও ইহা বাস্তবে দেখ যায় না। তাহারা একথা ভুলিয়া যান (হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই) যে কোন ব্যবস্থাই রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত বাস্তব রূপলাভ করিতে পারে না। অর্থ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ক্ষমতার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলে এক মুহূর্ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। পুঁজিবাদীদের নিকট হইতে যেখানেই কমিউনিষ্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে, সেখানেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে নাই।

আমরা বুঝিতে পারি না যে, ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র গঠন ব্যতীত এবং ইসলামী আদর্শ বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত দেখার দাবী কোন যুক্তিতে পেশ করা হয়। ইসলামী হুকুমাত কায়েম হওয়া ছাড়া এই সামঞ্জস্যশীল ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি কিছুতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

[১৯৬৭ সালে মুক্তিপথ নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

মুসলিম ঐক্য

আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেন, "(হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ) "তোমরা আল্লাহর রজ্জু মযবুতভাবে ধরে থাক এবং দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।" এ আয়াতে ঈমানদারদের ঐক্যের ভিত্তি কী তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।" "আল্লাহর রজ্জু" দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাক ঈমানদারদেরকে দ্বীনের পথে মযবুতভাবে চলার নির্দেশই এখানে দিয়েছেন এবং দলাদলি করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

এ সূরার ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং স্পষ্ট হেদায়াত আসার পরও মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছে।" এ আয়াতে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ মতভেদ করে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এখানে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে তোমরা তাদের মতো হয়ে যেওনা।

সূরা আনফালের ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে "(হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না। নতুবা তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।"

এ আয়াতেও দেখা যায় যে, ঈমানদারদের ঐক্যের আসল ভিত্তি যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য সে কথা পয়লাই উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর বলা হয়েছে যে তোমরা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হয়ো না। কারণ বিভেদই দুর্বলতার জন্ম দেয় আর বিরোধীরা যখন তোমাদের মধ্যে বিভেদ আছে বলে টের পায় তখন তাদের অন্তরে তোমাদের প্রভাব খতম হয়ে যায়।

মুসলিম জাতির শক্তির প্রমাণই হলো ঐক্য। আর ঐক্যের ভিত্তি হলো নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা বা দ্বীনের রজ্জুকে মযবুত হাতে ধরে থাকা। অনৈক্যই যে মুসলিম জাতির দুরবস্থার মূল কারণ সে কথা উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

এ যুক্তি কেউ অস্বীকার করে না যে ঐক্যই শক্তি এবং অনৈক্যই দুর্বলতা। এ সত্ত্বেও ঐক্যের এমন অভাব কেন? উপরের কয়টি আয়াত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে দ্বীনের সত্যিকার আনুগত্যের অভাবেই অনৈক্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দ্বীনের অভাবেই বিভেদ জন্ম নেয়। দ্বীনের স্বার্থে বিভেদ হয় না।

মুসলিম জাতির আসল কাজই হলো "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।" এ কাজ যারা করে না তারাই ফাসাদে লিপ্ত হয়। তাদের ফাসাদকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য তারা

www.bjilibrary.com

দ্বীনের স্বার্থ দেখায়। এভাবে তারা "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" পরিত্যাগ করে "ফাসাদ ফী সাবীলিল্লাহ" নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

মুসলিম নামধারী হয়েও যারা ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী বা জাতীয়তাবাদী তাদের কথা আলাদা। ইসলামের বিজয় তাদের কাম্য হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু যারা চান যে দ্বীন কায়েম হোক এবং আল্লাহর আইন চালু হোক তাদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাদের মধ্যে মত পার্থক্য হতে পারে। দ্বীনের কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত থাকতে পারে এবং সে বিষয়ে বিতর্কেও লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বিবাদ হওয়া অস্বাভাবিক যার ফলে বিরোধীরা ধারণা করতে পারে যে, তারা একে অপরের দুশমন।

মতভেদ থাকা দোষণীয় নয়। কিন্তু দ্বীনের দোহাই দিয়ে একদল আর একদলের প্রকাশ্য বিরোধিতা করা এক দল আর এক দলকে কাফির বলে গালি দেয়া, গুমরাহ বলে ফতোয়া প্রচার করা প্রকৃত দ্বীনদারীর কোন পরিচয় বহন করে না। ঝগড়া-বিবাদ, ফাসাদ ও গালাগালি যারা করে তারা আসলে ফেরকাবন্দীর কারণেই করে। যারা দ্বীনের এক ধরনের খেদমত নিয়ে ব্যস্ত আছেন তারা নিজেদেরকে হয়তো দ্বীনের প্রধান পতাকাবাহী মনে করেন যার ফলে তাদের বাইরে যারা অন্যভাবে দ্বীনের খেদমত করছেন তাদের ঐ খেদমতকে গুরুত্বই দেন না। তাই জনগণকে নিজেদের খেদমতের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়োজনেই অন্যদের বিরোধিতা করেন।

সূরা আল আনয়ামের ১৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে "(হে রাসূল) যারা তাদের দ্বীনকে খন্ড খন্ড করে ফেলেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।" সূরা আররুমের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে "যারা তাদের দ্বীনকে আলাদা করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের নিকট যা আছে তাতেই মগ্ন হয়ে আছে।"

এ দুটো আয়াতে দ্বীনকে টুকরা টুকরা করা এবং দ্বীনের কোন এক খেদমত বা দ্বীনের কোন একটি দিককে আলাদা করে নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করার ব্যাখ্যা আলোচনা করলেই অনৈক্যের কারণ বুঝতে সহজ হবে।

আল্লাহর দ্বীন মানব সৃষ্টির শুরু থেকে মূলতঃ একই রয়েছে। সকল নবীর দ্বীনএকই ছিল। শরীয়তে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে; কিন্তু আসল দ্বীনে কোন পার্থক্য ছিল না, আজও নেই। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও রব মানা, আল্লাহর যাত-সিফাত, হক ও ইখতিয়ারে আর কাউকে শরীক না করা, আল্লাহর নিকট আখিরাতে জওয়াবদিহি করার চেতনা নিয়ে জীবন যাপন করা, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা কায়েম করা এবং যা অপছন্দ করেন তা সমাজ থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করাই দ্বীনের দাবী।

www.bjilibrary.com

এ দ্বীন পালন করতে গিয়ে যে সব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল মত পার্থক্যের ফাঁক রেখেছেন সেখানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পূর্ণ দ্বীনকে পালন ও কায়েমের চেষ্টা না করে বিভিন্ন ব্যাখ্যার বিবাদে লিপ্ত হওয়া দ্বীনের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিষ্ঠার সাথে নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করা মোটেই আপত্তিকর নয়। এমন কি নিজের ব্যাখ্যা প্রচার করাও দোষণীয় নয়। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ফতোয়ার ভাষায় হারাম, কুফরী বা ফাসেকী বলে প্রচার চালালেই সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তায়ালা ইসলমামকেই একমাত্র দ্বীন হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে এই দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে একথা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে ইব্রাহীম (আঃ) ইয়াহুদী বা নাসারা ছিলেন না, তিনি মুসলিম ছিলেন। অথচ ইব্রাহীম (আঃ)কে রাসূল বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও একদল নিজেদেরকে ইয়াহুদী ও অন্যদল তাদেরকে নাসারা বলে মনে করছে। এ ফেরকাবন্দী মানুষের সৃষ্টি।

এক আল্লাহ এক রাসুল ও এক কুরআন যারা মানে তাদের মধ্যেও এত ফেরকা কেমন করে সৃষ্টি হলো তা সত্যিই বিস্ময়কর। উপরে বর্ণিত দুটো আয়াতে এরই কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা নিজেদের দ্বীনকে অপর থেকে আলাদা করে নিয়েছে এবং এভাবেই তারা দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে।

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর জন্য রাসূল (সঃ) কে একমাত্র "উসওয়াতুন হাসানা" বা "সুন্দরতম আদর্শ" হিসেবে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তার সংগ্রামী জীবন যারা অনুসরণের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায় তাদের মধ্যে মাসলা মাসায়েলে যত পার্থক্যই থাকুক তার সবাই একই দ্বীনের অনুসারী বলে অনুভব করে। তারা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী আহলি হাদীস হিসাবে পরিচিত হলেও এটুকু পার্থক্যের দরুন তারা ভিন্ন ভিন্ন দ্বীনের অনুসারী বলে মনে করে না। তারা নিজেদের দ্বীনকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নেয় না। তারা দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে না। তারা একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করতে দ্বিধাবোধ করে না। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে একই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ফরয দায়িত্ব পালন করতে তারা কোন অসুবিধা বোধ করে না।

কিন্তু এ চার মাযহাব ও আহলি হাদীসের অনুসারী লোকেরা প্রকৃতপক্ষে একই "আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের" অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যারা বাতিলের বিরুদ্ধে দ্বীনে হকের বিজয়ের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করে না তারা হানাফী ও আহলি হাদীসের পার্থক্যকে মূলধন করে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন সময় একদল অপর দলের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালায় এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। এমন কি কোন একদল বেদ্বীনদেরকে বরদাশত করতে রাজি হলেও অপর দ্বীনে দলকে সহ্য করতে পারে না। এরাই নিজেদেরকে

www.bjilibrary.com

মুসলিম পরিচয় দেবার চেয়ে ভিন্ন মাযহাবী নামে পরিচিত হওয়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

এছাড়া আরও অনেক নগণ্য বিষয়কে ভিত্তি করে দ্বীনকে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে যে ভাগ করা হয়েছে তা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। যদি চার মাযহাব ও আহলি হাদীসের ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর আইন ও নেক লোকের শাসন কায়েমের জন্য ইখলাসের সাথে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তখন শিরক ও বিদয়াতের রূপে হাজারো ফিরকার মুসীবত হতে মুসলিম মিল্লাত সহজেই নাজাত পেতে পারে।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয়ে চার মাযহাব ও আহুলি হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা সবাই "আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"-এর মধ্যে গণ্য। তাদের সবার পেছনেই সবার নামায আদায় হয় বলে বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে নামাযের ফরযগুলোর ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ওয়াজিবের ব্যাপারে দু' এক জায়গায় পার্থক্য আছে। সুন্নাত ও মুস্তাহাবে কিছু পার্থক্য আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে শতকরা ৯৭/৯৮ অংশে সবার মধ্যে পূর্ণ মিল থাকা সত্ত্বেও সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বেমিলকে মূলধন করে ঐ পার্থক্যটুকুর ভিত্তিতেই নিজেদের পৃথক পরিচয় দেয়া হচ্ছে। মিলগুলোর চর্চা না করে কয়েকটি বেমিলকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যেন একের দ্বীন অপর থেকে পৃথক। ছোট ছোট পার্থক্যগুলোকে বড় করে দেখার কারণে দ্বীনের আসল দাবীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে আল্লাহর ফজলে বিরাট সংখ্যক ওলামা ও মাশায়েখ বিভিন্নভাবে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, দারস, ওয়াজ, তাবলীগ, দাওয়াত, কুরআনের তাফসী, হাদীসের অনুবাদ, ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিপুল সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের যারা খেদমত করছেন তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হলে এদেশ থেকে বাতিল অতি সহজেই উৎখাত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহর আইন ও রাসূলের সুন্নাত সর্বক্ষেত্রে চালু করা সহজ। এ ঐক্য মুসলিম জাতির দাবি। এ ঐক্য না হওয়ার পথে আসল বাধা কোথায়? ইসলামের উপরোক্ত খাদেমগণের আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাবেই মহান ইপ্সিত ঐক্য গড়ে উঠছে না। আল্লাহ পাক এ অভাব দূর করুন এ কামনাই করি। এর জন্য আল্লাহ পাক সর্বাত্মক চেষ্টা করার তাওফীক দান করুন আমীন।

[১৯৯০ সনে ইসলামী শিবির সম্মেলন স্মারকে প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

মুসলিম ঐক্য ও তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন

[১৯৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারী মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে জেদ্দা রেডিও'র জন্য লিখিত এ প্রবন্ধটি জেদ্দা রেডিও থেকে ২৭-১-৮১ তারিখে প্রচারিত হয়।]

আগামী ২৫শে জানুয়ারী বিশ্বের মুসলিমদের মহান কিবলা মক্কা মুকাররামায় প্রায় ৪০টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কদের যে ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সাফল্যের উপর দুনিয়ার শান্তি ও সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভরশীল। দু' পরাশক্তির অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বিশ্বকে এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে হাজির করেছে যে, একমাত্র মুসলিম বিশ্বের সত্যিকার ঐক্যই মানব জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে শান্তির পথের সন্ধান দিতে পারে।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের যে বাস্তব উদ্যোগ শহীদ বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ গ্রহণ করেছিলেন তারই ফলে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের রীতি চালু হয়। জেদ্দায় অবস্থিত যে ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের উদ্যোগে প্রায় প্রতি বছরই ইসলামী পররাষ্ট্র উজির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাও ঐ মহান প্রচেষ্টারই ফসল। হারামাইন শরীফাইনের খাদেম হিসেবে বাদশাহ ফয়সালের এ জাতীয় উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই গোটা বিশ্বের মুসলিম জনগণের মধ্যে অপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

মুসলিম উম্মার প্রকৃত ঐক্যের ভিত্তিই হলো আল্লাহ পাক ও তার শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে কালেমা তাইয়েবা কবুল করে আমরা মুসলিম হিসেবে পরিচিত হই সে পবিত্র কালেমার মাধ্যমেই দুনিয়ার সব মুসলিম এক গভীর আত্মিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। আল্লাহ পাকের দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্যই সে ঐক্যের বাস্তবভিত্তি।

মক্কা মুকাররামায় স্থাপিত আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ এবং মদীনা তাইয়েবায় অবস্থিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাজার শরীফ আল্লাহ ও রাসূলের এমন স্পষ্ট নিদর্শন যে এ দুটোর কোন বিকল্প কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যে দেশে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ আছে সে দেশের নেতৃত্বই মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সহজ ও সম্ভব।

প্রত্যেক আদর্শেরই একটা কিবলা থাকে। যারা সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী তাদের কিবলা মস্কো বা পিকিং। যারা ধর্মনিরপেক্ষবাদী তাদের কিবলা ওয়াশিংটন বা লন্ডন। ইসলামের অনুসারীদের কিবলা চিরদিনই মক্কা। এবারের শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন হচ্ছে সে মহান কিবলার পাশে। মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে এমন সংকটের

www.bjilibrary.com

সম্মুখীন যে কা'বা ভিত্তিক ঐক্য ব্যতীত এ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে এবারকার শীর্ষ সম্মেলন কাবা শরীফের ছায়াতলে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ পাক মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণকে সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন।

হারামাইন শরীফাইনের খাদেম হিসেবে সৌদী আরবের রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ ব্যাপারে সৌদী আরবের পক্ষ থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক সৌদী আরবকে সম্ভবতঃ এ কারণেই প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতাও দান করেছেন। শহীদ বাদশাহ ফয়সাল মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের যে ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন সে ঐক্যের মজবুতী তার সুযোগ্য ভাই বাদশাহ খালেদ ও যুবরাজ ফাহদের ঐকান্তিকতা, দূরদৃষ্টি ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল।

বিশ্বে আজ মুসলিমের সংখ্যা প্রায় একশ' কোটি। ৪৬টি রাষ্ট্রে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কয়েকটি মুসলিম দেশ ছাড়া প্রায় সবকটিই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল। কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র আল্লাহর ফজলে দুনিয়ার বড় বড় ধনী দেশের সমতুল্য। ভৌগোলিক দিক দিয়েও মুসলিম দেশগুলো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। জনশক্তি ও অর্থশক্তির দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব এমন শক্তির অধিকারী যে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সত্যিকার ঐক্য স্থাপিত হলে বর্তমান বিবদমান বিশ্বে আল কোরআনে উল্লেখিত মধ্যবর্তী উম্মতে'র ঐ মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

মুসলিম বিশ্বে প্রকৃত ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হলে মানব জাতির উপর বর্তমানে যে দুটো পরাশক্তি মোড়লী করে বেড়াচ্ছে তাদের নেতৃত্ব অবশ্যই বিপন্ন হবে। এ কথা উপলব্ধি করেই তারা অগণিত পন্থায় হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে কোন অবস্থায়ই মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। বিশ্বের গত অর্ধ শতাব্দীর ঘটনাবলী একথা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করে যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপারে একটি নীতিতে আমেরিকা ও রাশিয়া সম্পূর্ণ একমত। উভয়ই একথা ভালভাবে জানে যে, তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে হলে মুসলিম দুনিয়াকে বিভক্ত করে রাখতেই হবে। তারা উভয়ে মিলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাদের এ নীতিকে অগ্রাহ্য করে চলতে না পারে।

একটি জ্বলন্ত উদাহরণই আমার এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মদান থেকে আরম্ভ করে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত ঘটনাবলীই একথার উজ্জল সাক্ষ্য বহন করে। এ কথা কারো অজানা নয় যে, আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন একজোট হয়ে ফিলিস্তিনের মুসলিম অধিবাসীদেরকে বিতাড়িত করে ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করেছে। যে রাশিয়া আজ ফিলিস্তিন মুক্তিযুদ্ধের সহায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে সেই সর্বপ্রথম ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আমেরিকা গোটা মুলিম দুনিয়ার বন্ধুত্ব হারালেও ইসরাইলকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে সবকিছুই করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। অপরদিকে রাশিয়া ফিলিস্তিনী মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক সেজেও ইসরাইলকে বাঁচিয়ে রাখতে

www.bjilibrary.com

আগ্রহী। ১৯৭৩ সালে মিসর ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মিসরের অধিকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করা পর্যন্ত রাশিয়া মিসরকে অস্ত্র দিয়েছে। কিন্তু যখন মিসর আরও অগ্রসর হতে চাইল তখনই রাশিয়া মিসরের নিশ্চিত বিজয়কে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র দেয়া বন্ধ করে দিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মিসর রাশিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসরাইলের মুরুব্বীর নিকটই ধর্না দিতে বাধ্য হলো।

রাশিয়া একথা ভালভাবেই জানে যে, আমেরিকা ইসরাইলকে এতটা মজবুত সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ জিহাদ ব্যতীত বায়তুল মাকদীসকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। ফিলিস্তিন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাশিয়া যে অস্ত্র দিচ্ছে তা দ্বারা ইসরাইলকে খতম করা কিছুতেই সম্ভব হবে না বলে নিশ্চিত হয়েই রাশিয়া শুধু মুসলিম বিশ্বের কিছুটা সমর্থন লাভের আশায়ই এটুকু করছে। ফিলিস্তিনীদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন করে না এমন কোন মুসলিম আছে বলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। ইসরাইলের পক্ষে সামান্য সমর্থন থাকাও কোন মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়। ফিলিস্তিনীদের স্বাধীন রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার হলেই যে মুসলমানদের পরম পবিত্র মাসজিদুল আকসার পুনরুদ্ধার বাস্তবে সম্ভব হবে সে কথা কে না জানে? তবুও গোটা মুসলিম দুনিয়ার শক্তি কি কারণে মাসজিদুল আকসাকে ইয়াহুদী মুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না? অথচ এ ঐক্য ছাড়া ইসরাইলকে পরাস্ত করার কোন উপায়ও নেই।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সত্যিকার সাফল্য এ ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে। এ ঐক্যের মূল ভিত্তিই হলো ইসলাম। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রই হলো মক্কা শরীফ। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ যদি কাবা শরীফের "রাব"কে একমাত্র আশ্রয় মনে করেন তাহলে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে জোট নিরপেক্ষ ইসলামী বলকে পরিণত হতে পারেন। তাহলেই তারা দু' পরাশক্তির যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক গোটা মুসলিম দুনিয়ায় এমন অপূর্ব প্রেরণা সৃষ্টি করবে যে মুসলিম উম্মার বড় বড় সব সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হয়ে আসবে।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জনশক্তি ও অর্থশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে একমাত্র অস্ত্রের প্রয়োজনে আমেরিকা বা রাশিয়ার কাছে ধর্না দিতে হচ্ছে। মুসলিমদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করে তারা একদিকে আরও সম্পদশালী হচ্ছে, অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোকেই একে অপরের বিরুদ্ধে তারা লেলিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার উদ্দেশ্য হলো মুসলিম বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন রেখে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা। মুসলিম বিশ্বের বুকের উপর আমেরিকা ইসরাইলকে এক জগদ্দল পাথরের মতোই চাপিয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। তবুও রাশিয়ার খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কতক মুসলিম রাষ্ট্র আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে বাধ্য হচ্ছে। অপরদিকে আফগানিস্তানের মতো একটা মুসলিম দেশ রুশ সেনাবাহিনীর দখলে থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে

www.bjilibrary.com

সত্যিকার মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। এ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবে মুসলিম বিশ্বকে গড়ে তুলতে হলে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাব থেকে মুক্তি পেতেই হবে। এ মহান লক্ষ্যবিন্দু অর্জন করার প্রচেষ্টা ব্যতীত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন কখনও সফল হতে পারে না।

এত বড় উদ্দেশ্য হাসিল করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন । আমেরিকা, রাশিয়ার পরওয়া না করে শহীদ বাদশাহ ফয়সাল ১৯৭৩ সালের রমজান মাসে যুদ্ধে মিসরকে বিপুল সাহায্য দিয়ে মুসরিম বিশ্বের মহান নেতার মর্যাদা তিনি পেয়েছিলেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রুশ-মার্কিন প্রভাব থেকে মুক্ত আন্তর্জাতিক মুসলিম শক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলেই তাকে শহীদ করা হলো। আজ যদি বাদশাহ খালেদ ও যুবরাজ ফাহদ সে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তা হলে এ শীর্ষ সম্মেলন ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে সক্ষম হতে পারে।

আল্লাহ পাক মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণকে তৌফিক দিন যাতে এ শীর্ষ সম্মেলনে এমন ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হয় যার ফলে ইরাক-ইরান যুদ্ধের অবসান হয়, আফগানিস্তান থেকে রুশ সেনাবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়, মুসলিম দেশের পারস্পরিক বিরোধ দূর করার যোগ্য আন্তর্জাতিক আদালত কায়েম হয় এবং মাসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য বাস্তব কর্মসূচী গৃহীত হয়। বিশ্বের একশ' কোটি মুসলিম এ সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্যের জন্য মনে প্রাণে দোয়া করছে।

www.bjilibrary.com

ছাত্র সমাজ ও ইসলামী আন্দোলন

ছাত্র সমাজের গুরুত্ব ঃ

একথা সবাই জানে যে, আজকে যারা ছাত্র তারাই আগামী দিনে দেশের নায়ক। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের শূন্যস্থান আগামীতে এ ছাত্ররাই পূরণ করবে। সরকারী ও বেসরকারী সকল দায়িত্বে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় কর্মক্ষেত্রে, শিল্পে ও বাণিজ্যে, আইন রচনা ও শাসন পরিচালনায়, বিচারক ও আইনজ্ঞের ভূমিকায়, জনসাধারণকে নেতৃত্বদানে এবং সর্বোপরি প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতির শিক্ষকের মহান দায়িত্বে যত যোগ্য লোকের প্রয়োজন তা ছাত্র সমাজ থেকেই গড়ে উঠে। তাই ছাত্ররাই জাতির প্রকৃত ভবিষ্যত। তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলবার সুব্যবস্থা না হলে জাতীয় উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে জনসাধারণ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদেরকে নেতৃত্ব দেয় ঐসব লোক যারা ছাত্র জীবনে শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করে। গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। ছাত্র জীবনে যে ধরনের চরিত্র সৃষ্টির ব্যবস্থা হয় কর্মজীবনে তাই জাতির ভাগ্যে জুটে। ছাত্রকালে যদি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের সুযোগ না হয় তাহলে পরবর্তী জীবনে চরিত্রবান নাগরিকের দায়িত্ব পালন অসম্ভব। যে সব মৌলিক মানবীয় গুণ সর্বকালে ও সর্বদেশে মনুষত্ব্যের মাপকাঠি বলে স্বীকৃত সেসব গুণাবলী দ্বারা যদি ছাত্রসমাজকে সুসজ্জিত করা না হয় তা'হলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের বুনিয়াদী সমস্যা ঃ

বাংলাদেশ আজ যেসব বড় বড় সমস্যায় জর্জরিত এর বুনিয়াদী কারণ অনেক হলেও প্রধান কারণ দুর্নীতি, অসততা ও চরিত্রহীনতা। এরই ফলে যাকে জনগণের খেদমতের জন্য বেতন দিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে সে-ই যোগ্য শোষকে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি রোধ করার প্রতিটি নতুন বিধান আইন প্রয়োগকারী অসৎ ব্যক্তিকে আরও বড় শোষক ও জালেম বানায়। আজ এ কথা কে না জানে যে প্রায় সর্বত্রই বেতনধারী ছোট বড় দায়িত্বশীলরা তাদের বেতনের অংকটাকে পকেট খরচের চেয়েও কম মনে করে এবং তাদের আয়টুকু জনগণের রক্ত শোষণ করেই অর্জন করে থাকে। এ অবস্থায় সরকারের কোন সিদ্ধান্তই সত্যিকারভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। আন্তরিকভাবে জনগণের কল্যাণ কামনা করেও যদি কোন সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তবু তা অসৎ কর্মচারীদের দরুন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

www.bjilibrary.com

সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, নীতিবোধ, জনসেবার মনোবৃত্তি, দেশপ্রেম ও জাতীয় স্বার্থবোধ ইত্যাদি এমন সব মৌলিক গুণ যা না থাকলে জাতীয় উন্নতি তো দূরের কথা কোন দেশে সর্বনিম্ন নিরাপত্তাবোধ ও শান্তিটুকু পর্যন্ত থাকতে পারে না। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বর্তমান ছাত্র-সমাজকে নিজেদের ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করা কর্তব্য। আজ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদেরই কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-সমাজের নিকট অসহায়। ছাত্ররা আজ এমন স্বাধীন যে দেশের আইনও ছাত্রদের মরজীর বিরুদ্ধে তাদের উপর প্রয়োগ করা যায় না। এমতাবস্থায় তাদের ভবিষ্যৎ তাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে। যদি এ পরিস্থিতিই দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে দেশ চরম অরাজকতার শিকার হতে বাধ্য।

ছাত্র সমাজ কি মনে করে যে ন্যায়নীতি, সুবিচার, নিয়মশৃঙ্খলা, সততা ইত্যাদি বুনিয়াদী গুণাবলী তাদের মধ্যে চালু আছে? মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা করার সুযোগ কি শিক্ষা-অঙ্গনে বহাল আছে? শক্তি প্রয়োগ করে সহপাঠিদেরকে দমন করে রাখার প্রবণতা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেও প্রচলিত থাকে তাহলে এ দেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার।

সচেতন ছাত্র মহলকে এ পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিৎ। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যদি উন্নত চরিত্রের লোক তৈরী করার কোন বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা না চলে তাহলে এ জাতির কোন উন্নতির আশা নেই। যত উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনাই তৈরী হোক, বিদেশী সাহায্য ও ঋণের টাকায় যত কিছুই দেশে গড়ার চেষ্টা করা হোক, মৌলিক মানবিক গুণ-সম্পন্ন ও উন্নত নৈতিক মানের শিক্ষিত সমাজ ব্যতীত জাতীয় উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নেই।

সমাধানের পথ কি?

এখন প্রশ্ন হলো যে, এ ধরনের লোক ছাত্রসমাজ থেকে পেতে হলে কাদের উদ্যোগে এমন সংশোধনী প্রচেষ্টা চলতে পারে, যার ফলে জাতি অদূর ভবিষ্যতে উন্নত চরিত্রের নেতৃত্ব পেতে আশা করবে? যারা বর্তমানে দেশ শাসন করছেন তাদের কি এমন কোন কর্মসূচী আছে? কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যাদের দ্বারা পরিচালিত তারা কি এমন কোন পরিকল্পনা পেশ করবেন বলে আশা করা যায়?

আমার সুচিন্তিত অভিমত এ বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে পেশ করতে চাই। ছাত্র-সমাজকে বর্তমানে অরাজক পরিবেশ থেকে মুক্ত করা, তাদের নৈতিক মান উন্নত করা, তাদেরকে মৌলিক মানবিক গুণে ভূষিত করা, তাদের মধ্য থেকে গায়ের জোরে স্বেচ্ছাচারিতা করার প্রবণতা দূর করা এবং তাদের গোটা জাতির নেতৃত্বের জন্য আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। ছাত্র সমাজের বাইরেও এমন কোন শক্তি বা সংস্থা নেই যার প্রভাবে এ মহান উদ্দেশ্য সহজে সফল হতে পারে। তাই ঐসব ছাত্রই একমাত্র ভরসা যারা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ছাত্র মহলেও চরিত্র গঠনের গুরুত্ব অনুভব করে। এ

www.bjilibrary.com

ধরনের ছাত্ররাই স্বাভাবিকভাবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করে এবং শিবিরের কর্মসূচী অনুযায়ী নিজেদেরকে এবং তাদের সাথীদেরকে গড়ে তুলবার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার কোথাও চরিত্র গঠনমূলক কোন প্রচেষ্টা নেই। বাইরে থেকেও ছাত্র সমাজকে গড়ে তুলবার কোন উপায় নেই। তাই ছাত্র মহলে ছাত্রদের পক্ষেই এ মহান গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব। ছাত্র শিবিরের এ সংগ্রামই জাতির একমাত্র ভরসা। ছাত্র সমাজের মধ্যে ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরিচালিত এ চরিত্র গঠনমূলক আন্দোলনের ফলেই জাতি উন্নতমানের নাগরিক পেতে পারে। তাই ছাত্র শিবিরের দায়িত্ব এত বিরাট যে, যদি শিবিরের নেতা ও কর্মীগণ এ মহান দায়িত্বানুভূতি নিয়ে ব্যাপক কর্মতৎপরতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে তা'হলেই অনিবার্য ধ্বংস থেকে এ জাতি বেঁচে যেতে পারে।

ইসলামী ছাত্র শিবির যে এ ব্যাপারে বিরাট সম্ভাবনার ধারক সে কথা ভিন্নপন্থী ছাত্র সংস্থাগুলো উপলব্ধি করে বলেই শিবিরের প্রতি তারা এতটা মারমুখো। যারা ছাত্র শিবিরকে তাদের মত ও পথের অন্তরায় মনে করে তাদের প্রতি শিবিরের কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করা স্বাভাবিক নয়। বিশ্বনবীর যে মহান আদর্শ শিবিরের আসল মূলধন সে আদর্শের দাবীতেই শিবিরকে এ ধরনের নির্যাতনের মধ্যেও ধৈর্যের সাথে বিরোধী ছাত্রদেরকে চরিত্র বলে আকৃষ্ট করতে হবে। অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে এর মোকাবেলা করা অসম্ভব।

ছাত্র মহলে ইসলামী আন্দোলন ঃ

গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের কোন স্থান নেই। স্কুলে এক পর্যায় পর্যন্ত সামান্য দীনিয়াত শিক্ষা দ্বারা ইসলামকে একটা ধর্ম হিসাবে কিছু শেখান হয় বটে, কিন্তু মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে যে পথ দেখিয়েছে, সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণাটুকুও তাতে পাওয়া যায় না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ইসলাম বলতে গেলে অনুপস্থিত। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ প্রায় কলেজেই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে যদিও বিভাগ রাখা হয়েছে তবুও এ বিভাগের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের সামান্য সম্পর্কই আছে। এ বিভাগটি দ্বারা মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হাসিল হওয়া ছাড়া আর কোন বড় উদ্দেশ্য পূরণের ব্যবস্থা নেই। ইসলামকে মানব জাতির একমাত্র ভারসাম্য পূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসাবে ছাত্র সমাজের কাছে পরিবেশন করা হয়নি বলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ছাত্র সমাজ ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো ব্যক্তি জীবনের সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটা ধর্ম মনে করে।

সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে যারা ধর্মনিরপেক্ষবাদকে আধুনিক প্রগতির লক্ষণ মনে করে তারা ইসলাম নিয়ে মাথা ঘামান প্রয়োজন মনে করে না। আর যারা সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে প্রভাবান্বিত তারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে তাদের পথের অন্তরায় মনে করে। এবং ইসলামী আন্দোলনের দরুন তারা তাদের মতবাদের জন্য ইসলামকে সবচেয়ে বড়

www.bjilibrary.com

প্রতিপক্ষ হিসাবেই দেখে। এ উভয় ধরনের ভুল ধারণা পোষণকারীদেরকে অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। ছাত্র সমাজে যারা সক্রিয় তারা ধর্মনিরপেক্ষবাদী হোক বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হোক তাদের গুরুত্ব অন্তরে গভীরভাবে অনুভব করতে হবে। যারা নীরবদর্শক, তারা জাতির আসল সম্পদ নয়। যারা আন্দোলনমুখী তারাই নেতৃত্বের সম্ভাবনাময়। কর্মমুখর এ তরুণ দল কোন বিশেষ মতবাদে প্রভাবান্বিত হলেও তাদেরকে চিন্তার ক্ষেত্রে পরিপক্ক মনে করা ঠিক নয়। মৌলিক মানবীয় গুণসম্পন্ন বলিষ্ঠ চরিত্রবান ইসলামী ছাত্র কর্মীদেরকে ঐসব সম্ভাবনাময় ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে। তাদের সাথে কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তাদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাদেরকে দেশের ভবিষ্যৎ নেতা জেনে তাদের সাথে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের মনোরাজ্যের খবর নিতে হবে। চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের কোথায় কি ধরনের গলদ তা গবেষণা করতে হবে। মুসলমানের সন্তান হিসাবে ইসলাম ও ঈমানের স্ফুলিঙ্গ তাদের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। মুসলিম সমাজের ছেলে হিসাবে তার চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

এ কাজ দেশের আলেমগণের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের পক্ষেও এ কাজ করা অসম্ভব। এ কাজ একমাত্র তারাই করতে পারে যারা তাদের সহপাঠী, যারা তাদের সাথে একই ছাত্রাবাসে বসবাস করে ও একই সাথে খায়, যারা তাদের খেলার সাথী ও গল্পের বন্ধু অথচ ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র-কর্মী। তাই একমাত্র ইসলামী ছাত্র-শিবিরের কর্মীদেরই এ মহান কাজের মহা সুযোগ ও পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের উপরই এদেশে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভরশীল।

এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন। ঐ ধরনের এক একটি ছেলের পেছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতে পারে। তার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে রীতিমত সাধনা করা দরকার হতে পারে। ঠাট্টা-বিদ্রূপ, দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্যকে উপেক্ষা করে তার নিকট আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের মহান দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত পেছনে লেগেই থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ভাল ছাত্রদেরকেই বিশেষভাবে টারগেট বানাতে হবে। প্রতিভাশালী একটি ছাত্রকে শত শত সাধারণ ছাত্রের চেয়ে মূল্যবান মনে করে তার পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হবে। তাকে কোন্ কথা কি ভাবে বলতে হবে, কোন্ বই পড়াতে হবে, তার মনের প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিতে হবে ইত্যাদি রীতিমতো চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করতে হবে। দরকার হলে তার মনের খোরাক পরিবেশনের জন্য কোন জ্ঞানীব্যক্তির সাথে পরিচয় করাতে হবে।

বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন ও ছাত্রসমাজ ঃ

আমাদের দেশে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্রদের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন। রাজনৈতিক ইস্যুতে ছাত্রদেরকে অনেক সময় এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায় যা তাদের

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক মুরব্বিরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল বহু দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্ররা দিয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর যোগ্য নেতৃত্বের বা বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাবে ছাত্রসমাজ যেখানেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে সেখানেই স্বাভাবিকভাবে ভাবপ্রবণতা, চাপল্য ও চিন্তার অপরিপক্কতার ফলে বড় বড় নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের ছাত্রসমাজের এটা কোন দোষ নয়। বরং তাদের উপর বৃহত্তর সমাজের পক্ষ থেকে এটা বড় এক ধরনের জুলুম। দেশের দাবী পূরণের জন্য যোগ্য, ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতির পক্ষ থেকে দেবার যাদের দায়িত্ব তারা সে কর্তব্যে অবহেলা করলে ছাত্রসমাজ ময়দানে নেমে আসতে বাধ্য হয়। ছাত্রসমাজ যদি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব না পায় তাহলে তারা কিভাবে সে নেতৃত্বকে মেনে জাতির খেদমতে নিজেদেরকে নিয়োগ করবে? তাই ছাত্ররা রাজনৈতিক ময়দানে নেতৃত্ব দিতে এসে সমস্যার সৃষ্টি করে।

এ ব্যাপারে ছাত্রশিবিরই একমাত্র ব্যতিক্রম। তারা কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় নয়। রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করা বা রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তাদের নয়। তারা যে মহান আদর্শে ছাত্রসমাজকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে, সে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য যত দল ময়দানে কাজ করছে তাদের নিকট ছাত্রশিবির প্রয়োজনবোধে অবশ্য রাজনৈতিক বিষয়েও সুচিন্তিত মতামত দিতে পারে। কিন্তু ছাত্রশিবিরের মূল কর্মসূচী অন্যদের মতো রাজনীতি প্রধান নয়।

শিবিরের ছাত্রদেরকে একাধারে কয়েক ধরনের কাজ করতে হয়। ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য নিয়মিত ক্লাস করা ও লেখাপড়া করা তাদের প্রথম কর্তব্য। ভাল ছাত্র হবার চেষ্টা করা তাদের আন্দোলনেরই অঙ্গ। কিন্তু শুধু পাঠ্যবই-এর মধ্যে ডুবে থাকাও তাদের কাজ নয়। ছাত্ররা আজেবাজে কাজে, গল্পে ও খেলায় অযথা যে সময় নষ্ট করে, শিবিরের ছাত্রদেরকে সে সময়টাই শিবিরের দেয়া প্রোগ্রামে ব্যয় করে নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হতে হয়। শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই তাদের চলে না। সহপাঠীদেরকে ইসলামী আন্দোলনে টানবার চেষ্টা ছাড়া নিজেদেরকে গড়ে তোলা যায় না বলে তাদেরকে অন্যান্য ছাত্রের পেছনে যথেষ্ট সময় দিতে হয়।

ডিগ্রি লাভের সাথে সাথে ছাত্রজীবনে ইসলামী আন্দোলনের পবিত্র দায়িত্ব তাদেরকে পালন করতে হবে। সে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের করণীয় সম্পর্কেও তাদেরকে সুস্পষ্ট মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। পেশা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথে কর্মজীবনে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্তও নিতে হবে। ছাত্রজীবনে শিবিরে সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্মজীবনে নিষ্ক্রিয় হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। ছাত্রজীবনের অবসান হওয়ার সাথে সাথেই যার উপর বৃদ্ধ বা গরীব পিতা-মাতা ও ছোট ভাইবোনের দায়িত্ব চাপে তার পক্ষে সক্রিয় থাকা অবশ্যই কঠিন। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের দায়িত্ব বুঝবার পর আর কোন দায়িত্বই এর উপর প্রাধান্য পেতে

www.bjilibrary.com

পারে না। পিতা-মাতা ও ভাইবোনের প্রতি কর্তব্য ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করলে অন্য কর্তব্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করা হচ্ছে সে কথা প্রমাণ হয় না। কেউ কেউ জীবনে আগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার খেয়ালে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এটা ইবলিসের কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এ খেয়ালের ধোঁকায় পড়ে তারা দুনিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চক্করে এত দূরে চলে যায় যে, আর ফিরবার উপায় থাকে না। দুনিয়ার উন্নতি ও আখেরাতের মুক্তি যে মহান মালিকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দ্বীনের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করে সে মনিবকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যারা ছাত্রশিবিরের নিষ্ঠাবান কর্মী তাদেরকে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ছাত্রজীবনের শেষে কোন্ পেশা অবলম্বন করলে কর্মজীবনে ইসলামী আন্দোলনের বেশী খেদমত হবে সে এ বিষয়ে ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনুচিত। শিবিরের দায়িত্বশীলদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন। পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্তে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন। পেশা হিসাবে অধ্যাপনা ও শিক্ষকতা হলো ইসলামী আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। দেশের ভবিষ্যত নাগরিক গড়ার কারখানাই হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আন্দোলনের স্বার্থে কার কোন্ পেশা অবলম্বন করা দরকার, তা সব দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিভাগকে প্রাধান্য দিতেই হবে।

আন্দোলনের স্বার্থে আরও একটা কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। সংগঠনকে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করা এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। চেষ্টা-সাধনা করে জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়, চরিত্রে উন্নত হওয়া সম্ভব এবং অন্যান্য অনেক গুণ হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু ভাল বক্তা, সাহসী নেতা ও নিঃস্বার্থ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সংগঠনের টেকনিক ভাল করে বুঝতে পারে না। মনে হয়, সাংগঠনিক যোগ্যতা অনেকটা সহজাত। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ছোট ছোট একদল ছেলে কোথাও খেলছে। এর মধ্যে একজন বাকী সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে। সবাই তার হুকুম পালন করছে। সে সংগঠিত করছে—অন্যরা তার কমান্ড মেনে যাচ্ছে। এ সংগঠক ছেলেটি সেখানে তার সাথীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। তার সহজাত সাংগঠনিক যোগ্যতা তাকে কমান্ডার বানিয়ে দিয়েছে। তাই ছাত্রশিবিরে যাদেরকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে যোগ্য মনে হয় তাদের মধ্যে এ মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে যে আল্লাহ পাক তাদেরকে এ ব্যাপারে যে যোগ্যতা দান করেছেন, কর্মজীবনে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনে তাদের সে প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে। যোগ্য সংগঠকদের এমন ধরনের কোন পেশায় নিয়োজিত হওয়া উচিত নয় যে পেশা সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেয় না। যেমন সরকারী চাকুরী।

ছাত্র শিবিরের আন্দোলন ঃ

ইসলামী ছাত্র-শিবির যে আন্দোলন চালাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ঈমান, ইলম ও আমলের এক অভিযান। সহপাঠীদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেবার মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

সত্যিকারভাবে নিজের ঈমানকেই মজবুত করার প্রচেষ্টা চলে। দ্বীনের দাওয়াত দেবার ফলেই কর্মীদেরকে ইসলামের জ্ঞান চর্চা করতে বাধ্য হতে হয়। ইসলাম সম্পর্কে অগণিত প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার ফলে তাদেরকে ঐসব প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর শিখতে হয়। শুধু বই পড়েই সব উত্তর পাওয়া যায় না বলে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহায্যও নিতে হয়। এভাবেই শিবিরের কর্মীদেরকে ইসলামী জ্ঞানাভিযান চালাতে হয়। ইসলামের এ অভিযান চালাবার সাথে সাথে তাদের ব্যক্তি চরিত্রে ইসলামের নির্দেশে এমন পরিবর্তন আনয়ন করতে হয় যা অন্যদের চোখে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। তাদের কথাবার্তা, চাল্-চলন, আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবনে ক্রমে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা অন্যান্য ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ চারিত্রিক পরিবর্তন যদি ইসলামের সত্যিকার পরিচয় বহন করে তাহলে এর প্রভাব অন্যদের মধ্যে পড়তে বাধ্য।

ঈমান, ইলম ও আমলের এ সাধনা কর্মীদের মধ্যে যেটুকু বাহ্যিক পরিবর্তন আনয়ন করে তার চেয়ে বেশী মৌলিক মানবিক গুণ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। মানুষ যত খারাপই হোক মৌলিক মানবীয় গুণের প্রতি শ্রদ্ধা করতে সে বাধ্য। তার বিবেক মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ দুনিয়ার স্বার্থে প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্নত চরিত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যত কিছুই করুক অন্তরে তাদেরকে ভালোভাবে স্বীকার না করে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এ ভাবেই মানুষের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। এ নৈতিক প্রাধান্যই আন্দোলনের প্রকৃত মূলধন। ছাত্রসমাজে এ পুঁজির প্রসার যে পরিমাণ বাড়বে দেশের ভবিষ্যত সে পরিমাণেই উজ্জ্বল হবে।

[ইমলামী ছাত্র শিবিরের স্মরণিকায় প্রকাশিত]

www.bjilibrary.com

ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লার কর্মীসম্মেলন উপলক্ষে

[ইসলামী ছাত্রশিবির এর কুমিল্লা জেলা ও শহর শাখার "কর্মী সম্মেলন '৯০' উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার পাঠকদের জন্য কিছু কথা পেশ করার সুযোগ পেলাম।]

সর্বপ্রথম আমি এ সম্মেলনের পূর্ণাংগ সাফল্য কামনা করি। এ জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে একদিকে উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে চিন্তা ও মননশীলতা বিকাশ লাভ করে। ছাত্রদেরকে পরবর্তীকালে দেশ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। সে বিষয়ে সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক আয়োজনের মাধ্যমে তাদের বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

সম্মেলন সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ পরিচিতির মহা সুযোগ এনে দেয়। এর মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন গুণাবলী সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। সর্বোপরি সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সব কারণেই সকল সংগঠনেই সম্মেলনের গুরুত্ব স্বীকৃত।

এ উপলক্ষে ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে একজন সচেতন মুসলিমের কেমন মনোভাব পোষণ করা উচিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা আমার ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করছি।

প্রথমতঃ সন্তানের পিতামাতা হিসাবে প্রত্যেক সচেতন মুসলিম নিজের সন্তানকে সত্যিকার মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী না হয়ে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তানকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠালেও চলে না। অথচ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এতটা নিম্নমানের যে এ শিক্ষার মাধ্যমে খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠা তো দূরের কথা, সাধারণ মানের মানুষ হওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণেই সচেতন মুসলিম পিতামাতা সন্তান-দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

এ ধরনের পিতামাতার জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরই একমাত্র আশা ভরসার স্থল। এক সময় আমি নিজেই সন্তান দায়গ্রস্ত অবস্থা বোধ করছিলাম। আমার বড় ছেলেটি তখন কলেজে ভর্তি হয়েছে; কলেজের ছেলেদের চালচলন দেখে আমার ছেলে সম্পর্কে রীতিমতো পেরেশান হয়ে গেলাম। ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা একটি ছাত্র সংগঠনের আছে জেনে আশ্বস্ত হলাম। ছেলেকে ঐ সংগঠনভুক্ত করার পর কিছু দিনের মধ্যেই এর সুফল দেখে একটা বিরাট সংকট দূর হলো বলে স্বস্তি বোধ করলাম। এভাবেই সন্তানদায়গ্রস্ত অবস্থা থেকে দায়মুক্ত হলাম। তাই আমি

www.bjilibrary.com

প্রত্যেক সচেতন মুসলিম পিতামাতার প্রতি আকুল আহবান জানাই যে, যদি সন্তানদেরকে শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে সত্যিকার মুসলিম হিসাবে দুনিয়ায় রেখে যেতে চান তাহলে ইসলামী ছাত্রশিবিরে যাতে তারা সক্রিয় হয় সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয়তঃ যারা ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান বলে স্বীকার করেন তারা সংগত কারণেই চান যে দেশে আল্লাহর আইন জারী হোক। কিন্তু সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন ছাড়া আল্লাহর আইন জারী হতে পারে না। আর দেশ শাসনের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষিত হওয়াও জরুরী। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সৎ লোক মোটেই তৈরী হচ্ছে না। এ অবস্থায় যারা আল্লাহর আইন জারী হওয়ার কামনা পোষণ করেন তারা শিক্ষিত সৎ লোক কোথায় পাবেন? এ ব্যাপারেও ইসলামী ছাত্রশিবিরই একমাত্র ভরসার স্থল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী নেবার সাথে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ লোক একমাত্র এ সংগঠনের মাধ্যমেই তৈরী হচ্ছে। তাই আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন যারা চান তারা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ছাত্রশিবিরের আন্তরিক শুভাকাঙক্ষী ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেন।

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। আশা করা গিয়েছিল যে, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে দেশ শাসনের দায়িত্ব পেলেন তারা জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই চালু রাখবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও শাসকগণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে থাকলেন। ফলে ক্রমেই তারা জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা আমলাদারকে এমনভাবে ব্যবহার করতে থাকলেন যে, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বুঝতে পারলেন, শাসকদল জনগণের সমর্থনের চেয়ে তাদের সাহায্যেই গদীতে বহাল থাকতে ন। তখন তারা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্‌কান্দার মির্জার সাথে যোগসাজশে সেনাপতি আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দেন। জনগণ নিজেদেরই বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে বন্দী হয়ে ইংরেজ আমলের চেয়েও কঠোর রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

১৯৬০ সাল থেকে নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কঠিনতর সংগ্রামে পরিণত হলো। দীর্ঘ ৯ বছর আন্দোলনের পর ১৯৬৯ সালে যে গোলটেবিল বৈঠক হয়, তা যদি সফল হতো, তাহলে গণতন্ত্র হয়তো বহাল হতো।

কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে দলটি নিরংকুশ বিজয় লাভ করলো, তাদের হাতে ১৯৭২ সালে ক্ষমতা আসার পরও গণতন্ত্র কেন টিকে থাকলো না, সে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে বড় হয়েই দেখা দেবার কথা।

দু'টো বিষয়ের বিশ্লেষণ

আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আবার আমরা ১৯৬০ সালে ফিরে যেতে বাধ্য হলাম। তাই এ মুহূর্তে আমাদেরকে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করতে হবে যে, দু'-দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করেও গণতন্ত্রের পথে আমরা সামান্য অগ্রগতিও কেন লাভ করতে পারলাম না। এ প্রসঙ্গে দু'টো বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। প্রথমতঃ আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব যে, স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ কেন হলো না। দ্বিতীয়তঃ আমরা হিসেব নিয়ে দেখব যে, গণতন্ত্রের পথে আমাদের দেশে কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। রোগের কারণ না জানলে সঠিক চিকিৎসা হতেই পারে না। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন

www.bjilibrary.com

করে যদি কোন প্রকারে একটি নির্বাচিত সরকার কায়েম করতে সক্ষমও হই , তবু আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বহাল রাখতে পারব না, যদি ওসব দোষ-ত্রুটি ও প্রতিবন্ধকতা রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলোর মধ্যে থেকে যায়। গণতন্ত্রের পরিপন্থী বিষয়গুলো যদি আমাদের থেকে দূর করা না যায়, তাহলে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করতে হবে। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়েই উপরোক্ত দু'টো বিষয় আলোচনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

আমি আশা করি, সকল রাজনৈতিক মহলই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমার বিশ্লেষণকে বিচার করবেন। গণতন্ত্রের প্রতি যাদের নিষ্ঠা আছে, তারা এ আলোচনার মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণেরও সুযোগ পাবেন। আসুন, আমরা সবাই গণতন্ত্রের স্বার্থে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেন বহাল রইল না?

১৯৭০ সালের নির্বাচনে যে দলটি এককভাবে মহাবিজয় লাভ করে, সে দলটিই বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত একটি দল বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন চালু রাখতে পারল না, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

উদার দৃষ্টিতে এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে না যাওয়ার পেছনে বেশ ক'টি কারণ রয়েছে ঃ

(১)একটি সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এ নতুন রাষ্ট্রটি কায়েম হওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিতে অস্ত্রের প্রভাব ও প্রাধান্য অনেকদিন পর্যন্ত বহাল থেকে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুযোগে এমন বহু সুসংগঠিত গ্রুপ ও উপ-দলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এসে যায়। 'বন্দুকের বুলেট দ্বারা বিপ্লব সাধনের নীতিতে' আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। '৭২ সালে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার কায়েম হওয়া সত্ত্বেও ঐসব অস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করেনি। তাদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য সরকারকেও রক্ষীবাহিনী ব্যবহার করতে হয়েছে। এমনকি বেসামরিক পর্যায়েও সরকার সমর্থক এবং সরকার বিরোধীদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বহু জায়গায় অস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে যেভাবে রাজনৈতিক গোপন হত্যা চলেছে, তাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

(২) গণতন্ত্রের সঠিক পরিবেশের পূর্বশর্ত হলো জাতীয় আদর্শের ব্যবহারে জনগণের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য থাকা। শাসনতন্ত্রে এমনসব মতবাদকে জাতীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছিল, যা দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার বিরোধী ছিল। ফলে গণমনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং সরকার বিরোধী যে কোন আওয়াজই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। সরকারী দলেরই একাংশ নতুন দল সৃষ্টি করে চরম সরকার বিরোধী

www.bjilibrary.com

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা এমন আক্রমণাত্মক ভাষায় সরকারের সমালোচনা করতে থাকে যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে থাকে। কোন কোন সশস্ত্র উপদল এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে যে, গণতান্ত্রিক শাসন স্বাভাবিক গতিতে চলতে ব্যর্থ হয়।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন মারাত্মক রূপ ধারণ করে যে, স্বাধীনতা লাভ করার দু'বছরের মধ্যেই মানুষ চরম দূরবস্থার সম্মুখীন হয়। এ অর্থনৈতিক সংকটের জন্যই ভারতই দায়ী বলে জনগণের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় এবং সরকারকে ভারতপন্থী বলে বিবেচনা করার কারণে সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত বিলীন হয়ে যেতে থাকে। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা তখন ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে গণমনের এ তীব্র বিদ্বেষ সরকারকে চরম বেকায়দায় ফেলে দেয়।

(৪) একশ্রেণীর অতি উৎসাহী ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রীর আচরণ ও কার্যকলাপ এবং সরকারের কতক সিদ্ধান্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে এমন আঘাত হানে যে, দেশের ছোট-বড় ওয়ায়েজগণ জনগণের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে সজাগ রাখার উদ্দেশ্যে যে আবেগময় বক্তব্য রাখেন, তা-ও পরোক্ষভাবে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করতে থাকে।

(৫) উপরোক্ত কারণসমূহ সরকারের জন্য এমন কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় এর মোকাবিলা করা অসম্ভব বলে সরকার মনে করে। শেষ পর্যন্ত সরকারী দল তাদের নেতার জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে পূর্ণ একনায়কত্ব কায়েমের মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তারা এক শাসন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশে গণতন্ত্রের সকল পথই বন্ধ হবার আশংকা দেখা দেয়। এ ব্যবস্থা চালু হবার প্রাক্কালেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের দুর্ঘটনা ঘটে।

(৬) উপরে বর্ণিত কারণসমূহ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয় নেতা এবং ব্যাপক গণসমর্থনপুষ্ট দল জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেও দেশকে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নেবার বদলে একনায়কত্বের ভ্রান্ত পথে কেন পা বাড়ালেন? শেখ মুজিব আজীবন গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি কেন জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন এবং তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কেন তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে এগিয়ে দিতে পারলেন না।

পরলোকগত শেখ মুজিব সাহেবের প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশের ইতিহাসে চিরদিনই উল্লেখযোগ্য হয়েই থাকবেন। তাই এদেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে তাঁর উল্লেখ না হয়েই পারে না। যারা আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ চান এবং যারা সাধ্যমতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করেন, তাদের নিকট আমার আলোচনা নিষ্ঠাপূর্ণ বিবেচিত হবে মনে করেই এ বিষয়ে আমার বিনীত অভিমত প্রকাশ

www.bjilibrary.com

করা কর্তব্য মনে করছি। গণতন্ত্রের স্বার্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা আমি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি।

ক) ইংরেজ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে না দেবার ফলে রাজনৈতিক ময়দানে যারা সক্রিয় ছিলেন, তাদেরকে বাধ্য হয়ে অগণতান্ত্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে বিরোধী রাজনীতি গঠনমূলক কর্মকান্ডের বদলে Agitational Politics এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা গঠনমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। এরই ফলে শেখ মুজিব সরকার বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও দেশ শাসনের জন্য যে ধরনের সুস্থির নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাই দেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি জাতিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হননি।

খ) প্রায় আজীবন রাজনীতির ময়দানে সংগ্রামরত থাকার ফলে এবং বার বার কারাভোগ করার দরুন তাঁর মধ্যে আবেগপ্রবণতা এতটা প্রবল হয়ে পড়েছিল যে, জাতীয় পর্যায়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি আবেগ দ্বারা বেশী পরিচালিত হয়েছেন বলে আমার ধারণা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একসাথে কাজ করা ও মত বিনিময় করার মাধ্যমে আমি তাঁকে যতটুকু বুঝেছি, তাতে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের যতগুলো গুণ দিয়েছিলেন, যদি প্রজ্ঞার সাথে তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন, তাহলে এদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো।

আমার ধারণায়, নেতার মধ্যে প্রজ্ঞার চাইতে আবেগ বেশী থাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। কর্মীদের মধ্যে আবেগই প্রবল থাকা দরকার, যাতে তারা নেতার নির্দেশে জীবন দিতে দ্বিধা না করে। কিন্তু নেতার মধ্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার চেয়ে আবেগ প্রবল হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, আবেগচালিত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভ্রান্তির আশংকা প্রবল।

গ) তাঁর সংগ্রামী জীবনে রাজনৈতিক নেতিবাচক কর্মকান্ডের প্রাধান্য থাকার দরুন তাঁর সংগঠনে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাই দেশ গড়ার লক্ষ্যে আদর্শ, কর্মনীতি ও কর্মসূচীর যে ঐক্য তার সংগঠনে থাকা প্রয়োজন ছিলো, তাঁর অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত যেন অনেকটা অসহায় হয়েই একদলীয় শাসন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ঘ) তাঁর দলে যারা কট্টর সমাজতন্ত্রী ছিলেন, তারা বুঝতে পারলেন যে, গণতান্ত্রিক উপায়ে এদেশে তাদের কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থা চালু করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই তারা বিভিন্নভাবে তাঁর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। অপরদিকে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক

www.bjilibrary.com

দল যেভাবে তার বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছিল, তাতে হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একদলীয় সরকার কায়েম করা হলে তাদের সমর্থনও পাওয়া যাবে।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত গণতন্ত্রের কোন ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। গণতন্ত্রের প্রথম ভিত্তিই হলো গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিচালিত রাজনৈতিক দল। যদি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে দেশে কারা গণতন্ত্র চালু করবে? সরকারী দলই হোক আর বিরোধী দলই হোক, সবাই যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলে, তবেই দেশে গণতন্ত্র চালু থাকতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এ বুনিয়াদটিরই অভাব দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত রাজনৈতিক দলের পরিচয় ও কার্যপদ্ধতি নিম্নরূপ হওয়াই স্বাভাবিকঃ

(১) এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন জাতি বা দেশের সমস্যাবলীর সমাধান বা দেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করলে কিংবা কোন রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হলে রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন।

(২) উদ্যোগীদের প্রথম কাজই হলো তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করে সমমনা লোক তালাশ করা।

(৩) অতঃপর উদ্যোক্তারা তাদের আদর্শ ও চিন্তাধারার সমর্থকদেরকে কোন সম্মেলনে সমবেত করে। সম-মত ও সম-চিন্তার লোকদের সমন্বয়েই তখন সংগঠনের সূচনা হয়।

(৪) সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্তে যারা একমত হয়, তারা সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনা করে।

(৫) অতঃপর সংগঠনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম ঐ সংবিধান অনুযায়ীই চলতে থাকে।

এভাবে গঠিত রাজনৈতিক দল কালক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়ে থাকে। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখলের পর গঠিত হতে পারে না; বরং জনগণের ময়দানে কাজ করার ফলশ্রুতিতেই ক্ষমতাসীন হয়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় বসে, ক্ষমতায় গিয়ে দল গঠন করে না।

একনায়কবাদী রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

(১) ক্ষমতাসীন একনায়ক ক্ষমতার মসনদে বসে যাদেরকে নিয়ে দল গঠন করে, তারা কোন রাজনৈতিক দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে বা দেশের সমস্যা সমাধানের মহান

www.bjilibrary.com

তাগিদে ঐ দলে যোগদান করে না। বরং একনায়কের কৃপাদৃষ্টিতে থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল করাই তাদের উদ্দেশ্য।

(২) গণতান্ত্রিক দল আগে গঠিত হয় এবং দলের মাধ্যমে ক্ষমতা হাসিল করে। আর একনায়ক আগে ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে সুবিধাবাদীদের সমন্বয়ে দল গঠন করে।

(৩) একনায়কের দল হলো তার সেবক। একনায়ক দলের নির্বাচিত নেতা নয়। এ নেতাকে বদলাবার ক্ষমতাও দলের নেই। একনায়কই দলের স্বঘোষিত নেতা। তার ইচ্ছাই দলের একমাত্র কর্মসূচী।

গণতান্ত্রিক দলের নেতা দলের নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত। দলের রীতি ও আদর্শের বিপরীত চললে তার নেতৃত্ব বিপন্ন হয়। নেতাকেও দলের আনুগত্য করতে হয়, দলের প্রাধান্য নেতাকেও মানতে হয়। গণতান্ত্রিক দল দলীয় নেতৃত্বে একনায়কত্ব মানতে রাজী হয় না।

আমাদের দেশে যদি গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা রূপায়িত দেখতে চাই, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দল গঠনের ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। একনায়কের নির্দেশে গঠিত দলকে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াই উচিত নয়।

গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের পথে নিম্নরূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা দূর করা ছাড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে পারে না ঃ

(১) আইয়ুব খানের আমল থেকেই এ কুপ্রথা চলে এসেছে যে, সামরিক একনায়কগণ ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করার অপচেষ্টার মাধ্যমে রাজনীতিতে চরম দুর্নীতি চালু করে। তারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো থেকেই স্বার্থের বিনিময়ে নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে কিনে নেবার চেষ্টা করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিপন্ন হয়।

(২) সামরিক একনায়ক যেসব নেতাকে কিনতে সক্ষম হয় না, সেসব দলের নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে, যাতে কোন দল তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা পালনের যোগ্যতাই না রাখে।

(৩) রাজনৈতিক ময়দানে এভাবেই সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালিপ্সুদের ভীড় বাড়তে থাকে এবং এ জাতীয় লোকেরাই নেতা হবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন দলের সৃষ্টি করে। এ জাতীয় লোকদের কারণেই রাজনীতি করাকে অনেক সুধী, জ্ঞানী ও চরিত্রবান লোক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না এবং তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে আসতে চায় না। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে নৈতিক ও আদর্শিক মান হ্রাস পেতে থাকে।

(৪) আমাদের দেশে ৭০টিরও বেশী রাজনৈতিক দল আছে বলে জানা যায়। এটা মোটেই সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়। গুটিকয়েক লোক মিলে দল গঠনের এ হিড়িকের

www.bjilibrary.com

পেছনে অগণতান্ত্রিক মনোভাবই প্রধানতঃ দায়ী। যেসব মনোবৃত্তির দরুন কথায় কথায় দল সৃষ্টি হচ্ছে, সেসবই গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধক। অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ধরন কয়েক রকমের দেখা যায়ঃ

ক) দলের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যার হাতে থাকে, তার দলীয় সংবিধান, আদর্শ ও নীতি অগ্রাহ্য করে নিজ খেয়াল-খুশী মতো সিদ্ধান্ত নেবার ফলে দল ভেঙে যায়।

খ) দলের সাংগঠনিক পদ্ধতিতে নেতৃবৃন্দের সমালোচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে উপ-দল সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমে দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

গ) দলীয় আদর্শ ও নীতির চেয়ে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা প্রবল হবার ফলে নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি হওয়ার কারণেও এক দল ভেঙে কয়েক দলে পরিণত হয়।

ঘ) দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় অধিকাংশ সদস্যের রায়ের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই গণতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যগণ যদি সংগঠনের সংবিধানের চেয়ে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে অধিকাংশের মতকে মেনে না নেয়, তাহলেও দল ভেঙে যায়।

ঙ) এদেশে এমন উদাহরণও পাওয়া যায় যে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলে সে ব্যক্তিও পাল্টা দল গঠনের ঘোষণা দিতে একটুও লজ্জা বোধ করে না।

উপরোক্ত প্রতিটি মনোভাব সুস্পষ্টরূপে গণতান্ত্রিক চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জাতীয় মনোভাবের দরুনই এদেশে একই নামে প্রায় আধা ডজন দলের অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়।

(৫) কোন সময় আদর্শের ঐক্য সত্ত্বেও কর্মনীতি ও কর্মসূচীতে মতের পার্থক্য হতে পারে এবং ফলে এক সংগঠনে কাজ করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। গণতান্ত্রিক নিয়মে এ অবস্থায় অধিকাংশ লোকের মত অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। যারা ভিন্ন মত পোষণ করে, তারা নিজস্ব কর্মনীতি ও কর্মসূচী নিয়ে ভিন্ন নামে দল গঠন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের মতকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা যদি মূল দলের নামটিকে ব্যবহার করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা গণতন্ত্র বিরোধী।

(৬) আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভাষায় পারস্পরিক আক্রমণ চলে, বিশেষভাবে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সমালোচনার যে নিম্নমান কখনো কখনো দেখা যায়, তা-ও গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(৭) গণতন্ত্রের রূপায়ণের পথে সবচাইতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হলো দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধীর বিরোধিতা করা। এ মারাত্মক রোগ যে দলে আছে, সে দলে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হলেও তারা শক্তির দাপটেই মীমাংসা করতে চেষ্টা করে।

www.bjilibrary.com

এ জঘন্য মনোবৃত্তিটি যাদের মধ্যে আছে, তারা চিন্তার ক্ষেত্রে আসলেই দুর্বল। তারা যুক্তির বলে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অক্ষম বলেই শক্তির আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক ময়দানে শক্তি প্রয়োগের এ কুপ্রথা এদেশে সরকারী দলেরই অবদান। পাকিস্তান আমল থেকেই তা চলে এসেছে। সরকারী দলকে শায়েস্তা করার জন্য গুন্ডাদল পোষার এ জঘন্য প্রথা আজো পুরোদস্তুর চালু আছে।

মানব জাতির দুর্ভাগ্য যে, রাজনৈতিক ময়দানে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করা একটি আধুনিক মতবাদের কর্মনীতি হিসেবে স্বীকৃত। তারা আফগানিস্তানে রাশিয়ার অমানবিক হামলায় লজ্জা বোধ করেনি। এদেশেও কাবুল স্টাইলে বিপ্লব করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে তাদের গণতন্ত্রে কোন দূষণীয় কাজ মনে হয় না।

আমরা যদি সত্যি গণতন্ত্র চাই এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই শান্তি, উন্নতি ও প্রগতি কামনা করি, তাহলে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

ক্ষমতার রাজনীতি নয় আদর্শিক রাজনীতি চাই

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ময়দানে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকার আসল কারণ হলো, ক্ষমতার রাজনীতি। যে কোন উপায়ে সরকারী ক্ষমতা দখল করাই যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য হয়, তাহলে যা হওয়া স্বাভাবিক, আমাদের দেশে তা-ই ঘটছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যোগ্য ভূমিকার মাধ্যমেও যে দেশের যথেষ্ট সেবা ও কল্যাণ করা সম্ভব, সেকথা যদি আমাদের বুকে আসে, তাহলে ক্ষমতা দখলের জন্য অগণতান্ত্রিক ও অরাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করার কুপ্রথা এদেশে এতটা চালু থাকতে পারবে না।

আইয়ুব খানের কর্মচারীর মর্যাদা নিয়ে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মন্ত্রী ও গভর্ণর হয়েছিলেন, তাঁদের যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শ থাকতো, তাহলে কিছুতেই এমন অরাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন না। যে ব্যক্তি জনগণের প্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্র বাতিল করে এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বন্ধ করে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব ফেলে রেখে দেশ শাসনের বোঝা অন্যায়ভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিল, তার এ জঘন্য কাজে যদি রাজনৈতিক নেতারা সহযোগী না হতেন, তাহলে পরবর্তীকালে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না।

যারা নিজকে কায়েম করার জন্য রাজনীতি করে, তারা যে কোনভাবেই ক্ষমতায় যাবার পথ তালাশ করে। আর যারা দেশ ও জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করে, তারা ক্ষমতা লাভকে আসল লক্ষ্য মনে করে না। দেশ সেবার আদর্শ যাদের আসল লক্ষ্য, তারা কোন একনায়কের কাছে মন্ত্রিত্ব ভিক্ষা চাইতে পারে না। রাজনৈতিক ময়দানে এ জাতীয় ভিক্ষুকরাই সামরিক শাসনের জন্য আসল দায়ী। এ জাতীয় লোক বাজারে পাওয়া না গেলে সামরিক শাসন বার বার জাতির ওপর চেপে বসতে পারতো না। তাই ক্ষমতার রাজনীতি আর নয়। আসুন সবাই আদর্শের রাজনীতি করি।

[১৯৮৪ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের পক্ষে পুস্তিকাকারে এ প্রবন্ধটি প্রচারিত হয়।]

www.bjilibrary.com

প্রধান কার্যালয়

আধুনিক প্রকাশনী
৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিক্রয় কেন্দ্র

☐ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

☐ ৫৫, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা

☐ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম